নিবন্ধ-নিচয়

অধ্যাপক—শ্রীউমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম, এ, বি, এল্
প্রণীত।

প্রকাশক

আলবার্ট লাইব্রেরী
নবাবপুর, ঢাকা।

প্রথম সংস্করণ

বৈশাখ
১৩৩৬

মূল্য এক টাকা।

বিজ্ঞপ্তি।

বিভিন্ন সময়ে নানা সাময়িক পত্রিকায় কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম। বেশীর ভাগই তদানীন্তন আলোচ্য বিষয় নিয়া লিখিত, সুতরাং চিরন্তন মূল্য তাদের বিশেষ কিছুই হয় ত নাই; তথাপি দুই এক জন এমন বন্ধু আমার আছেন যাঁরা এগুলিকেও একটী স্থায়ী আকার দেওয়ায় কোন দোষ নাই, একথা আমায় বলিয়াছেন।

তাই সেই-সব প্রবন্ধের কতকগুলি এখানে প্রকাশ করিয়া দিলাম। সংসারে ছোট বড় সকলেরই বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা আছে এবং বাঁচিবার আনন্দটীও সকলেই চায়। আমার এই সাময়িক প্রবন্ধগুলির পিছনে যে মনটা রহিয়াছে তারও মধ্যে হয় ত তেমনি একটা আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠিয়া আমাকে এই গ্রন্থ ছাপানোরূপ দুঃসাহসে প্রবৃত্ত করিয়াছে।

বিশ্বের সকলেই বুদ্ধিমান্ নয়, একথা কে না জানে? এ দেশেও বুদ্ধিহীনের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। সুতরাং এটা আশা করা যাইতে পারে যে, আমারও দুইচার জন পাঠক জুটিতে পারে। গল্প উপন্যাস ছাড়া জিনিসও মানুষ হজম করিতে পারে—এবং বাংলা ভাষায়ও এখন তা পারে; দেখা যাক্ আমার অদৃষ্টে কি হয়।

প্রবন্ধগুলি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন নানারূপ অভিমত শুনিয়াছি। তার সবগুলিই যদি প্রতিকূল হইত, তা হইলে আর এগুলিকে পুনর্মুদ্রিত করিতাম না। এই দ্বিতীয়বার আবির্ভাবে এদের অদৃষ্টে কি সমালোচনা জুটে, সেটীও একটী অনিশ্চিত আশার বস্তু এবং তার ভিতরও একটা প্রচ্ছন্ন আনন্দ আছে।

যে সব অভিমত আমি এই সকল প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছি, তা হয়ত সর্ব্বত্র এক রকম নহে। তা হইতে পাঠক এই জানিতে পারিবেন যে,

আমার মনে তখন সেই সব বিষয়ে অভিমত গঠিত হইতেছিল—মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া সেটার কিঞ্চিৎ দাম আছে। আর অনেক অভিমত হয়ত আমার এখন বদলিয়া গিয়াছে—এমনটিও ইতিহাসে ঘটে। কিন্তু কোথায় আমার মত বদলিয়া গিয়াছে, তাহা প্রকাশ না করিয়া তখন যে মত আমার ছিল তাহাই প্রকাশ করিয়া দিতেছি এই জন্য যে, পাঠক তাহা হইতে বুঝিতে পারিবেন, সেই সময়ে এক শ্রেণীর লোক কি ভাবিত। সাহিত্যের সৌধে একটী বিরাট স্তম্ভ কিংবা তেমনি একটা কিছু এইগ্রন্থ নয়। সুতরাং ইহাকে ভারী ও দামী জিনিসের নিক্তিতে ওজন না করিলেই লেখক স্বস্তি বোধ করিবে। এর বেশী করুণার দাবী তাহার নাই। ইত্যলম্—

বৈশাখ, ১৩৩৬।   গ্রন্থকার।

সূচী।

নিবন্ধ-নিচয়

সাহিত্যের নবীন বিষয়।

এথেন্সে যখন সোক্রেতিসের দার্শনিক চিন্তা ও শিক্ষার প্রভাব দ্রুতগতিতে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছিল এবং তার ফলে, ধর্ম্ম ও নীতিতে এথেন্সবাসীদের গৃহীত মতের আসন যখন আস্তে আস্তে টলিয়া আসিতেছিল, তখন এরিষ্টফেনিজ্ দার্শনিক মাত্রেরই এবং বিশেষতঃ সোক্রেতিসের বিরুদ্ধে 'বারিবাহ' নামক তাঁহার বিখ্যাত কৌতুকাত্মক নাটক লিখিয়াছিলেন। দার্শনিকদের গভীর, নীরস, মানবের সুখদুঃখে নির্ব্বিকার, চিন্তার যে বিশেষ কোন পরিণাম নাই—মেঘের গতি কিংবা মাছির দৌড় নির্ণয় করা ছাড়া যে ইহার আর কোন লক্ষ্য নাই—সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য করা ছাড়া ইহার যে আর কোন কাজ নাই—উপহাসচ্ছলে এরিষ্টফেনিজ্ তাহাই কহিতে চাহিয়াছিলেন। ঋণদায়ে জর্জ্জরিত কোনও এক ব্যক্তি ঋণমুক্তির কোন উপায় না দেখিয়া সোক্রেতিসের শরণ নিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন; আশা ছিল, যদি সোক্রেতিস তাঁহার গবেষণার ফলে প্রমাণ করিয়া দিতে পারেন যে, তাঁহার ঋণ বলিয়া কোন পদার্থ নাই এবং ঋণশোধ করা বলিয়া কোন ক্রিয়ার জন্ম হয় নাই। এরিষ্টফেনিজের নাটকের ইহাই গল্পাংশ। দার্শনিকেরা যে এক পরশমণির সন্ধানে ঘুরেন যাহার স্পর্শে প্রস্তর হীরক হয়, তামা সোনা হয় এবং অবস্তু বস্তু হয়, দার্শনিকের প্রতি সমাজের ইহা সনাতন উপহাস। শুধু দার্শনিক নয়, যারা একনিষ্ঠ, আত্মবিস্মৃত হইয়া কোন সত্যের সন্ধানে ব্যাপৃত থাকে,

মানুষ তাহাদের সেই একাগ্রতাকে উপহাস না করিয়া পারে নাই। ফরাসী দার্শনিক বার্গসেঁা (Bergson) বলেন, যাহার জীবন-গতি ক্ষীণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি যাহার দৃষ্টি নাই, অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে উপযোগী প্রতিক্রিয়া যে দেখাইতে পারে না, সে-ই উপহাস্য। একনিষ্ঠ ভাবুকের আত্মবিস্মরণ পারিপার্শ্বিক অবস্থার– দেশকাল পাত্রের প্রতি অমনোযোগের লক্ষণ। সুতরাং মানুষ তাহার খরচে একটু হাসিয়া লইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সোক্রেতিস্‌কে এথেন্সবাসীরা হাজার সম্মান করিলেও এরিষ্টফেনিজের নাটক তাহাদিগের চিত্তে হর্ষসঞ্চার করে নাই, এমন নহে। কারণ, তাহা হইলে, এতদিন এরিষ্টফেনিজ জগতে টিঁকিয়া থাকিতে পারিতেন না; সাহিত্য তখন দর্শনকে নিজের বিষয় বলিয়া গ্রহণ করে নাই, আর দর্শনও, তখন 'জগতের আদিকারণ জল না বায়ু, না অগ্নি'-- ইত্যাদি প্রশ্ন ছাড়া অন্য কোন চিন্তায় ব্যাপৃত হয় নাই। কিন্তু দর্শন আজ নিজের কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়া লইয়াছে এবং সাহিত্যও অনেক নূতন বিষয়কে আপন করিয়া লইয়াছে।

ধর্ম্ম, সমাজ, বা গৃহ সম্বন্ধে কোন বিশেষ প্রশ্ন, কিংবা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির কোনও বিশিষ্ট সমস্যা, কিংবা কোনও বিশিষ্ট জীবন—সাহিত্য অনেক দিন নিজস্ব বলিয়া স্বীকার করে নাই। নায়ক সদ্বংশপ্রভবই হউক কিংবা ইতর-জনই হউক, মানুষের সাধারণ সুখ দুঃখ, সাধারণ স্নেহ ভালবাসা, ঈর্ষা দ্বেষ প্রভৃতির বিকাশ বর্ণন এবং শ্রোতা বা পাঠকের মনে তদনুযায়ী ভাব স্ফুরণই অনেক কাল সাহিত্য-চেষ্টার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। উদাত্ত, উদ্ধত, ললিত, কিংবা প্রশান্ত নায়ক, মুগ্ধা, মধ্যা কিংবা প্রগলভা নায়িকার সহিত যে প্রেম করিতে পারেন, তাহাকেই মূল লক্ষ্য করিয়া প্রসঙ্গক্রমে সাধারণতঃ মানুষের জীবনে যে সব ঘটনা ঘটিতে পারে—যে সব চিত্তপ্রবৃত্তির প্রকাশ হইতে পারে,

তাহারও বর্ণনা, শুধু ভারতবর্ষে নয় পৃথিবীর সর্ব্বত্রই অনেক কাল দৃশ্য-শ্রব্য কাব্যের একমাত্র না হইলেও প্রধান উপকরণ ছিল। সাধারণতঃ মানুষের জীবনে যে মিত্রলাভ বা সুহৃদ্‌ভেদ, বিগ্রহ বা সন্ধি হয় তাহার বাহিরে সাহিত্য অনেককাল যাইতে চায় নাই। কোনও ঐতিহাসিক ঘটনা, কোনও পরীর কিস্‌সা কিংবা কোনও প্রাচীন উপকথাকে আশ্রয় করিয়া অনেককাল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদের কাব্য গড়িয়া উঠিয়াছে। মানুষের সম্পর্ক কিংবা প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, সঙ্গীত বা সৌরভ মানুষের চিত্তে যে সব ভাবের, যে সব অনুভূতির সৃষ্টি করে তাহাকেই শিল্প-সৌন্দর্য্যে অলঙ্কৃত ভাষায় প্রকাশ করা অনেক কাল সাহিত্যের একমাত্র কর্ম্ম ছিল। ইংরেজ কবি টম্‌সন্ (Thomson) কিংবা ভারত-কবি কালিদাসের সীজন্‌স্ (Seasons) বা ঋতুসংহার হইতে আরম্ভ করিয়া জগতের অনেক কাব্যই মানুষের সাধারণ সম্পর্ক বা মানব-জীবনের সাধারণ ঘটনা হইতে যে সব অনুভূতি উৎপন্ন হয় তাহার, কিংবা সাধারণ মানুষের চারিদিকে প্রকৃতির রঙ্গালয়ে যে সব নিত্য নূতন পট-পরিবর্ত্তন—যে সব নিত্য নূতন দৃশ্য-পরিবর্ত্তন হয়, তাহার বর্ণনা ছাড়া অন্য কিছুকে নিজের উপাদান বলিয়া অনেক কাল গ্রহণ করে নাই। মানবচিত্তের ভাবপ্রবাহও তার রসানুভূতিই ছিল কাব্যের প্রধান উপাদান এবং কাব্যই ছিল সাহিত্যের প্রধান অঙ্গ। কোন গভীর প্রশ্ন, ধর্ম্ম বা নীতি, সমাজ বা গৃহ প্রভৃতির কোন কূট সমস্যা—কোনও প্রবীণ সত্যের ধ্যান, কোনও নবীন সত্যের সন্ধান, ধর্ম্ম বা নীতির উন্নতি, সমাজ বা গৃহের সংস্কার—এ সকলকে কাব্য অনেক দিন নিজের বিষয় বলিয়া গ্রহণ করে নাই। কিন্তু আজ তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

আর, অনেককাল ধরিয়া দর্শন ভাবিয়াছে জগতের আদি উপাদান জড় না চেতন—জগতের পরিণতি জীবনে না মরণে—মানুষের আত্মা

নশ্বর না অবিনশ্বর। শনি বড় না লক্ষ্মী বড়,—এই প্রশ্ন শ্রীবৎস রাজাকে লাঞ্ছিত করিয়াছিল; জড় বড় না চেতন বড়, এই প্রশ্নও অনেক কাল পৃথিবীর বিশেষতঃ ইউরোপের চিন্তাকে জর্জ্জরিত করিয়া রাখিয়াছে। মোক্ষোপায়ের কথা—ঐহিক জীবন হইতে মুক্ত হইবার উপায়, কিংবা অনাবশ্যক জ্ঞানের কথাই অনেক কাল দর্শন একমাত্র জ্ঞানলাভের ইচ্ছা চরিতার্থ করিবার জন্য অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে। আবশ্যক না অনাবশ্যক, এই প্রশ্ন না তুলিয়া দর্শনের প্রবীণ জিজ্ঞাসা ছিল শুধু সত্যের সন্ধান। হৃদয়কে প্রশ্রয় দেওয়া, মানুষের সুখশান্তি লাভের ইচ্ছার প্রতি সহানুভূতি দেখান—এ সকলকে অনেক কাল দর্শন নিজের গাম্ভীর্য্যের বিরোধী মনে করিয়াছে। ঐহিক জীবনের উন্নতি, গৃহে সমাজে ও রাষ্ট্রে সুখ ও শান্তির বিস্তার, মানুষের সকল বাসনার সংযত অথচ পূর্ণ সফলতা—এ সকলের উপায় অনেক কাল দর্শনশাস্ত্র চিন্তা করে নাই। ব্যক্তি বা সমাজের অত্যাচার অবিচার—দুর্ব্বলের হীনতা ও দৈন্য, মানুষের ঐহিক দুঃখ ও দারিদ্র্য—ঐহিক উপায়ে এ সকলের নিরাকরণের চিন্তা অনেক কাল দর্শন-চেষ্টার অঙ্গীভূত হয় নাই। ধনী দরিদ্রের প্রভেদ, পুরুষ নারীর সম্পর্ক—মনীব চাকর বা নিয়োক্তা ও নিযুক্তের সম্বন্ধ—রাষ্ট্রে ও সমাজে লোকের অধিকার অনধিকার,—এ সকলের কথা অনেক কাল দর্শন অবহেলা করিয়াছে। কিন্তু Auguste Comte, John Stuart Mill ও Herbert Spencer প্রভৃতি চিরস্মরণীয় হউন, আজ দর্শন তার বিপুলীকৃত চিন্তাক্ষেত্রের বিস্তৃত পরিসরের মধ্যে এ সকলেরও স্থান করিয়া দিয়াছে।

দর্শ-পৌর্ণমাসী ব্রত বা পুত্রেষ্টি যাগ,—পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর ও পূত প্রেতের (God the Father, God the Son ও Holy Ghost এর) সম্বন্ধ—ধর্ম্ম যে কতকাল এ সকল কথার চিন্তায়ই ব্যাপৃত রহিয়াছে তাহার

ইয়ত্তা নাই। কিন্তু মানুষের ঐহিক সুখের চিন্তা, ঐহিক জীবনের আচার ও নীতি, সমাজের গঠন ও উন্নতি—সমাজে ব্যক্তির কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য—এ সকলের চিন্তা অনেক কাল ধর্ম্মের অঙ্গ হয় নাই। পিতা পুত্র, ভ্রাতা ভগ্নী, পতি পত্নী প্রভৃতি বিবিধ সম্বন্ধে মানুষের বিবিধ কর্ত্তব্য, সমাজে তাহার বিবিধ অধিকার অনাধিকার প্রভৃতির কথা ধর্ম্ম অনেক কাল অবহেলা করিয়াছে। ইহ-জীবন, ঐহিক সুখদুঃখ প্রভৃতির প্রতি প্রবৃত্তিকে ধর্ম্ম অনেক কাল ঘৃণা করিয়াছে। সন্ন্যাস, বৈরাগ্যকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া সমাজ ও রাষ্ট্রে ব্যক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠাকে ধর্ম্ম অনেক কাল তুচ্ছ করিয়া আসিয়াছে। এ পৃথিবীকে একটী বন্ধনাগার এবং এ জীবনকে একটী দুশ্ছেদ্য বন্ধন মনে করিয়া তাহার মধ্যেও যে কর্ত্তব্য থাকিতে পারে—এ কথা ধর্ম্ম অনেক কাল স্মরণ করে নাই! এশিয়ার বাহিরে উল্লেখযোগ্য কোন ধর্ম্ম-পদ্ধতির উদ্ভব হয় নাই; এবং এশিয়ার সমস্ত ধর্ম্মের মধ্যেই ইহ-জীবনকে—এ দেহে অবস্থিতিকে—পাপ মনে করার দস্তুর আছে। যাহারা সমস্ত চিন্তা, সমস্ত চেষ্টা একটী দূর ভবিষ্যৎ লক্ষ্যের দিকে ধাবিত, নিকট ঐহিক জীবনের করণীয়কে সে ভুলিয়া যাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! কিন্তু আজ মানুষের সমগ্র চিন্তার গতি ফিরিয়াছে। ভবিষ্যতের, কল্পিত স্বর্গের মোহে আবদ্ধ, ভবিষ্যতে মঙ্গলপ্রসূ উপায়ের চিন্তায় ব্যাপৃত, কর্ম্মচিকীর্ষু মানব মণ্ডলীর কোলাহলে লুপ্তপ্রায় উপনিষদের 'আত্মানং বিদ্ধি' বলিয়া যে ধ্বনি উঠিয়াছিল, গ্রীক চিন্তায়—রাজনীতি ও কলাবিদ্যা ও ব্যবসায়ে লিপ্ত গ্রীকদের মনেও যে আত্মজ্ঞানের সাড়া পড়িয়াছিল—আজ পূর্ণ গতিতে সেই চিন্তায় মানুষের মন নিযুক্ত। গৃহের প্রতি কর্ত্তব্যকে অবহেলা করিয়া রাষ্ট্রের প্রতি কর্ত্তব্য চিন্তা করা—নিকট বর্ত্তমানকে তুচ্ছ করিয়া দূর ভবিষ্যতের চিন্তা করা—এ জীবনকে ভুলিয়া গিয়া পর জীবনের সুখ সম্ভোগের

চিন্তা করা—যে ভুল, ইহা যে একদেশদর্শিতা, জগৎ আজ এ কথা বুঝিয়াছে। ঐহিক জীবনের প্রতি আজ মানুষের দৃষ্টি পড়িয়াছে; ইহা যে নিতান্তই একটা ভ্রান্তি—একটা প্রকাণ্ড পাপ নহে, একথা বলিতে আজ আর মানুষ লজ্জিত নহে। ভবিষ্যতে আমরা আস্থাহীন নহি; কিন্তু ভবিষ্যৎ যে বর্ত্তমানের গর্ভে, পথ না বাহিয়া যে কখনও গন্তব্য স্থানে যাওয়া যায় না, এ জীবনের কর্ত্তব্যকে অবহেলা করিলেই যে ভবিষ্যতের জন্য পুণ্যসঞ্চয় হয় না—বর্ত্তমানকে উপেক্ষা করিলেই যে ভবিষ্যৎ সুন্দর হইয়া উঠে না, এ সত্য আজ আমাদের সম্মুখে দেদীপ্যমান। মর্ত্ত্যে স্বর্গের প্রতিষ্ঠা, ইহ জীবনে সুখময় অনন্ত জীবনের ভিত্তি স্থাপন, এ জীবনের কর্ম্ম-চেষ্টার ভিতরে ব্যক্তির ও সমাজের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের বীজ বপন—এ সকলের চিন্তাকে ধর্ম্ম এখন আর পরমার্থ চিন্তার বাহিরে মনে করে না।

আজ ধর্ম্ম ও দর্শনের সহিত সাহিত্যের শুভ পরিণয় হইয়া গিয়াছে। চিন্তার কারুগৃহে মানুষ যে শ্রম-বিভাগ প্রচলিত করিয়া দিয়াছিল—সিদ্ধি-সৌকর্য্যার্থে রসায়নবিদ্ ও পদার্থবিদ, দার্শনিক ও সাহিত্যিক প্রভৃতির মধ্যে যে জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—একের ক্রিয়ার সহিত অন্যের ক্রিয়ার আপাততঃ যে সম্বন্ধের অভাব সৃষ্ট হইয়াছিল, মানুষ আবার স্মরণ করিয়াছে যে, এ সকল চিরকালের জন্য সৃষ্ট হয় নাই। পরিপূর্ণ চিন্তার স্রোতে মানুষ আবার বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে, ঋজু-কুটিল— কাব্য দর্শন—প্রভৃতি নানা পথ অনুসরণ করিয়া সে একই চরম লক্ষ্যের দিকে চলিয়াছে। পরিপূর্ণ আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই যে ব্যক্তির, সে যেমন বুঝিতে পারে না যে, তাহার জীবনের বিবিধ বিচিত্র কর্ম্ম চেষ্টার লক্ষ্য এক বই দুই নয়, বিবিধ বিশিষ্ট ক্ষুদ্র তত্ত্বের সন্ধানে নিযুক্ত মানবমণ্ডলীও তেমনই অনেক কাল ভুলিয়াছিল যে, দর্শন

ও বিজ্ঞান, ধর্ম্ম ও সাহিত্য সমস্তের ভিতর দিয়া সে একই চরম পরিণতির চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু আজ বর্দ্ধমান ক্রিয়া ও পূর্য্যমাণ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আবার স্মরণ করিয়াছে যে, বিজ্ঞানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশিষ্ট সত্য হইতে আরম্ভ করিয়া যেমন ব্যাপক সাধারণ সত্যের উৎপত্তি হয়—বিবিধ বিশিষ্ট বিজ্ঞান হইতে যেমন পরিণত দর্শনের জন্ম হয়, তেমনই দর্শন, বিজ্ঞান সাহিত্য প্রভৃতি সমস্ত চেষ্টা হইতে একটা পূর্ণতর, মহত্তর জীবনের উদ্ভবই মানুষের চরম অভিলাষ। তাই আজ ধর্ম্ম-দর্শন প্রভৃতির সহিত সাহিত্যের আর কোন বিরোধ নাই।

তাই আজ দর্শনের প্রাচীন সমস্যা, বিজ্ঞানের নবীন সত্য, ধর্ম্মের গভীর অনুভূতি, ধীরে ধীরে সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিতেছে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, টেনিসন, ব্রাউনিং প্রভৃতির কাব্যে ধর্ম্মের কথা, নীতির কথা, পরলোকের কথা, বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত মানবাত্মার সম্বন্ধের কথা স্পষ্ট ভাবেই কথিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি বাস্তব জগতের প্রতি দৃষ্টি, সমাজের অন্ত্য শ্রেণীর প্রতি করুণা, সমাজের আর্থিক ও নৈতিক নিয়ম প্রভৃতির বিষয় ইঁহাদেরও কাব্যের প্রধান বিষয় নয়। যে কবি লিখিয়াছিলেন "what man has made of man"—'মানুষ মানুষের কি করিয়াছে'—মানুষের উপর মানুষের অত্যাচারে তিনি নিশ্চয়ই দুঃখিত। যে কবি রমণীদের কলেজের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, সমাজে স্ত্রীলোকের অধিকারের কথা তিনি ভাবিয়াছিলেন। তথাপি ইঁহারা বাস্তব সমাজের কলঙ্ক, বাস্তব মানব মণ্ডলীর দৈনন্দিন দুঃখ দুর্দ্দশাকেই প্রধান বিষয় করিয়া নেন নাই। অবস্থা-বিশেষে পড়িয়া কিংবা প্রকৃতির নাট্যশালার কোনও এক বিশিষ্ট দৃশ্যের সম্পর্কে আসিয়া কিংবা আর্থারের বা লুসীর উপাখ্যান পাঠ করিয়া কিংবা বন্ধুবিচ্ছেদে জর্জ্জরিত হইয়া তাঁহাদের নিজেদের চিত্তে যে ভাবের প্রবাহ বহিয়াছে, তাহাই তাঁহারা নানা ভঙ্গিতে

আমাদের মনে সঞ্চারিত করিয়া দিতে চাহিয়াছেন। ঐতিহাসিক ঘটনা, উপকথার বিবরণ, প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রভৃতির বৃত্তান্ত, এ সকলকে আশ্রয় করিয়াই ইহাঁদের কাব্য-সৃষ্টি সম্পাদিত হইয়াছে। লণ্ডন মিউনিসিপালিটীর কলঙ্কের কথা, বিবাহিতা নারীর অধিকার-অনধিকারের কথা, পতিতা রমণীদের প্রতি সমাজ-বিধির নিষ্ঠুরতার কথা, মজুরদের দুরবস্থার কথা—এ সমস্ত ইহাঁদের সময়েও কাব্যরূপ রসাত্মক বাক্যের রসসঞ্চার করিতে সমর্থ হয় নাই। তখনও মানুষ শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য ব্যায়ামের মত, সঙ্গীতের ন্যায় কাব্যকেও মানসিক স্বাস্থ্যের উপায় মাত্র মনে করিত। কাব্য তখনও শিক্ষার বাহন, সমাজ সংস্কারের পথ-প্রদর্শকরূপে গৃহীত হয় নাই। চিত্রে যেমন, কাব্যেও তেমনই প্রকৃতিতে—বাস্তবে যাহা নাই, প্রকৃতি হইতেই উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাহার সৃষ্টিকেই আদর্শ বলিয়া ধরা হইত। কবি সৃষ্টি করিবেন—কল্পনার সাহায্যে নূতন জিনিসের উদ্ভাবন করিবেন—বাস্তব হইতে উপকরণ গ্রহণ করিয়া মধুরতর অবাস্তবের সৌন্দর্য্যে মানুষের চিত্তকে মোহিত করিবেন—তখনকার সাহিত্যে ইহা ছাড়া আর কিছু আশা করা হয় নাই। লোকের মনে মধুরতর কোমলতর মহত্তর ভাবের স্ফুরণ করিয়া দেওয়াই কবির শিক্ষা ছিল। 'রামাদিবৎ প্রবর্ত্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ'—চরিত্র চিত্রণ দ্বারা কবি ইহাই শিক্ষা দিবেন; আকাশে রামধনু দেখিয়া তাঁহার মনে কি ভাবের উন্মেষ হয় তাহাই কহিয়া অন্যের চিত্তেও সে ভাবের সঞ্চার করিয়া দিতে চেষ্টা করিবেন ; নানা উপায়ে বিবিধ অনুভূতির উৎপাদন ও চিত্তকে মার্জ্জিত করিয়া দিবেন ; ইহাই ছিল কবির শিক্ষা। 'মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলী' সরসভাবে বিনোদনের সহিত চিত্তকে মার্জ্জিত করিবে, ইহার বেশী কবির কাছে আশা করা হয় নাই। হয়ত বা অনেকের কাব্যে ইহার চেয়েও বেশী পাওয়া যায়, কিন্তু সে আশার অতিরিক্ত।

এ শিক্ষারও প্রভূত মূল্য আছে, সন্দেহ নাই। বিলাতে এবং অন্যত্র অনেকবার কথা উঠিয়াছে যে কাব্য চর্চ্চা, বিশেষতঃ মৃত ভাষার প্রাচীন কাব্যের চর্চ্চা, মানুষকে কারখানা বা আফিসের উপযুক্ত করিয়া দেয় না; কি করিয়া হিসাব রাখিতে হয় কিংবা ইন্‌ভয়েস্ লিখিতে হয়, কিংবা আলপিনের মাথা সূক্ষ্ম করিতে হয়—কাব্য চর্চ্চা হইতে সে জ্ঞানলাভ হয় না; কাব্য, বিশেষতঃ মৃত ভাষার কাব্য, সুতরাং মানুষকে জীবনযুদ্ধে কোনরূপে সহায়তা করে না; কাজেই লোক শিক্ষায় ইহার কোন মূল্যও নাই। স্পেন্‌সরের মত লোক একথা বলিয়াছেন। কিন্তু কাব্য যে চিত্তবৃত্তির স্ফুরণ করে এবং মার্জ্জিত অনুভূতি দ্বারা মনকে সরস করিয়া দেয়—এবং অনুভূতির মার্জ্জনাও যে মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য প্রয়োজন, জন্ ষ্টুয়ার্ট্ মিল নিজের জীবনে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। যাহাদের এ সকল অনুভূতি ভোগ করিবার অবকাশ আছে, তাহাদের মাত্র শরতের জ্যোৎস্না দেখিয়া মনে আনন্দ হয়; কবির ভাষায় সে আনন্দ যে ভাবে প্রকাশ লাভ করে, তাহাতে তাহা দ্বিগুণিত হয়। কিন্তু সকলের ভাগ্যে এ আনন্দ উপভোগ করিবার সুযোগ হয় না। সুতরাং ইহা হইতে যে শিক্ষা লাভ হয়, তাহা গুটি কয়েক ভাগ্যবান্ ব্যক্তির পক্ষেই মাত্র সম্ভব হয়, সকলের নহে। তথাপি কাহারও কাহারও পক্ষে উহা মূল্যবান্ শিক্ষা। সুতরাং এ প্রকার কাব্যের শিক্ষারও মূল্য আছে।

কিন্তু ইহা নিতান্তই উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তির শিক্ষা; তাহাও আবার সকলের ভাগ্যে ঘটে না। সকলের ভাগ্যেই কি শরতের জ্যোৎস্নাকে কবির সঙ্গে উপভোগ করিবার সুযোগ ঘটে? সাধারণ কাব্য সুতরাং সে শিক্ষা ও যে জ্ঞান প্রদান করে, তাহাতে সমাজের অন্ত্য শ্রেণীরা উপেক্ষিত। তাহাদের সুখ দুঃখ, আশা ভরসা, উন্নতি অবনতি অনেককাল সাহিত্যে অবহেলিত রহিয়াছে। গদ্য পদ্য সকল সাহিত্য ব্যক্তির

আনন্দের কথা যেমন ভাবিয়াছে, সমাজের, ধর্ম্মের, নীতির কথা তেমন ভাবে অনেককাল গ্রহণ করে নাই।

কিন্তু অন্যত্র না হইলেও ইউরোপে,—পদ্যে তত না হইলেও গদ্যে, বাস্তবের প্রতি ইহার চেয়ে শ্রদ্ধা-সম্পন্ন সাহিত্যের উদ্ভব আজ হইয়াছে। ফরাসী ঔপন্যাসিক এমিলি জোলাকে অনেকে পসন্দ করেন না, অন্ত্যজাতির বিবিধ কদাচার প্রদর্শন করা তাঁহার উপন্যাসের একটা প্রধান বিষয় বলিয়া। সুতরাং তিনি বৈঠকখানার ঔপন্যাসিক নহেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার লেখায় একটা সামাজিক সমস্যা উত্থাপিত হইয়াছে; অন্ত্যশ্রেণীদিগকে সমাজই নীচ করিয়া রাখিয়াছে—ইহাদের কদাচার সুতরাং সমাজের কৃত কর্ম্মের ফল; হাজার অনিচ্ছুক হইলেও আমাদিগকে এ কথা ভাবিতে জোলা বাধ্য করিয়াছেন। ভিক্টর হিউগোর উপন্যাসেও ঐ একই ধ্বনি। সমাজ যাহাকে সারা জীবন কয়েদখানায় আবদ্ধ রাখিয়াও নিজকে নিরাপদ্ মনে করে না, অনুকূল অবস্থায় পড়িলে সেই তথাকথিত পাষণ্ডও যে ঋষিচরিত্র হইতে পারে, জিন্ ভাল্‌জিনের চরিত্র চিত্রিত করিয়া হিউগো আমাদিগকে তাহাই বলিতে চান। সমাজ নিজে পাপীর সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের পাপের ফল যে নিজেই ভোগ করে, অথচ যারা সুবিধা পাইলেই ভাল হইতে পারিত তাহাদিগকে কয়েদখানায় পুরিয়া রাখিয়া সমাজ যে নিজের পাপের মাত্রা বাড়াইতেছে এবং সেই জন্য কখনও সুখ ও শান্তি অনুভব করিতে পারিতেছে না,—ইহাই হিউগোর লেখার ধ্বনি।

Resurrection বা 'পুনর্জ্জন্ম' নামক উপন্যাসে টলষ্টয়ও তেমনই পতিতা রমণীদের পতনের নিমিত্ত সমাজকে বিশেষতঃ সমাজের উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিদিগকে দায়ী করিয়াছেন।

নরওয়ের প্রসিদ্ধ নাট্যকার ইব্‌সেনের নাট্যে নানা ভাবে এইরূপ সামাজিক সমস্যার আলোচনা হইয়াছে। তাঁহার বিশ্ববিশ্রুত নাটক 'পুতুলের ঘরে' সমাজে এবং গৃহে স্ত্রীর অধিকারের কথাই মূল বিষয়। 'Ghosts' বা 'প্রেতাত্মা' নামক নাটকে বৃত্তি ও রোগের বংশানুক্রমিকতাকেই ইবসেন্ প্রতিপাদ্য বিষয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অনেক কাল পূর্ব্বে সাধারণ ভাবে বাইবেল বলিয়াছিল 'আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের পাপের শাস্তি আমাদিগকেই ভোগ করিতে হয়।' তারপর ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ডারুইন প্রমুখ মনীষীগণের চিন্তা পরম্পরার ফলে জগৎ আবার নূতনভাবে এই মহৎ সত্য লাভ করিয়াছিল যে, মানবের চিত্ত ও চরিত্র গঠনে বংশানুক্রমিকতা নামে একটা প্রবল শক্তি ক্রিয়া করে। এই সঙ্গে মানুষ আরও জানিয়াছিল যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবও মানবের চরিত্র গঠনে নিয়োজিত রহিয়াছে। হয় ত বা এই অভিনব সত্যের নূতনত্বে মুগ্ধ হইয়া অনেকে এই নিয়মের অতিব্যাপ্তি ঘটাইয়াছেন—হয় ত বা অনেকে যেখানে ইহা সত্য নয়, সেখানেও ইহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন,—হয় ত বা অসঙ্গতরূপে অনেকে ইহাকেই মানবের ব্যক্তিত্বের একমাত্র কারণ মনে করিয়াছেন। তথাপি, ইহা যে সত্য সে বিষয়ে সন্দেহ করা যায় না। নানাভাবে আজ ইহার প্রমাণ জুটিতেছে। শিক্ষা, সৎসঙ্গ প্রভৃতির উপকারিতা মানিয়া সমাজ নানাভাবে তাহা স্বীকার করিয়া আসিতেছে। সুপ্রজনন-বিজ্ঞান বলিয়া যে নূতন বিজ্ঞানের জন্ম ইউরোপে হইয়াছে—এই বংশানুক্রমিকতাই তাহার ভিত্তি। জনক জননীর দোষে সন্তান দুষ্ট—তাহাদের রোগে সন্তান রুগ্ন হয়; সুতরাং পাপী, রোগী, দোষ-দুষ্টের সন্তানাভিলাষ পূরণ করার সুবিধা দেওয়া সমাজের পক্ষে হিতকর নহে—এ সত্য আজ গৃহীত। বাস্তব লোক-ব্যবহারে ইহাকে কার্য্যকর

হইতে দেওয়া যায় কি না, স্বতন্ত্র করা; কিন্তু ইহার সত্যতায় সন্দিহান হওয়ার কোন যুক্তি নাই। সমাজের হিত চিন্তায় ব্যাপৃত ব্যক্তি মাত্রেই ন্যূনাধিক ইহার উপলব্ধি করিয়াছেন। প্লেটো যখন বলিয়াছিলেন, রুগ্ন, বিকলাঙ্গ ব্যক্তিকে সমাজ অনুকম্পা-পরবশ হইয়া নানা উপায়ে রক্ষা করিতে চেষ্টা না করিয়া যদি তাহার বিনাশের পথ সুগম করিয়া দেয়, তাহা হইলেই সমাজের পক্ষে মঙ্গল—তখন পৃথিবী অত্যন্ত নিষ্ঠুর মনে করিয়া এ উক্তি শ্রবণ করিতে চায় নাই। কিন্তু আজ অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে—নিষ্ঠুরতাকেই গুণ বলিয়া জার্ম্মেণ দার্শনিক নীট্‌চে ইহারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। সুপ্রজনন বিজ্ঞানের মুখেও আজ এই কথাই শুনিতে পাই। কেহ বা প্রিয়, কেহ বা অপ্রিয়ভাবে এই কথার আবৃত্তি করিতেছেন। সামাজিক জীবনে সব দিক রক্ষা করিয়া কি ভাবে ইহাকে ফলপ্রদ করিয়া লওয়া যায়, সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। কিন্তু পিতার পাপে পুত্র পাপী হয়, পিতার রোগ বা কুপ্রবৃত্তি পুত্রে সঞ্চারিত হয়,—নানা ভাবে সমর্থিত দর্শন বিজ্ঞানের এই সত্যকে সাহিত্যও আজ আপনার বিষয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। ইবসেন্ 'প্রেতাত্মায়' ইহারই অবতারণা করিয়াছেন।

'Pillars of Society' বা 'সমাজের আশ্রয়স্তম্ভ' নামক ইব্‌সেনের অন্যতম নাটকের বিষয়ও সামাজিক। ইহুদীরা যেমন নিজেদের সম্বৎসরের পাপের বোঝা একটী ছাগনন্দনের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া তাহাকে বনে ছাড়িয়া দিয়া নিজদিগকে পাপমুক্ত মনে করিত, সমাজে সেইরূপ ধনী নিজের পাপের বোঝা অন্যের স্কন্ধে আরোপ করিয়া—নিজের অন্তরের কলঙ্ক গোপন করিয়া, কিরূপে সমাজের শ্রদ্ধা ও সম্মান ভোগ করিয়া থাকেন,—কিরূপে সমাজের আশ্রয়-স্তম্ভরূপে পূজিত হইয়া থাকেন, 'সমাজের আশ্রয়-স্তম্ভ' নামক নাটকে ইব্‌সেন তাহা

দেখাইয়াছেন। সমাজের এই আত্মপ্রবঞ্চনা—এই মিথ্যা, এই ভাণ, এই অন্তঃসারশূন্যতা দূর হউক, শুধু কবির নয়, দার্শনিকেরও তাহা চরম অভিলাষ। প্লেটো তাই দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন 'দার্শনিক যে পর্যন্ত রাজ্য শাসনে অভিষিক্ত না হন এবং রাজারা যে পর্যন্ত প্রকৃত দার্শনিক না হন, সে পর্য্যন্ত জগতের মঙ্গল নাই—আদর্শ রাষ্ট্রের সৃষ্টি সে পর্য্যন্ত হইতে পারে না।' ধর্ম্মে, নীতিতে, সুখে শান্তিতে সুন্দর সমাজের প্রতিষ্ঠার আশা শুধু কল্পনায় নয়, কঠোর বাস্তবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কবি আজ প্রকাশ করিতে চাহিতেছেন।

ইংলণ্ডে বার্ণার্ড শ' শিষ্ট রুচিতে যতই আঘাত করুন না কেন, সমাজের বহুবিধ কলঙ্ক অপনীত হউক, মানব সমাজ তাহার নামের উপযুক্ত হউক, এই উদ্দেশ্য তাঁহার স্পষ্ট। অন্ত্য শ্রেণীদের দুঃখ দৈন্য, পতিতা রমণীদের দুর্দ্দশা—ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম, নীতির নামে অনীতি, মিথ্যা প্রবঞ্চনা সমাজ হইতে দূর হউক, ইহা বার্ণার্ডশ ইচ্ছা করেন। এ সকল যে সমাজে রহিয়াছে, অতি নির্ম্মম ভাবে তাহা তিনি আমাদিগকে দেখাইতে চান। শিষ্টেরা দূরে থাকিয়া 'প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাদস্পর্শনং বরং' মনে করেন; কিন্তু তাঁরা ভুলিয়া যান সমাজে যে পঙ্ক, যে আবিলতা সঞ্চিত হইতেছে—বিস্তৃত হইয়া ক্রমে তাহা শিষ্টদের স্থানও কলুষিত করিয়া দিবে। কণ্টকের উন্মূলন না করিলে সমস্ত দেহই অসুস্থ হয়; পায়ে রহিয়াছে বলিয়া ইহাকে উপেক্ষা করা চলে না। সমাজের অন্ত্য শ্রেণীতে পাপ রহিয়াছে; শিষ্টেরা চক্ষু বুজিয়া যে নিজদিগকে নিরাপদ্ মনে করেন, তাহা ঠিক নহে। আর শিষ্টেরা কি বাস্তবিকই দূরে—বাস্তবিকই কি তাঁরা পাপদ্বারা স্পৃষ্ট নন? নানা রকমে তথাকথিত শিষ্টেরা তথাকথিত পাপীদের সহিত সংশ্লিষ্ট। সমাজের দেহে রক্তস্রোতের সহিত রোগের, পাপের—মৃত্যুর স্রোত

মিশিয়া রহিয়াছে ; নানা প্রকারের অধর্ম্ম, অনীতি, ভণ্ডামিকে সমাজ প্রশ্রয় দিতেছে ; ধনপতি কুবেরের একচ্ছত্র রাজত্ব স্বীকার করিয়া নানা-রকমে সমাজ পাপকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে। মৃত্যুর বীজের সহিত কোলা-কুলি করিয়া কতকাল সমাজ বাঁচিয়া থাকিবে ? একদিন এই বীজ অঙ্কুরিত হইবেই ; সমাজ যদি আপনার পদ্ধতি পরিবর্ত্তিত না করে, মৃত্যু তাহার অনিবার্য্য। চিকিৎসা-বিধানের কথা, মিউনিসিপালিটীর কথা, বিবাহের কথা—নানাবিধ কথার অবতারণা করিয়া তাঁহার নাট্যা-বলীতে ও অন্যত্র নানাভাবে বার্ণার্ড শ এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

সুতরাং দেখিতে পাই, ধর্ম্মনীতির কথা, সমাজের কথা নানাভাবে আজ ইউরোপের সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিতেছে। শুধু ইউরোপেই বা কেন, সমস্ত পৃথিবী আজ নানা রকমে গৃহ, সমাজ, রাষ্ট্রের কথা ভাবিতেছে ; দার্শনিক গবেষণায় যেমন, সাহিত্যেও তেমনই নানা ভাবে আমরা তাহার পরিচয় পাই : ইউরোপে যে প্রশ্ন উঠিয়াছে, বাংলার সাহিত্যেও তাহার প্রতিধ্বনি শুনা যায়। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' প্রভৃতিতে ইব্‌সেনের ছায়া স্পষ্ট।

সাহিত্য ও দর্শন-বিজ্ঞানের বিরোধ যদি কখনও থাকিয়া থাকে, তবে আজ তাহা তিরোহিত। দর্শনও এখন ঐহিক জীবনের দিকে, সমাজের দিকে, নীতির দিকে অধিকতর মনঃসংযোগ করিতেছে। অক্সফোর্ডের শীলার প্রভৃতি কেহ কেহ দর্শনের ভাষা সংস্কারের জন্যও সযত্ন। স্পষ্টতঃ একথা সকলে না বলিলেও আধুনিক দার্শনিকদের ভাষা সরল, সরস। জার্ম্মেনীর অয়কেন্, ফ্রান্সের বার্গসোঁ, আমেরিকার উইলিয়ম জেম্‌স্ প্রভৃতির ভাষা সাহিত্যের সালঙ্কার ভাষা হইতে নিতান্ত হীন নহে। কাণ্ট, হেগেল প্রভৃতির ভাষাকে শীলার বর্ব্বর-ভাষার সহিত তুলিত করিয়াছেন।

দার্শনিক যদি কোনও দিন পরশ-মণির সন্ধানে 'পাগল-পারা' ঘুরিয়া থাকেন, তবে আজ তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক যদি কখনও তামাকে সোণা করিবার চেষ্টা করিয়াও থাকেন, তবু আজ আর তাহা তাঁর প্রথম চেষ্টা নহে। দর্শন-বিজ্ঞানের সকল সত্য আজ ইহ জীবনের উন্নতির জন্য—ব্যক্তির ও সমাজের উৎকর্ষের জন্য—প্রযুক্ত করিতে মানব সচেষ্ট। অনেক দার্শনিক আজ ইহ জীবনে অনাবশ্যক—ইহ জীবনের পরিপন্থী—যাহা, তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেও অনিচ্ছুক। জীবনে যাহা প্রয়োজন, যাহার উপর জীবনের ক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহাকেই মাত্র ইহাঁরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে চান।

চারিদিক হইতে আগত বিভিন্ন স্রোতস্বতী যেমন সমুদ্রে মিশিয়া এক হইয়া যায়, বিভিন্ন দিকে প্রধাবিত, মানবের চিন্তাস্রোতও আজ তেমনই ধর্ম্ম, নীতি ও সমাজকে উন্নত করিয়া জীবনকে সুন্দর, সুখদ করিবার উদ্দেশ্যে এক হইয়া গিয়াছে। মানুষের পরিণত চিন্তা আজ নানাভাবে যে এক বিশাল উদ্দেশ্যকে ব্যক্ত করিতেছে, বাঙ্গালার সাহিত্যে বাঙ্গালীও তাহা স্মরণ করিবে, বাংলার সাহিত্যিকগণ যেন এ কল্পনা পরিত্যাগ না করেন।

সাহিত্যের নবীন পন্থা।

আমার বেশ মনে আছে ছেলেবেলায় প্রথম যখন উপন্যাস পড়িতে আরম্ভ করি তখন একটা বিষয় আমার মনটাকে বড়ই আলোড়িত করিয়া দিয়াছিল। দেখিতাম, নায়ক নায়িকা অনবরত প্রেমই করিয়া যাইতেছেন, একে অন্যের নিকট বড় বড় চিঠি লিখিতেছেন; দেখা হইলেই বলিতেছেন, 'ভালবাস'?—'বাসি'; উচ্ছ্বাস, হা-হুতাশ, দীর্ঘনিশ্বাসে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ভরিয়া যাইতেছে; দর্শন, শ্রবণ, মনন সর্ব্বত্রই ঐ 'বঁধুয়া' ভাব; পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, বিরাগ এবং আরও কত কিছু তাতে রহিয়াছে। কিন্তু দেখিতে পাইতাম না একটা জিনিষ, সেটা আর কিছু নয়, নায়ক নায়িকা অর্থাৎ যারা ভালবাসে এবং পরে বিবাহ করে কিংবা বিবাহ করিতে পায় না বলিয়া আফিং খায়, তারাও যে সংসার করিয়া থাকে—তাদেরও যে খাওয়া পরা দরকার হয়, তাদেরও যে ভাইবোন, পিতামাতা থাকে, তাদেরও যে বাড়ী ঘর থাকে এবং তাহা দেখিয়া শুনিয়া রক্ষা করিতে হয়, তাদেরও যে ঝি পালায় এবং চাকরকে শাসন করিতে হয়, তাদেরও যে বন্ধুবান্ধব আসিলে দেখা করিতে হয় এবং 'আহা' 'উহু' ছাড়া অন্যরকম কথাবার্ত্তাও কইতে হয়,—আমার ভাগ্যে প্রথম যে সব উপন্যাস জুটিয়াছিল তাতে এ সত্য কথাটা খুঁজিয়া না পাইয়া আমার মনটা বড় আকুল হইয়া পড়িয়াছিল। তখনও বোধ হয় পূর্ণ যৌবন আসে নাই, তখনও কৈশোরের অজ্ঞতা মন হইতে বোধ হয় একেবারে দূর হয় নাই. তাই উপন্যাসে এক নায়িকা ছাড়া অন্য সব জিনিষেরই অভাব দেখিয়াও তার অর্থ বুঝিতে পারিতাম না।

ক্রমে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় জ্ঞানও একটু বাড়িয়াছিল। তখন জানিতে পারিয়াছিলাম যে, পুরুষ এবং প্রকৃতি ছাড়া জগৎ সৃষ্টির

জন্য আর কিছু আবশ্যক হয় নাই ; এবং নায়ক ও নায়িকা ছাড়া উপন্যাস ও কাব্যের অন্য কোন উপাদান অনাবশ্যক।

অনেক শব্দ আছে যার পূর্ব্বে 'মহচ্ছন্দো ন দীয়তে', দিলে অর্থ অন্যরূপ হইয়া যায় ; যেমন ব্রাহ্মণ ও মহাব্রাহ্মণ, যাত্রা ও মহাযাত্রা। 'কাব্য' এই শব্দটী সম্বন্ধে এই নিয়ম কোথাও কেহ উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া জানি না ; কিন্তু তথাপি রামায়ণ ও মহাভারতকে কাব্য না বলিয়া মহাকাব্য বলায় এই অর্থের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, এরূপ বলা যায় না। প্রেম করা ছাড়া মানুষের জীবনে অন্য যাহা কিছু ঘটে তাহাও অনেক, বোধ হয় সবই, রামায়ণ-মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে ; এই দুইটী সুতরাং কাব্য নয়, মহাকাব্য।

তারপর 'কাদম্বরী', 'বাসবদত্তা', 'বিক্রমোর্ব্বশী' প্রভৃতির যুগ। সেগুলি কাব্য শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে শাসিত। সুতরাং সেগুলিতে শৃঙ্গার রসকে মুখ্য করিয়া তাহারই বিকাশের জন্য অবশ্যই দুই একজন সখা-সখীর আবির্ভাব দেখা যায়—দুই একটা অবান্তর ঘটনারও সন্নিবেশ দেখা যায় ; কিন্তু যে বয়স্য বা যে বিট, প্রভৃতি উপস্থিত হয়, নায়কের প্রেমস্ফূর্ত্তির সাহায্য করা ছাড়া জীবনে তাদের অন্য কোন কাজ করিতে হয়, এরূপ বোধ হয় না ; যে সখীর কথা বলা হয়, তিনি নায়িকা মূর্চ্ছিতা হইলে তাঁহাকে পদ্মপত্রে শয়ন করাইয়া ব্যজন করা ছাড়া অন্য কোন কাজ করেন, এরূপ বলা হয় না ; যে দুই একটা অবান্তর ঘটনার বর্ণনা করা হয় তার মধ্যে স্বপ্নই বেশী। স্বপ্ন দেখা—বিশেষতঃ আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিবিশেষের স্বপ্ন দেখা—আমাদের জীবনে খুব একটী প্রধান ঘটনা নয়। অথচ এ ছাড়া অন্য কোন ঘটনা না হইলেও উপন্যাস চলে। পুষ্পশরের উপদ্রবে অস্থির হইয়া উন্মত্তপ্রায় নায়িকা বলিবেন, 'তরলিকে, তরলয় কৃষ্ণাগুরু-ধূমপটলং ; শশিলেখে,

লিখ ললাটপট্টে শশিলেখং; শৃঙ্গারমঞ্জরি, সঙ্কলয় শৃঙ্গারবচনানি; কাঞ্চনিকে, বিকির কস্তুরীদ্রবম্'—ইত্যাদি। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা নায়িকা এইরূপ প্রলাপ বকিয়া যাইতেছেন, আর উপন্যাসের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। কিংবা নায়কের 'জাগরঃ কৃশতারতিঃ',—হ্রীত্যাগ, উন্মাদ ও মূর্চ্ছা প্রভৃতির বিশদ বর্ণনা করিলেই কাব্যের অঙ্গপুষ্টি হয়।

এই সাহিত্যে বাস্তব মানুষকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এ আদর্শ মানুষও নয়। আদর্শ অর্থে আমরা তাহাই বুঝি যাহা হওয়া উচিত, অথচ হয় নাই। হওয়া উচিত বলিয়াই তাহার বর্ণনা করা, তাহার দিকে মানুষের চিত্তকে আকৃষ্ট করা আবশ্যক। কিন্তু এ যে মানুষের বর্ণনা তাহা বাস্তব মানুষ নয়; কারণ মানুষ কেবলই প্রেমে পড়ে না, আর প্রেমে পড়িলেও অনবরত কেবল প্রলাপ বকিয়া যায় না; গুরুজনের ভয়ে অন্ততঃ তাকে কতকটা সংযত হইয়া থাকিতে হয়। আর এ মানুষ কখনও কোন সমাজে আদর্শ স্বরূপও উপাসিত হয় নাই। এরূপ অবস্থা মানুষের দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, শুধু চিকিৎসকের মতে নয়, শুধু মানুষের সাধারণ অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য অনুসারে নয়, কামশাস্ত্রের মতেও মৃত্যুতেই তাহার অবসান হইবে। কামশাস্ত্র অনুসারে যে দশটী স্মরদশা হওয়ার কথা, তাহার দশমটী মৃত্যু। এই দশম অবস্থা যাহাতে না ঘটে, সেইজন্য সংস্কৃত সাহিত্যিকেরা তাহার পূর্ব্বেই নায়ক নায়িকার মিলন ঘটাইয়া দিয়া থাকেন। সংস্কৃতে বিয়োগান্ত নাটক ও উপন্যাসের অভাব তার সাক্ষী।

ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যে, সাহিত্যের প্রাচীন পন্থা অনুসারে আমরা অবাস্তব চরিত্রের সহিত পরিচিত। কিন্তু সেগুলি অনেক সময় এতই অবাস্তব, মানুষের পরিচিত জীবনধারা হইতে তাহা এতই বিচ্ছিন্ন যে, সেখানে ভাষার ঝঙ্কার, বর্ণনার চাতুর্য্য প্রভৃতি উপভোগ করা

ছাড়া আমরা অন্য বিশেষ কিছু আশা করি না। ঈশপের গল্প কিম্বা পঞ্চতন্ত্রের উপাখ্যান বৃদ্ধেরও মনস্তুষ্টি করিতে পারে; কিন্তু বৃদ্ধ কখনও ভুলিয়া যায় না যে, বনের জন্তুর মুখে ভাষা নাই। আরব্য উপন্যাস সকলেরই মনোরঞ্জন করিয়া থাকে। কিন্তু দৈত্য দানব যে মানুষের জীবনের সহিত সম্পৃক্ত নয়, এ কথা আমরা জানি। কাদম্বরী প্রভৃতি আমরা সেইভাবেই উপভোগ করি।

ইংরেজ রাজত্বে ভারতবর্ষে এক নূতন সাহিত্যের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। বাংলাদেশেই তার প্রভাব সবচেয়ে বেশী। বঙ্কিম সাতসমুদ্র তের নদীর ওপার হইতে সাহিত্য-রাণীর জন্য এক নূতন গয়না তৈয়ার করিয়া আনিয়াছেন। বিলাতী ছাঁচে উপন্যাসই এই নূতন সামগ্রী। এ উপন্যাসে কাদম্বরীর মত শুক-পক্ষীর মুখে প্রণয়ের কাহিনী তুলিয়া দেওয়া হয় না। মেঘ কিম্বা হংস ইহাতে দৌত্য-কর্ম্ম করে না; 'অদৃষ্টমপার্থনদৃষ্টবৈভবাৎ, করোতি সুপ্তির্জনদর্শনাতিথিং'—এই ন্যায় অনুসারে, যাহাকে কখনও চোখে দেখা হয় নাই, যাহার সম্বন্ধে 'শুধু বাঁশী শুনেছি' বলাও সম্ভব নয়, ভাগ্যের জোরে তাহাকেই স্বপ্নে দেখিয়া প্রণয় করিতে চাওয়াও এ উপন্যাসের বর্ণিতব্য নয়। ইহাতে সত্যসত্যই বাস্তব মানুষ, পশুপক্ষীর সম্পর্ক ছাড়া, স্বপ্নে নয়—চোখে দেখিয়া, মানুষীর সঙ্গে প্রেমে পড়ে; এবং গ্রন্থের শেষ সীমা পর্য্যন্ত এই প্রেমেরই পরিণতির জন্য নানাপ্রকার কর্ম্মচেষ্টা দেখাইয়া থাকে। যেমন—'দুর্গেশ-নন্দিনী'।

বিলাত হইতে এই যে নূতন উপন্যাসের ছাঁচ এ দেশে আসিয়াছে, তাহা অনুসরণ করিতে গিয়া এ দেশের সামাজিক অবস্থার প্রতি লেখকেরা সব সময় দৃষ্টি রাখিয়াছেন, এমন নহে। অনেক কাল পূর্ব্বেও বহুবার এই বিলাতী আমদানীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হইয়াছে। কিন্তু

তাহার উত্তরে বরাবরই বলা হইয়া আসিতেছে, 'আনন্দের জন্য উপন্যাস, নিখুঁত সমাজচিত্র এতে না থাকিলেও চলে'। ভালবাসা সব সমাজেই আছে এবং বোধ হয়, সকল ব্যক্তির জীবনেও আছে। কিন্তু সব সমাজের ভালবাসিবার কিংবা ভালবাসা দেখাইবায় প্রণালী এক নয়। বিলাতী আমদানীর বিরুদ্ধে যারা আপত্তি করিতেন তাঁরা এই সবের উপর নির্ভর করিয়াই প্রতিবাদ করিতেন। কিন্তু তথাপি বিলাতী আমদানী রহিত হয় নাই; কারণ, যাঁহারা সাহিত্য-চর্চ্চা করিয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশেরই ইউরোপীয় সাহিত্যের সহিত সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ।

স্ত্রীপুরুষের প্রেমই মানবচিত্তের একমাত্র বৃত্তি নয়। ইহাই সর্ব্বপ্রধান বৃত্তি কিনা সে বিষয়েও ঘোর সন্দেহ চলে। ইহা ঠিক যে, এ বৃত্তি অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত; বর্ষার পার্ব্বত্য নদীর মত ইহা অনেক সংযমের বাধা অতিক্রম করিতে পারে; চিত্তকে সহজেই ইহা আকুল করিয়া দিতে পারে; এবং এ প্রবৃত্তি অনেক সময় মানুষের স্বাভাবিক বিচার-শক্তিরও লোপ করিয়া দিতে পারে। জীবজগতে ইহার স্থান অতি আবশ্যক; এবং ইহার ক্রিয়া অপরিহার্য্য। কিন্তু ইহাই যে চিত্তের সর্ব্বপ্রধান বৃত্তি নয়, তাহা প্রমাণ করাও কঠিন নহে। এ চিত্তবৃত্তি ছাড়া পদ্মযোনির প্রজাসৃষ্টি হয় না সত্য, কিন্তু প্রজারক্ষার পক্ষে ইহা অপেক্ষা মাতার সন্তান-বাৎসল্য অধিক প্রয়োজনীয়। মানবশিশু, অন্ততঃ সভ্যসমাজের মানবশিশু, অবশ্যই পরিবারের কোলে পালিত হয়; এবং এই পরিবার স্ত্রী-পুরুষের মিলন হইতেই উৎপন্ন হয়; এই হিসাবে যৌন প্রেমও প্রজারক্ষার কতক সহায়তা করিয়া থাকে। কিন্তু ইতর জন্তুর সমাজে পরিবার নামক বস্তুটীর একান্ত অভাব না হইলেও অভাব রহিয়াছে; সন্তান পালনে বাঘ কখনও বাঘিনীর কিংবা বিড়াল কখনও বিড়ালীর

সহায়তা করে না। প্রতিপ্রসব কয়েকটী বাদ দিলে ইতর জন্তুর সমাজে প্রজারক্ষা সাধারণ ভাবে মাতৃস্নেহ হইতেই ঘটিয়া থাকে। বিবর্ত্তনবাদ প্রাণিজগতের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছে যে, ইতর প্রাণির জগতে মাতৃস্নেহের ন্যায় পিতৃস্নেহের তেমন একটা বিকাশ দেখা যায় না। সুতরাং স্ত্রী-পুরুষের মিলন হইতে প্রজার সৃষ্টি হয়, কিন্তু প্রজার রক্ষার জন্য ইহা অপরিহার্য্য নহে। সুতরাং যে প্রবৃত্তি স্ত্রী-পুরুষের মিলন ঘটায় তাহাই যে সর্ব্বপ্রধান বৃত্তি, একথা বলা যায় না। মানবচিত্তে যেমন, ইতর জন্তুর চিত্তেও তেমনই ইহা অত্যন্ত প্রবলভাব ধারণ করিয়া থাকে; মাতৃস্নেহের ধীর গম্ভীর স্রোত ইহার খরস্রোতের নিকট বাহ্য অভিব্যক্তিতে সর্ব্বদাই পরাজয় মানিতে বাধ্য; কিন্তু ইহার তীক্ষ্ণ বেগ হাজার পাহাড় পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া চলিলেও ইহার চেয়েও উচ্চ চিত্তবৃত্তি আছে, একথা বোধ হয় যুক্তিতর্কের মুখে অস্বীকার করা যায় না।

শুধু ইতর প্রাণির বেলায়ই যে ইহা সত্য, তাহা নহে। মানুষেরও ইহা সর্ব্বপ্রধান বৃত্তি নহে। ইহার উন্মাদনা যথেষ্ট; তথাপি ইহার মূল্য সব চেয়ে বেশী একথা কে বলিতে চাহিবে? কোন ধর্ম্মশাস্ত্র ইহাকে নষ্ট করিতে না বলিতে পারে, কিন্তু সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই ইহাকে সংযত করিয়া রাখিতে বলে। আর সংসার-বদ্ধ, পরিবার-বদ্ধ মানুষ তাহার সমস্ত জীবন ভরিয়া কেবল এই এক প্রবৃত্তির অনুসরণ কদাপি করে না। জীবনের কোন এক সন্ধিস্থলে ইহার দুর্দ্দম উন্মাদনা আমরা ভোগ করিয়া থাকি বটে, কিন্তু পুরুষ যখন পিতৃত্বের কিম্বা নারী যখন মাতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন কি এই বৃত্তি আপনা হইতেই সংকোচিত হইয়া আসে না?

আর, এ বৃত্তির একান্ত প্রশ্রয় কোনও সমাজ তখনও দিতে পারে না। ইহাকে বিনাশ করিতে কেহ চায় না; নারীকে নরকের

একমাত্র দ্বার যিনি মনে করিয়াছিলেন, প্রচলিত উপাখ্যান বিশ্বাস করিলে, সেই শঙ্করাচার্য্যও এ প্রবৃত্তিকে একেবারে বিনাশ করিতে পারেন নাই। সুতরাং চাহিলেও ইহার একান্ত লোপ রক্ত মাংসের দেহে অসম্ভব। কিন্তু সব সমাজই ইহাকে সংযত রাখিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। তথাপি যে কিরূপে এবং কেন ইহা সাহিত্যের সাড়ে পোনর আনা দখল করিয়া বসিয়াছে--কিরূপে যে আদিরসই প্রধান রস হইয়া পড়িয়াছে, তাহা একটী কৌতুহলোদ্দীপক প্রশ্ন। এ বৃত্তি ছাড়া যে সাহিত্যের উপাদান নাই, তাহা নহে। পরীর কেস্সা, ঈশপের গল্প, প্রভৃতি যে গুলিকে আমরা এখন শিশু-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করি, তাহাও সাহিত্য; অথচ সেখানে ইহার গন্ধও নাই। বেদ, বাইবেল, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিও সাহিত্য; সেখানেও ইহা মূল বর্ণনীয় বিষয় নহে। রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য,' 'গীতাঞ্জলি' প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, সেখানেও ইহার অস্তিত্ব নাই। কিন্তু তথাপি জগতের কাব্য ও উপন্যাসে যে ইহা সর্ব্বপ্রধান উপাদান, তাহার কারণ কি?

অবশ্যই সাহিত্যিকের বয়স এই প্রশ্নের আংশিক উত্তর দিতে পারে। মানুষের অন্যান্য ক্রিয়ার ন্যায় সাহিত্য সেবাও শক্তির প্রাচুর্য্য যতদিন বর্ত্তমান থাকে ততদিনই পূর্ণবেগে চলিয়া থাকে। অথচ শারীরিক ও মানসিক শক্তি যতদিন পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান থাকে, ততদিন এই প্রবৃত্তির হ্রাস হয় না; ইহাই কি সাহিত্যে আদিরসের প্রাধান্যের কারণ? বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের লেখার দিকে চাহিলে মনে হয় তাহাই। রবীন্দ্রনাথের জীবনে 'কড়ি ও কোমল' ও 'গীতাঞ্জলির' যুগ এক নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথও জীবনের শেষ অঙ্কে 'ঘরে বাইরে' লিখিতে পারিয়াছেন; আজ যখন তাঁহার ভক্তেরা তাঁহার ঋষিত্ব প্রতিপাদনের এবং তাঁহার কাব্যের সহিত বেদের মন্ত্র-ব্রাহ্মণের সাম্য

প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতেছেন ;—সেই সময়েও রবীন্দ্রের লেখনী একটা অনেকেরই মতে নিন্দিত প্রেমলীলা প্রসব করিতে পারিয়াছে। সুতরাং যদিও সাহিত্যিকের বয়স অনেক সময় তাঁহার লেখার রস নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়, তথাপি সর্ব্বদাই এ নিয়ম ঠিক নয়।

সাহিত্যে শৃঙ্গার রসের প্রাধান্যের মূল কারণ বোধ হয় এই রসের প্রবল উন্মাদনা। এ প্রবৃত্তির দুর্দ্দম উত্তেজনায় জীবের জীবনে যত ঘটনা ঘটিয়া থাকে, অন্য কোন প্রবৃত্তি হইতে তাহা হয় কিনা সন্দেহ। মাতৃস্নেহ প্রভৃতি প্রবৃত্তি ধীর, প্রশান্ত ক্ষীর-নদীর ন্যায় জীবের জীবনে ক্রিয়া করিয়া যায়; তরঙ্গায়িত পার্ব্বত্যনদীর সফেণ বারিরাশির ন্যায় ইহা কুলঙ্কষা গতিতে দুইদিক বিক্ষোভিত করিয়া চলে না। অবশ্যই ইতর প্রাণিজগতে মাতৃত্বকেও অনেক সময় সমরে অবতীর্ণ হইতে হয়, সন্তানের রক্ষার জন্য মাতাকেও অনেক সময় জীবনপাত করিতে হয়; কিন্তু একই সন্তানকে দুইমাতা নিজের বলিয়া দাবী করিতে সেই কাজীর উপাখ্যানের বাহিরে বড় দেখা যায় না। মানব-সমাজে অর্থলিপ্সা ইতিহাসের বহু ঘটনার জন্য দায়ী; আর যৌন প্রবৃত্তি শুধু মানব-সমাজে নয় সমস্ত জীবজগতে প্রতিদিন নানা ঘটনার জননী হইতেছে।

স্ত্রীনিমিত্ত বৈর ট্রয়ের যুদ্ধ ও লঙ্কার যুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া যে সমস্ত হত্যা ও আত্মহত্যার কাহিনী আধুনিক সংবাদ পত্রের স্তম্ভ ভরিয়া রাখে সে পর্য্যন্ত, বহু ঘটনার কারণ হইয়া আসিতেছে। যে কারণেই হউক, সাহিত্যে আদিরসই প্রধান। কালিদাস, ভবভূতি, সুবন্ধু, বাণভট্ট প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া জয়দেব পর্য্যন্ত, ভারতচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত আদিরসকে কেহই অবহেলা করিতে পারেন নাই; বরং সকলেই উহাকে উচ্চ আসন দিয়াছেন। আদিরসের সাম্রাজ্য এখন প্রতিষ্ঠিত, তাহার বিরুদ্ধে অভিযান করার এখন আর

সময় নাই। কিন্তু তথাপি অনেকে যে জাহাজভরা বিলাতী শৃঙ্গার-রস আমদানী করিতেছেন এবং নূতন জিনিষ বলিয়া তাহার সাফাই গাহিতেছেন, তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার সময় এখনও আছে। বিলাতী ঢংয়ের প্রেম আমরা অনেক হজম করিয়াছি; বেড়াইতে গিয়া কিংবা নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়া হঠাৎ চারি চক্ষুর মিলন হইল এবং তাহাই সাড়ে চার শ পৃষ্ঠার এক বইয়ের বীজ হইল, বাংলা সাহিত্য এরূপ বহু দৃষ্টান্ত বক্ষে ধারণ করিতেছে। এরূপ প্রেমের কাহিনী, বলিতে গেলে, আমাদের সাহিত্যে এখন পুরাণ হইয়া গিয়াছে। তাই নবীন-পন্থীরা ইহার চেয়েও নূতন কিছুর আমদানীর চেষ্টা করিতেছেন।

সমাজে বিবাহিতা নারীর স্থান কোথায় আমাদের শাস্ত্র ও আচার তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে। বিলাতেও তাহা নির্দ্দিষ্ট ছিল। কিন্তু যে দেশের রমণীরা শুধু টেলিগ্রাফের কল টিপিতে ও পোষ্ট আফিসের সিল মারিতে পারে এমন নয়, কারখানায় বসিয়া গোলাগুলি তৈয়ার করিতে এবং লাঠি হাতে করিয়া রাস্তায় পাহাড়া দিতেও পারে, সে দেশের নারীদের জানিবার ইচ্ছা হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, তাহারা পুরুষের অধীন না সমকক্ষ। বিবাহ করিলেও পুরুষের যে স্বাধীনতা ও বাহিরের সহিত যে সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ থাকে, নারীর কেন তাহা ক্ষুণ্ণ হইয়া যাইবে, নারী কেন তাহার নাম গোত্র সমস্ত ত্যাগ করিয়া নিজের পৃথক্ সত্তা সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিবে? ইংলণ্ডে এই প্রশ্ন অনেকদিন হইল উঠিয়াছে। দর্শনে জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল ও কাব্যে লর্ড টেনিসন এবং কার্য্যে মিসেস্ পাঙ্খ্যার্ষ্ট (Mrs. Pankhurst) প্রমুখ রমণীগণ তাহার সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

ইংলণ্ডের বাহিরে ইউরোপের অন্যত্রও এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। ইব্‌সেন্ প্রমুখ নবীন যুগের সাহিত্যিকেরাই তাহার প্রমাণ। এবং

বাংলা সাহিত্যেও যে তাহার প্রতিধ্বনি উঠিয়াছে, যদি বুঝিয়া থাকি তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' ও 'ঘরে বাইরে' তাহার প্রমাণ।

কিন্তু ইউরোপেও বাস্তবিক উহা একটী স্বাভাবিক, ন্যায্য প্রশ্ন কিনা সে বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করিয়াছেন। স্ত্রীজাতির তথাকথিত মুক্তি সম্বন্ধে যে একটা ধারণা উঠিয়াছে, ট্রেইচ্‌কে (Treitschke) ইহাকে অশুভকর (Unfortunate) বলিয়াছেন। এবং তাঁহার মতে ইহার কারণ ইউরোপীয় সমাজে অস্বাভাবিক বিলম্বে বিবাহপ্রথা এবং তাহার নিমিত্ত নারীর পণ্যতা। *

পত্নীকে আমরা পাশে রাখিব না মাথায় রাখিব—নিজের সমকক্ষ মনে করিব না উপাস্য মনে করিব, কিংবা হিন্দুর শাস্ত্রবিধান অনুসারে উপাসক মনে করিব—তাহাই বোধ হয় প্রশ্ন নহে। ইউরোপের নবীন সাহিত্যে উপরিস্থ বাগ্‌বিতণ্ডার নীচে যে গভীর সমস্যা রহিয়াছে, তাহা পত্নীর আসন নিয়া নহে, নারীর স্থান নিয়া। নারীত্বের সমাপ্তি কোথায়—পত্নীত্বে না মাতৃত্বে, ইহাই আজ বাস্তবিক জিজ্ঞাস্য। উপন্যাসে এতকাল ইউরোপে এবং তাহার অনুকরণে

* তাঁহার কথার ইংরেজী অনুবাদ এই —"Through the unnatural lateness of marriages, prostitution has become so extensive, and flaunts itself with such impudence, that even the tone of intercourse in society has been vitiated by it. Thence the unfortunate idea of emancipation of women." তিনি আরও বলেন,—"If woman believes she is able to make an impression upon us in daily intercourse by masculine means, if she seeks to impress us by terrifying looks, it has the opposite effect and the social boorishness arises that has gained so strong a hold at the present time"—'রমণী যদি মনে করেন যে পুরুষোচিত ব্যবহার দ্বারা কিংবা রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিধারণ করিয়া তিনি আমাদের চিত্তে প্রভাব বিস্তার করিবেন, তবে তাহার ফল বিপরীতই হইবে, এবং সামাজিক ব্যবহারে অধুনা নারীর প্রতি যে গ্রাম্য কর্কশ ভাব বদ্ধমূল হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই উৎপত্তি হইবে।'

বাংলাদেশেও নারীকে শুধু পুরুষের প্রেমার্থিনী করিয়াই চিত্রিত করা হইতেছিল এবং পত্নীত্বে কিংবা উপপত্নীত্বেই তাহার নারীত্বের পরিসমাপ্তি মনে করা হইত। কিন্তু আজ জিজ্ঞাস্য হইয়াছে, নারী কি শুধু ভোগের বস্তু—এই বিশ্ব জগতে কি নারীর এর চেয়ে উচ্চ কোন স্থান নাই? হাব, ভাব, মোট্টায়িত, কুট্টমিত প্রভৃতি অষ্টাবিংশতি সত্ত্বজ বিকার দ্বারা পুরুষের চিত্তকে হরণ করিয়া, তাহার লালসা চরিতার্থ করাই রমণীর জীবনের একমাত্র ব্যবহার নহে। বিভ্রমাদি দ্বারা হৃতচিত্ত পুরুষের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনই যে নারীর জীবনের একমাত্র উপযোগিতা নয়, সমস্ত বিশ্ব জুড়িয়া তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। পশুর সমাজে, পক্ষীর সমাজে, সর্ব্বত্রই নারী যে বিভ্রমাদি দ্বারা পুরুষের চিত্ত আকর্ষণ করে সে শুধু তার মাতৃত্বের উপক্রমণিকা মাত্র। মানুষের সমাজের বাহিরে কোথাও নারী পণ্য নহে—আর কোথাও নারী শুধু ভোগের বস্তু নহে। সুতরাং মানুষের সমাজের বাহিরে কোথাও এ প্রশ্ন উঠিতে পারে না যে, পুরুষ কি নারীকে টুপীর মত মাথায় রাখিবে না চাদরের মত গলায় রাখিবে কিংবা জুতার মত পদানত রাখিবে। ভোগের বস্তু—সহধর্ম্মিণী নয়, সহচারিণী—করিয়া নিয়াছে বলিয়াই মানুষের সমাজে পুরুষকে নারীর সম্বন্ধে এই প্রশ্ন তুলিতে হইয়াছে। প্রকৃতিতে নারী যে পুরুষের সঙ্গিনী হয়, সে শুধু তাহার মাতৃত্বের বিকাশের জন্য। সেই জন্য নারী দাসী না সখী, এই প্রশ্ন সেখানে উঠে না।

সুতরাং উপন্যাসে যে রমণীর কুন্তলদাম ও তাহার পটল-চেরা ডাগর চক্ষুর বর্ণনা পাই, এবং এ সব পুরুষের চিত্তে যে বিকার আনয়ন করে তাহার যে দীর্ঘ ইতিহাস পাই, তাহা যদি মানবজীবনের সম্পূর্ণ ইতিহাস হইত, তবে নিশ্চয়ই উহা স্বভাব ও আদর্শ উভয়েরই

বিরোধী হইত। তবে উপন্যাসের পক্ষে বক্তব্য এই যে, ইহা মানব জীবনের একটী অধ্যায়মাত্র—পরিপূর্ণ ইতিহাস নহে। কিন্তু সাহিত্যে নবীন-পন্থীরা মনে করিতেছেন, পুরুষ ও নারীর মধ্যে পতি-পত্নীরূপে যে সম্বন্ধ হয় তাহাই এই নিখিল বিশ্বের চরম সত্য ; ইহার চেয়ে গরীয়ান্, ইহার চেয়ে মূল্যবান্ সত্য জগতে আর কিছুই নাই। যে দেশে স্বীয়া ব্যতীত পরকীয়া এবং সাধারণী নায়িকাও সাহিত্যে গৃহীত হইয়াছে, যে দেশে পরের স্ত্রী ও পণ্যস্ত্রীর সঙ্গে প্রেমও সাহিত্যশাস্ত্র মঞ্জুর করিয়াছে,—সে দেশে ইহা নিতান্তই নূতন কথা নহে। কিন্তু বিলাত-ফেরত বাঙ্গালীর মত ইহা নূতন ঢংয়ে এ দেশে উপস্থিত হইয়াছে। শাস্ত্র-শাসিত, অসংখ্য বেদান্ত-নির্জ্জিত সংস্কৃত সাহিত্যে অন্যান্য ভোগ্য বস্তুর ন্যায় নারীর প্রেমভোগকেও ভোগ্য মাত্রই মনে করা হইত— ইহাকে মোক্ষলাভের উপায় মনে করা হয় নাই। বিবাহ ধর্ম্ম বটে, কিন্তু সে ভোগ দিতে পারে বলিয়া নয়, পুত্র দিতে পারে বলিয়া। পুত্রলাভই ধর্ম্ম, নারী-ভোগ ধর্ম্ম নহে ; এবং এ উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহা বুঝাও কঠিন নহে। সংস্কৃত সাহিত্যে সুতরাং ঔপন্যাসিক নারীপ্রেমের স্থান অন্যান্য ভোগ্য বস্তুর সহিত এক সমভূমিতে। কিন্তু বিলাত-হইতে যে নূতন পোষাক পড়িয়া ইহা এদেশে আসিয়াছে, তাহাতে মনে হয় যেন ইহাই চতুর্ব্বর্গলাভের একমাত্র উপায়। যে দেশের পত্নী শ্মশান পর্য্যন্ত পতির অনুসরণ করিতে পারিত, পত্নী যে পতিকে ভালবাসিতে পারে, একথা সে দেশের লোক জানিত না এমন নহে। কিন্তু এ চারি চক্ষুর মিলন-প্রসূত, পূর্ব্বরাগ-সঞ্চিত, কাব্যালাপ-সন্ধুক্ষিত প্রেম নহে, ইহা বিবাহের ধর্ম্মবন্ধ-সম্ভূত প্রেম। আর মোক্ষ লাভের নূতন উপায় যে বিলাতী প্রেম তাহা কি এই ধরণের ? পার্ব্বতী যে মহাদেবের চিত্ত হরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা 'বল্' নাচের

রঙ্গীণ পোষাক পরিয়া নয়, ডাগর চোখের অপাঙ্গ-দৃষ্টি দ্বারা নয়,—কিন্তু পূজা করিয়া, বল্কল পরিধান পূর্ব্বক কঠোর তপশ্চর্য্যা দ্বারা; প্রেম যদি কখনও মোক্ষলাভের উপায় হয়, তবে এইরূপ প্রেমই হইতে পারে। কিন্তু বিলাতী প্রেম কি এই ধরণের?

ঐহিক ভোগের উপর যাদের সমস্ত জীবন প্রতিষ্ঠিত, প্রধান ভোগ্যবস্তু নারীর তাহারা একরূপ সাদর ব্যবহার করিয়া থাকে। এদেশের নবীন সাহিত্য ইউরোপ হইতে তাহা ষোল আনা গ্রহণ করিয়াছে। নারীর আত্মা শুধু ভোগ্যবস্তুর উপযুক্ত আদরে সন্তুষ্ট না থকিয়া ইউরোপে যে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে, সে দেশের সাহিত্যে ও জীবনে তাহা ক্রমশঃ তীক্ষ্ণবেগে ফুটিয়া উঠিতেছে। এদেশে সে প্রশ্ন না উঠিলেও, ইউরোপ হইতে ধার করিয়া বাংলার নবীন সাহিত্য তাহাও গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু আমরা ভুলিয়া যাইতেছি যে, প্রশ্নটী বাস্তবিক ভালবাসার সামগ্রী পত্নীর বিষয়ে নয়, জীব জগতের অর্দ্ধাঙ্গ নারীর বিষয়ে। যে নারী নিজকে শুধু পত্নীত্বে পর্য্যবসিত করিতে চায়,—পুরুষের প্রেমের উন্মত্ত আমোদ মাত্র উপভোগ করিতে চায়, কিন্তু মাতৃত্বের মধুর দায়িত্ব, উপাস্য অথচ কঠোর সম্পদ্ গ্রহণ করিতে চায় না, সে ভ্রান্ত। আর যে পুরুষ কামচর্চ্চার উৎসবে শুধু মত্ত থাকিতে চায়, পিতৃত্বের কঠোর কর্ত্তব্য গ্রহণ করিতে চায় না, সেও ভ্রান্ত। আর যে দেশের স্ত্রীপুরুষ প্রেম হইতে দায়-শূন্য অসংযত ভোগ মাত্র লাভ করিতে চায়, পরিবার প্রতিষ্ঠার গুরুভার, সন্তান প্রতিপালনের পুণ্যব্রত গ্রহণ করিতে চায় না, সে দেশ ধ্বংসের পথে পা দিয়াছে। আর যে সাহিত্য স্ত্রী-পুরুষের মিলনে কামনা চরিতার্থ করিবার উপায় ভিন্ন অন্য কোন দায়িত্ব দেখিতে পায় না, সে সাহিত্য সমাজের চরম বিকারের অন্যতম উপায়। এই মহৎ সত্য ইউরোপের কেহ কি বুঝে নাই?

দেখিতে পাই, উপন্যাসের উদ্দেশ্য বাহির করিতে গেলে ঔপন্যাসিক অনেক সময় অসন্তুষ্ট হন। জানি না অসৎ উদ্দেশ্য ধরা পড়িলেই এইরূপ ক্রোধ হয় কিনা। কিন্তু তথাপি টলষ্টয়ের "য়্যানা কারেনিন্" (Anna Karenin) নামক প্রসিদ্ধ উপন্যাসে কি ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করা হয় নাই যে, যে নারী উন্মাদক রূপের সাহায্যে হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে বলিয়া নিজেকে শুধু ভোগ্য মাত্র মনে করে, সে প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে যায়? সেখানে কি টলষ্টয় ইহাই বলিতে চেষ্টা করেন নাই যে, নরনারীর প্রেম পরিবার স্থাপনের প্রথম সোপান মাত্র এবং মাতৃত্বেই নারীত্বের পূর্ণ বিকাশ? মানবজীবন শুধু একটা যৌন প্রেমের অপরিচ্ছিন্ন কাহিনী নহে; কঠোর কর্ত্তব্য ইহাতে প্রচুর রহিয়াছে; এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কর্ত্তব্য সন্তানের প্রতি মাতার ও পিতার কর্ত্তব্য। এ দায়িত্ব অবহেলা করা শুধু ধর্ম্মবিরুদ্ধ নয়, অস্বাভাবিক।

মানব সমাজের বাহিরে জগতের কোথাও পণ্য নারী নাই। মানুষের সমাজে যে নারী মাতৃত্বকে অবহেলা করিয়া রূপ বিক্রয় করিয়া জীবন যাপন করে, ইহা কি অস্বাভাবিক নয়? টলষ্টয়ের য়্যানা কারেনিন্ তাহা বুঝেন নাই, এবং বুঝেন নাই বলিয়াই গৃহ, স্বামী, আট বছরের একটী পুত্র, সকলকে ত্যাগ করিয়া পর পুরুষের সঙ্গে প্রেম করিতে ঘরের বাহির হইয়াছিলেন। স্বভাবের বিরুদ্ধে এই শোচনীয় অভিযানের ফলে স্বভাবেরই বিরুদ্ধ মৃত্যু—আত্মহত্যা, তাঁহার শেষ গতি হইয়াছিল।

রাজ্য বিস্তার করিতে, রাষ্ট্রশক্তি বর্দ্ধিত করিতে, সমস্ত পৃথিবী শ্বেত জাতির পদানত করিতে, ইউরোপীয় জাতিরা ব্যস্ত; তাহাদের দৃষ্টি এখনও অন্তর্মুখীন হয় নাই, এখনও একটা গুরুতর কলরব না উঠিলে, সমাজ-দেহে কোন গুরুতর পৃষ্ঠাঘাত রোগ দর্শন না দিলে, তাহারা সমাজের দিকে দৃষ্টি করিতে যায় না। আজ ইউরোপের সমাজে নারী সর্ব্বতোভাবে

পুরুষের সহিত সাম্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে! একজনের স্ত্রী হওয়াই নারী জন্মের শেষ লক্ষ্য মনে করিলে এই প্রশ্ন উঠিত কিনা সন্দেহ! যে কারণেই হউক, এই আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু ইউরোপীয় জাতিরা যেন চাহে, তাড়াতাড়ি ইহার একটা মীমাংসা করিয়া দিয়া তাহাদের পরিপূর্ণ একাগ্রতা আবার রাজ্যবিস্তারের দিকে নিবিষ্ট করে। তাই, নারীর এই দাবীর মূলে যে স্বভাবের বিদ্রোহ, মাতৃত্বের পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, সকলে তাহা দেখিতে পাইতেছেন না। তাই অনেকে মূল রোগ উপেক্ষা করিতেছেন, এবং সহজেই চক্ষে পড়ে বলিয়া তাহার একটী উপসর্গ মাত্র নিয়া মস্তিষ্ক ক্ষয় করিতেছেন, এবং তাই নারীর অস্বাভাবিক দাবীর ফেনিল আবর্ত্ত সাহিত্যকে বিক্ষুব্ধ করিয়া দিতেছে।

বেদ দার্শনিক কূট তর্কে পূর্ণ নহে; সহজ, সরল ভাষায় মানুষের সকল আকাঙ্ক্ষা তাহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাইবেল কোনও এক অজানা দেশের অজানা কথায় পূর্ণ নহে; পৃথিবীর সকল সুখদুঃখও তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে। বেদ-বাইবেলও সাহিত্য—এখনও সকলেরই মতে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। কিন্তু যে দিন হইতে নারীর প্রতি পুরুষের বিকট তৃষ্ণাকে সাহিত্য তাহার প্রধান সামগ্রী বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে, জানিনা সে দিন হইতে মানব সমাজ কোন্ দিকে চলিয়াছে। একথা কেহ অস্বীকার করে না যে, মানুষের সকল সুখদুঃখের প্রকাশ সাহিত্যে হইবে; একথা কেহ বলিতে চায় না যে, সাহিত্য কেবলই সন্ন্যাস-ধর্ম্ম প্রচার করিবে; একথা কেহ বলিতে চায় না যে, পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোনও প্রেমের বন্ধন থাকা উচিত নহে। কিন্তু ঔপন্যাসিক প্রেমই মানুষের সুখ দুঃখের একমাত্র কারণ নহে। গৃহে, রাষ্ট্রে, সমাজে, মানুষের অন্য বহুবিধ সম্বন্ধ আছে। পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ এসকল সম্বন্ধ হইতে

বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলে যে কি অসংযত উত্তেজনার উৎপত্তি হয় তাহা বুঝা কঠিন নহে।

স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধের মধ্যে যে একটা গুরু কর্ত্তব্য, একটা দায়িত্ব, একটা ধর্ম্ম রহিয়াছে, তাহা ভুলিয়া গিয়া সাহিত্যের নবীন পন্থা রমণীর যে চিত্র উদ্ভাবিত করিতেছে, তাহাতে রমণীকে শুধু পুরুষের প্রেমার্থিনীই দেখিতে পাই, তাহার শেষ পরিণতি যে সেখানে নয়, একথার দিকে লক্ষ্য দেখিতে পাই না। রমণী যে কেবল নায়িকা নয়, গার্হস্থ্য জীবনের সঙ্গিনী, সে যে শুধু বিলাসিনী নয়, পরিবারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, একথা ত কেহ মনে রাখিতে চায় না। রমণীর প্রেম যে শুধু পুরুষকে সম্মোহিত করিবার জন্য নয়, পৃথিবীতে সন্তান-কাকলি-পরিপূরিত, কল-হাস্যমুখরিত গৃহের স্বষ্টির জন্য—তাহার মোহিনী শক্তি যে সংসার ও সমাজ উৎসন্ন করিয়া দিবার জন্য নয়, গৃহে ও সমাজে শান্তি আনয়নের জন্য, এবং পুষ্পের সৌরভের ন্যায় রমণীর জীবনের সমস্ত মাধুর্য্য যে তাহা হইতে অন্য জীবনের উৎপত্তি ও বিকাশের জন্য, অধিকারের এক অস্বাভাবিক প্রশ্ন তুলিয়া নবীন সাহিত্য আজ তাহা ভুলিতে বসিয়াছে।

যাহাদের সংহিতা বলিয়াছিল, "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ"—তাহারা নারীর সম্মান করিতে জানিত; কিন্তু সে বিলাসিনী বরবর্ণিনী রূপে নয়, আদ্যা জননীর অংশ রূপে; এ সম্মান তার স্ত্রীত্বের নয়, মাতৃত্বের। কবে আমরা ভাবিতে শিখিব যে নারীত্বের পরিসমাপ্তি পত্নীত্বে নয়, মাতৃত্বে; কবে আমাদের সাহিত্য অস্বাভাবিক ভোগতৃষ্ণা সংযমিত করিয়া পবিত্র ভাব ধারণ করিবে?

সাহিত্য ও সাহিত্যিক।

স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর বনিবনাও না হইলে, প্রতীচীর আইন উভয়ের পৃথক্ বাসের ব্যবস্থা দিয়া থাকে। আইনের ভাষায় এর একটা বিশিষ্ট নামও রহিয়াছে। কিছুদিন হইল, সংস্কৃত ব্যাকরণের জুলুম সহ্য করিতে না পারিয়া বাংলা ভাষা, কিংবা বাংলা ভাষায় ব্যভিচার সহ্য করিতে না পারিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ, পরস্পরের ছাড়াছাড়ির জন্য চেষ্টা করিতেছিল। বাংলার সাহিত্য-বিচারকদের চূড়ান্ত বিচারে অতঃপর এ উভয়েব পৃথক্ বাসেরই ব্যবস্থা হইয়াছে। সুতরাং পাণিনির মতে 'সাহিত্যিক' শব্দের ব্যুৎপত্তি হয় কিনা, এরূপ একটা কটমট বৈয়াকরণিক গবেষণার গোলক-ধাঁধাঁয় কাহারও বুদ্ধিকে আমরা জর্জ্জরিত করিয়া তুলিব, এ বিভীষিকার কোন কারণ নাই। যে ভাবেই হউক, 'সাহিত্যিক' কথাটী বাংলায় ঢুকিয়াছে; সে সংস্কৃত না অসংস্কৃত ইত্যাদি প্রশ্ন তুলিয়া এখন আর তার জাতিবিচারে কোন লাভ নাই। কিন্তু সে যে একটী বস্তুবাচক সেই বস্তুর গুণ সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিবার সময় এখনও যায় নাই। এখনও আমাদের জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আছে 'সাহিত্যিক' অর্থে কাহাকে বুঝিব।

কোনও সর্ব্বদা ব্যবহৃত শব্দের ন্যায়-সিদ্ধ সংজ্ঞা দিতে চেষ্টা করার মত দুষ্কর্ম্ম আর নাই। আমরা সকলেই ইচ্ছা করি যে, আমরা সর্ব্বদা যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করি তার অর্থের মধ্যে কতকটা স্থিতিস্থাপকতা থাকে—গালান মোমের মত সে যেন অনায়াসে একটু এদিক ওদিক নড়িতে পারে, অথচ তাহাতে যেন তাহার নিজত্ব একেবারে নষ্ট হইয়া না যায়। এ অবস্থায় কেহ যদি জোর করিয়া কোনও একটা শব্দকে কোনও একটা অর্থের সহিত পার্ব্বতী-পরমেশ্বরের মত সম্পৃক্ত করিয়া দিতে চায়, তাহা হইলে আমরা সহজেই একটু অসন্তুষ্ট হই। সাহিত্যিক শব্দটিও

ঠিক এই প্রকারের। গুণের সঙ্গে দ্রব্যের কিংবা ক্রিয়ার সহিত কর্ত্তার যেরূপ সম্বন্ধ, সাহিত্যের সহিতও সাহিত্যিকের সেইরূপ একটা সম্বন্ধ, এ মোটা কথাটা আমরা সকলেই বুঝি। সাহিত্যের যিনি চর্চ্চা করেন তিনিই সাহিত্যিক। কিন্তু এর উপর যদি জিজ্ঞাসা করা হয় চর্চ্চা মানে কি, তাহা হইলে আমরা যথাসম্ভব বিস্তৃত অর্থ গ্রহণ করিতেই ইচ্ছা করি। সাহিত্যের অধ্যয়নও চর্চ্চা, তার অধ্যাপনও চর্চ্চা; আর সাহিত্য-পাঠকদের সহায়তার নিমিত্ত তার ব্যাখ্যা-পুস্তক প্রণয়নও কতকটা চর্চ্চা বই কি! এবং সাহিত্যের সৃজন যে তার সর্ব্বাপেক্ষা বড় রকমের চর্চ্চা সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। ইহার যে কোন রকমের চর্চ্চা যিনি করেন তাঁহাকেই যে আমরা সাহিত্যিক বলিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ধরিতে পারা যায় এমন যে কোনও একটা উদ্দেশ্য নিয়া যিনি ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন, অতি বিস্তৃত অর্থে আমরা তাঁহাকেই সাহিত্যিক মনে করিয়া থাকি। কিন্তু এই উদারতার মধ্যে একেবারেই কোনরূপ সংকীর্ণতা নাই এমন নহে। পণ্য দ্রব্যের বিশেষতঃ ঔষধের বিজ্ঞাপনে অনেক সময় নানা অলঙ্কারে, বিশেষতঃ অতিশয়োক্তি অলঙ্কারে সমলঙ্কৃত পদবহুল, সরস, বাক্যবিন্যাস পাওয়া যায়। দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া যাহারা এরূপ সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেছেন, তাহাদিগকে সাহিত্যিক বলিয়া গ্রহণ না করা যে অনুদারতার পরিচায়ক, তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন।

যদিও আমরা সাহিত্য বলিতে যথাসম্ভব বিস্তৃত অর্থই গ্রহণ করিয়া থাকি, যদিও 'নটরাজ শিবের' বাসস্থান নির্ণয় হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুর পর-পার সম্বন্ধে কবিতা পর্য্যন্ত, সায়েস্তা খাঁর সময়ে চাউলের দর হইতে আরম্ভ করিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপকারিতা

পর্য্যন্ত, জগতের আদিকারণ ব্রহ্ম না প্রকৃতি এই প্রশ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া শিশুশিক্ষার পক্ষে মদনমোহনের বই ভাল না ম্যাকমিলনের বই ভাল এই তর্ক পর্য্যন্ত, গোলাপের গুণ বর্ণনা হইতে আরম্ভ করিয়া মণ্টেসরি অপেক্ষা কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীর প্রাধান্য স্থাপন পর্য্যন্ত—যে কোন বিচারে, যে কোন বিষয়ে ভাষা রচনা করা যায় তাহাকেই আমরা সাহিত্য বলিতে প্রস্তুত, তথাপি সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান কি এই প্রশ্ন তুলিলে সাহিত্যিকদের মধ্যে মতভেদ হইবে। কবি বলিবেন, বিক্রমাদিত্যের ক'টা হাতী ছিল এই বিচারে যে ভাষা খরচ করা হয়, তার নাম সাহিত্য নয়; কবির দাবী অগ্রাহ্য না করিয়াও হয়ত দার্শনিক বলিবেন, আকাশে রামধনু উঠে কিংবা মেঘ দেখিলে ময়ূর নাচে, কেবল এই সব কথা ভাবিয়া যে ভাষার স্ফুরণ হয়, তাহাই সাহিত্যের একমাত্র উপাদান নহে।

যেখানে কলহ হয়, কলহের শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সেখানে না যাওয়াই অনেক সময় বুদ্ধিমানের কাজ। বিবদমান সাহিত্যিকগণ তাঁহাদের কলহের মীমাংসা করিতে থাকুন, আমরা আপাততঃ কোন পক্ষভুক্ত হইতে চাই না। তবে, আমাদের মনে হয়, সাহিত্যের উদার অর্থ গ্রহণ করাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ্ পন্থা। পদ্য ও গদ্য কাব্য যে সাহিত্যের প্রায় পোনর আনা অধিকার করিয়া বসিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সাহিত্যের এই সংকীর্ণ অর্থের পক্ষে সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাসের সাক্ষ্যই যথেষ্ট প্রমাণ। কিন্তু তথাপি একটু বিস্তৃত অর্থ গ্রহণ না করিলে সাহিত্য সামগ্রীটী নিতান্তই হাল্কা হইয়া যায়। মানুষের মনের পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ যে সব ক্রিয়া ভাষায় প্রকাশ পায়, তাহাই সাহিত্যের উপাদান। সুতরাং সাহিত্য ভাষায় মানুষের স্বপ্রকাশ; এবং যিনি কোন বিষয়ে সুচিন্তিত,

সুসম্বদ্ধ ভাব ভাষায় প্রকাশ করেন তিনিই সাহিত্যিক। পোষ্টাফিসের কুইনাইনের বিজ্ঞাপন যিনি লিখিয়াছিলেন, তাঁহাকে সাহিত্যিক বলিব না, কারণ, "যে পরিবার কুইনাইন ব্যবহার করে না" ও "যে পরিবার কুইনাইন ব্যবহার করে" এ দুইয়ের ছবি ছাড়া, "এক মোড়ক কুইনাইনে বিশ দিন জ্বর নিবারণ করে"—ইহার বেশী তিনি কিছুই বলেন নাই। কিন্তু আমার মনে হয়, এই কুইনাইন সম্বন্ধেই যদি কেহ একটী প্রবন্ধ লিখিয়া সাহিত্যের আসরে উপস্থিত করেন, তবে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে।

সাহিত্যই যে মানুষের আত্মপ্রকাশের একমাত্র উপায়, তা নয়। চিত্র, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য—সমস্ত কলাবিদ্যাই মানুষের চিন্তা ও অনুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকে। দেহে অবয়বের সহিত অবয়বের যে সম্বন্ধ, কোনও এক জাতির আত্মপ্রকাশ হিসাবে এই কলা সমষ্টির প্রত্যেকটীর সহিত প্রত্যেকটীর সেই সম্বন্ধ। যে জাতির মন যে পরিমাণে পুষ্ট, তাহার বেলায় এই সমবায়-সম্বন্ধ তত স্ফুট; এবং যে জাতির ইহাদের কোনও একটীর অভাব কিংবা অপূর্ণতা রহিয়াছে, তাহার মন সেই পরিমাণে অপূর্ণ। ব্যক্তির জীবনে আমরা সব সময় সব কাজের সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাই না; জাতির জীবনেও তেমনই অনেক সময় তাহার বিবিধ ক্রিয়ার মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ না থাকিতে পারে; এই উভয় জীবনই সেই পরিমাণে অপূর্ণ, অসংযত, সুতরাং হীন। কিন্তু মানুষের মনের এই বিবিধ প্রকার অভিব্যক্তির মধ্যে যে একটা পরস্পর সম্বন্ধ অনেক সময় সহজেই ধরা যায়, তাহার একটী উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আমাদের ঘরের কোণে রহিয়াছে। বাঙ্গলা দেশে যে দিন হইতে হেঁয়ালিতে ভরা কবিতার আমদানী হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় সাধারণ বুদ্ধিতে অনধিগম্য, কারুকরের নিতান্তই অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া অন্যের নিকট অর্থহীন, ছবির আবির্ভাবও হইয়াছে।

সাহিত্য বিবিধপ্রকার কলাবিদ্যার—মানুষের আত্মপ্রকাশের বিবিধ প্রণালীর একটী; কিন্তু ইহা অপেক্ষা আবশ্যকীয় আর একটী সত্য এই যে, মানুষ—ব্যক্তি কিংবা জাতি—যত প্রকার কাজ করে, সাহিত্যও তাহাদের অন্তর্ভুক্ত; এবং ঐ সমস্ত কাজের যদি কোন বিধি থাকে, তাদের মধ্যে যদি সদসদ্ বিচারের কোন আবশ্যকতা থাকে, তবে সাহিত্যের বেলাও তাহা রহিয়াছে। এই কথাটী আজ বিশেষ ভাবে স্মরণ করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ব্যাকরণের কঠোর নিয়ম সংস্কৃত কবিরা যখন কিছুতেই মানিলেন না, বৈয়াকরণ তখন 'নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ' বলিয়া সাধারণের চক্ষে নিজে খালাস হইলেন। কবিরা যৎকিঞ্চিৎ অমান্য করিলেন বটে, ব্যাকরণ তথাপি মরিল না। কিন্তু আজ দেখিতেছি শুধু কবি নন, সাহিত্যিক মাত্রেই, শুধু ব্যাকরণের নয়, নিয়ম মাত্রেরই অধীন হওয়া অসম্মান-জনক এবং ভাবস্ফুরণের একান্ত ব্যাঘাত-জনক মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বাংলার তেমন কঠোর দুর্দ্ধর্ষ ব্যাকরণ নাই; সুতরাং গুরুতর রূপে ব্যাকরণের শাসন অমান্য করিবার সময় এখনও আসে নাই। কিন্তু মানুষের অন্যান্য কাজ যে নৈতিক নিয়মের অধীন, সাহিত্য যে কেন সে নিয়মের অধীন হইবে না, তাহা বুঝিতে পারি না। সাহিত্যের মধ্যেও শিষ্ট-অশিষ্ট. ভদ্র-অভদ্র হইতে পারে. একথা কেন যে স্বীকৃত হইবে না, তা জানি না। অশ্লীলতা যে কাব্যের দোষ, অনেক কাল আগে আলঙ্কারিক একথা বলিয়াছেন। সংস্কৃত কাব্যে এ নিয়মের বহু ব্যভিচার থাকিতে পারে, তথাপি স্পষ্টতঃ কেহ নিয়মটী অস্বীকার করেন নাই। ব্যভিচারের মাত্রা যখন অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিল তখনই বোধ হয় বলা হইয়াছিল 'কাব্যালাপাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ'। মল্লিনাথ তাঁহার প্রিয় কবি কালিদাসের সমর্থন করিতে গিয়া এই নিয়মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, 'ইহা অসৎ কাব্য সম্বন্ধেই প্রযোজ্য'।

কালিদাস অশ্লীলতা সম্বন্ধে আলঙ্কারিকের নিয়ম ভাঙ্গেন নাই, একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। তথাপি নিয়মটী কোথাও অস্বীকৃত হইয়াছে বলিয়াও জানি না।

কিন্তু আজ কলাসৃষ্টির (আর্টের) দোহাই দিয়া কবিরা স্পষ্টতঃ এ নিয়ম উপেক্ষা করিতে সাহসী হইতেছেন। আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই, 'বিদ্যালয়ে কিংবা তাহার বাহিরে নীতিশিক্ষা দেওয়া কবির কর্ম্ম নয়'—সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিই তাঁহার পেশা; তাঁহার সৃষ্ট সৌন্দর্য্যে যদি কাহারও চক্ষু ঝলসিয়া যায়, যদি কাহারও মনে কুভাব জাগে, যদি কেহ কুপথে যায়, কবি সে জন্য দোষী হইতে পারেন না। আমরা ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। বাইবেলের ইহুদী কবিদের পর কবির নিকট পৃথিবী কদাচিৎ নীতিশিক্ষা আশা করিয়াছে; প্ল্যাটো বলিয়াছিলেন, কবিরা অসত্য বস্তুর বর্ণনা করেন—তাঁহারা মিথ্যাবাদী, সুতরাং আদর্শ-রাষ্ট্রে তাঁহাদের স্থান হওয়া উচিত নহে। কিন্তু কবিরা যাহা বলেন, তাহা ত ভদ্র সমাজের উপযোগী করিয়া বলা উচিত।

আমরা যে ব্যভিচারের কথা বলিতেছি তাহার দৃষ্টান্ত যদি বিরল হইত, তাহা হইলে একথা তোলার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু বেশী উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া ভদ্রলোকের রুচিতে আঘাত করিবার ইচ্ছা আমাদের নাই। বেশী পুরাণ হয় নাই, এই সেদিন মাত্র এক কবি লিখিয়াছেন,—

'এস প্রিয়া এস হৃদয়-বিলাস-মন্দিরে,
হে ভীরু ঘুচাও নিঠুর নীবি-বন্ধনে,
ব্যর্থ করোনা আজি এ জীবন-সঙ্গীরে,
সার্থক কর চির কামনার ক্রন্দনে!'

যদি বটতলার কোন পুস্তকে ইহা থাকিত, তাহা হইলে আপত্তি করিতাম

না; কিন্তু শিষ্ট সমাজে চলিতে পারে, এই ভাবেই ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

কালিদাসের নামের সঙ্গে জড়িত একটী কবিতা আছে, তাহাতে বলা হইয়াছে, দার্শনিকেরা 'মোক্ষ' 'মোক্ষ' করিয়া অস্থির, কিন্তু নীবি-বন্ধ-মোক্ষই আদিম ও চরম মোক্ষ। এর পরে, 'রঘুবংশের' শেষ নরপতি অগ্নিবর্ণের বিলাস বর্ণনার পরে, জয়দেবের গীতগোবিন্দের অংশ-বিশেষের পরে, এবং বাংলার 'বিদ্যাসুন্দরের' বিহার-বর্ণনার পরে, ভাবিয়াছিলাম নীবি-বন্ধ-মোচনের কথা শিষ্ট সাহিত্যে আর উঠিবে না। কিন্তু আজ দেখিতেছি, ইহাদের সহিত বোকাসিও-বায়রনকে সামিল করিয়া, 'টা্ট্রাম-শ্যাণ্ডী'-মশল্লায় ঝাঁঝ দিয়া, নূতন করিয়া ঢল ঢল ভাবে এভাবের তরঙ্গে আধুনিক কবিরা বাঙ্গালীর পান-পাত্র ভরিয়া দিতেছেন। নীতির কঠোর কথা এখানে তুলিতে চাই না। বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়াছেন, 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়'; সমস্ত বাঙ্গলা দেশ এ কথায় সায় দিয়াছে। এর পরে যে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের কথা বাংলাদেশে তুলিবে, তার ভাগ্যে বিলাসীর ঈর্ষা-কষায়িত সম্মার্জ্জনী ভিন্ন আর কিছুই জুটিবে না! আমরা কিছুই ত্যাগ করিতে বলি না; মানুষের যত রকম ভোগ্য আছে, তাহা সমস্তই বাঙ্গালীর ভোগে আসুক; ইহাও "নাল্পস্য তপসঃ ফলং"। আধুনিক চারিত্র-নীতিও মানুষকে কিছুই ত্যাগ করিতে বলে না। 'বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ, তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ, বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্নঃ' এই করিয়াই আমাদের জীবন কাটিয়া যাউক, তাহাতে কেহ আপত্তি করিবে না। কিন্তু নেশাখোরকে আমরা এখনও ঘৃণা করি, এবং কাব্যেরও নেশা আছে। ভাষায় ও ভাবে অসংযমের পক্ষপাতী আমরা নই। অবশ্যই কালিদাস ভারতচন্দ্র এখনও শিষ্টসমাজে আটক পড়েন নাই, কখনও পড়িবেনও না। কিন্তু 'দশকুমারচরিত' যে

সমাজের চিত্র আঁকিয়াছে, সে সমাজের অবস্থা আমরা ছাড়াইয়া আসিয়াছি; ভারতচন্দ্রের পদাবলী যখন প্রকাশ্য বৈঠকে গীত হইত, সে অবস্থাও আমরা পার হইয়া আসিয়াছি। এখন আর সুরুচির কথা বলিলে কেহ নাসিকা কুঞ্চিত করিতে পারিবেন না। এখনকার ভাষা ও ভাব মার্জ্জিত না হইলে সাহিত্যিক সমাজ তাহা নীরবে সহ্য করিবে, এমন ত মনে হয় না। * পূর্ব্বতন কবিদের মধ্যে যাহা আমরা নিন্দিত মনে করি, তাহারই অনুকরণ কেন অবাধে চলিবে? বাংলা দেশে ত কবিতার দুর্ভিক্ষ এখনও উপস্থিত হয় নাই; আসল, সরল, ওজঃসম্পন্ন কবিতা যদি দিবার না থাকে, তবে অনর্থের হেতু এ হস্তকণ্ডূয়ন কেন?

শুধু সাহিত্য নয়, ইউরোপের সমগ্র কলাবিদ্যার বিষয় ইউরোপেরই একজন প্রধান মনীষী পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত গবেষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার পঞ্চদশ বৎসরের চিন্তার ফলে, কাউন্ট টলষ্টয়, ইউরোপের কলার প্রতি যে তীব্র সমালোচনার ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, দেখিতেছি বাংলায়ও তাহা বলিবার সময় আসিয়াছে;—কিন্তু বাংলায় বলিবার লোক কই? টলষ্টয় বলেন, 'আমাদের সময়ের ও আমাদের সমাজের কলাবিদ্যা সব রকমেই বারবিলাসিনীর মত। বেশ্যারই মত ইহা পণ্য, রঙ্গীনবেশে চিত্রিত, উন্মাদক ও উচ্ছন্ন যাওয়ার উপায়।' তিনি আরও বলেন, 'দুনিয়ার আদি হইতে, ট্রয়ের যুদ্ধ যে দিন হইয়াছিল সে দিন হইতে, আরম্ভ করিয়া যে সব হত্যার ও আত্মহত্যার কাহিনী আধুনিক সংবাদ পত্রের স্তম্ভ ভরিয়া রাখে সে পর্য্যন্ত, মানুষের দুঃখযন্ত্রণার বেশীর ভাগই নারীপ্রেমের অত্যধিক অপব্যবহার হইতে উৎপন্ন হইয়া আসিতেছে।" টলষ্টয়ের

* এ মন্তব্য প্রকাশের পরে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে এর চেয়ে ঢের বেশী দুর্নীতি বাংলা সাহিত্যে চলিয়া গিয়াছে। তথাপি এ অভিমত পরিবর্ত্তন করার কোন হেতু নাই।

এই উক্তি হইতে নারীর প্রতি শঙ্করাচার্য্যের তীব্র ঘৃণার কথা মনে পড়ে—'দ্বারং কিমেকং নরকস্য ? নারী।' উপন্যাসে, নাটকে, চিত্রে, সঙ্গীতে—সর্ব্বত্রই টলষ্টয় এক দুর্দ্দম রিরংসা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না; এবং ইহাকে তিনি বাস্তবিক কলাবিদ্যা বলিতে মোটেই প্রস্তুত নন। তিনি বলেন ইউরোপের 'কলাশিল্পে পরকীয়া নায়িকার সংস্রব না থাকিলে সেটা উপন্যাসই হয় না; নগ্ন কিম্বা অর্দ্ধনগ্ন স্ত্রীমূর্ত্তি কোনও একটা উপলক্ষ্যে দেখা না দিলে, তাহা নাটকের মধ্যে গণ্যই নয়; চিত্রের বিশেষতঃ ফরাসী চিত্রের, অধিকাংশই নগ্ন স্ত্রী মূর্ত্তি।'

টলষ্টয় সমস্ত ইউরোপের শ্রদ্ধা ও সম্মান আকর্ষণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার সমুদয় মতই জগতে কখনও গৃহীত হইবে, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। সমস্ত পৃথিবী যাঁহাদিগকে পূজা করিয়া আসিতেছে, তাঁহাদের প্রায় সকলেরই প্রতি তিনি অত্যন্ত কঠোর ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। সোফোক্লিজ, ইউরিপিডিজ হইতে আরম্ভ করিয়া, দান্তে, ট্যাসো, সেক্সপিয়র—মিল্টন, গেটে-শিলর, ইবসেন্-ম্যাটারলিঙ্ক প্রভৃতি কবি, জোলা, কিপলিং প্রভৃতি গল্পলেখক, মোজার্ট, বিটুভেন, ওয়াগ্নার প্রভৃতি সঙ্গীতকৃৎ, রাফেল,এঞ্জেলো প্রভৃতি চিত্রকর—কাহাকেও তিনি তীব্র সমালোচনা করিতে ছাড়েন নাই। সার্ভেন্টিস্, মলিয়ার, ডিকেন্স, হিউগো, পুশকিন,প্রভৃতি কয়েকজন লেখক, জুলেস্ ব্রিটন প্রভৃতি কয়েকজন চিত্রকর, ও বিভিন্ন জাতির সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত সঙ্গীত,—মাত্র ইহাদের মধ্যে তিনি কতকটা সার্ব্বজনীন কলা দেখিতে পান; তাছাড়া অন্য সকলের মধ্যেই শুধু অনুকরণ কিংবা অনুকরণের অনুকরণ ভিন্ন আর কিছুই নাই। এরূপ কঠোর, সংসারবিরাগীর উপযুক্ত মানুষের ন্যায্য সুখ ও আনন্দের প্রতি বিদ্বেষে পূর্ণ সমালোচনায় আমরা সম্পূর্ণ একমত হইতে প্রস্তুত নই। কিন্তু তথাপি টলষ্টয় যে ইউরোপের

একটা বর্দ্ধমান, উদ্দাম রিরংসা ও লালসার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় অনুচিত নহে। কিছুদিন পূর্ব্বে কাগজে দেখিয়াছিলাম, বিলাতে কোনও এক কিনেমেটোগ্রাফের ছবিতে সত্যকে নগ্ন স্ত্রীমূর্ত্তি রূপে দেখান হইয়াছিল ; প্রথমে উহা প্রকাশ্যে সর্ব্বসাধারণকে দেখাইতে অনুমতি দেওয়া হয় নাই ; তাই নিয়া অত্যন্ত আন্দোলন হয়। পরে লণ্ডনের কাউন্টি কাউন্সিলের সভ্য, কয়েকজন পাদ্রী ও বাহিরের কয়েকজন লোককে—ইহা দেখান হয় এবং সকলের মত জিজ্ঞাসা করা হয়। তাহাতে ছবিটীর পক্ষে মত দেন ২১৮ জন এবং বিরুদ্ধে মাত্র ১১ জন। (ষ্ট্যাটসম্যান, ২১৷৮৷১৫)।

এই প্রচণ্ড রিরংসার ফলে ইউরোপ উচ্ছন্ন গেলে আমাদের শোক করিবার অবকাশ হইবে কিনা সন্দেহ ;—আমরা নিজের নিয়াই ব্যস্ত। কিন্তু ইউরোপের অনুকরণে আমাদের সাহিত্যে ও কলাশিল্পে যদি এই ভাব প্রবল হইয়া উঠে, তাহা হইলে আমাদের চিন্তিত হইবার কারণ আছে।

টলষ্টয় যে আরও বলিয়াছেন, সাহিত্য ও কলাশিল্পকে সার্ব্বজনীন—সকলের বোধগম্য করিয়া দিতে হইবে, তাহাতেও আমরা সম্পূর্ণ একমত হইতে পারি না। সকলই সব বুঝিতে পারে, এ বিশ্বাস আমাদের নাই। কিন্তু তথাপি টলষ্টয় যাহা বলিয়াছেন তাহাতে সত্য আছে। বাস্তবিক, খাঁটী সঙ্গীতে ও চিত্রের মাধুর্য্যে শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই মোহিত হইয়া থাকে। নিতান্ত গ্রাম্যলোকও সহরে আসিয়া তাহার সৌন্দর্য্যে অভিভূত হইয়া থাকে। এ অনুভূতির জন্য তার কোন শিক্ষা, কোন পুস্তক পাঠ, আবশ্যক করে না। কিন্তু সঙ্গীতের নামে যখন আওয়াজের কসরত হয় কিংবা চিত্রের নামে যখন কল্পনা আঁকা হয়, তখনই মানুষের বুদ্ধি আকুল হইয়া যায়। অবশ্যই রামায়ণের কাহিনী যে না জানে

'অশোকবনে সীতা'র ছবির সম্পূর্ণ অর্থ সে কখনও গ্রহণ করিতে পারিবে না; তথাপি তার কোন অর্থই সে গ্রহণ করিতে পারিবে না, এরূপ মনে করা ভুল। সকলেই এক বিষয় হইতে সুখ কিংবা দুঃখ না পাইতে পারে; কিন্তু সুখ দুঃখ মানুষের সাধারণ; সুতরাং যে হেতু হইতেই উৎপন্ন হউক না কেন, দুঃখ কিংবা সুখের চিত্র দেখিলে মানুষ মাত্রেই তাহা না বুঝিবে কেন? সুতরাং আজকাল মাসিক সাহিত্যের সম্পাদকেরা ছবি ছাপিয়াই যে বলিয়া দেন, ছবিটীর অর্থ এই,—তাহাতে বাস্তবিক ছবিটীর ঐ অর্থ হয় কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার অধিকার আমাদের আছে। সঙ্গীত সম্বন্ধেও তাহাই। সুতরাং কলাশিল্পকে যে সার্ব্বজনীন করা যায় না, তা নয়। শিল্পী যে বলিবেন 'আমি সৃষ্টি করি আমিই বুঝি'—ইহা টলষ্টয় সহ্য করেন নাই বলিয়া তাঁহাকে অনুদার বলা যায় না।

সাহিত্যকে সার্ব্বজনীন করার অর্থ টলষ্টয়ের মতে যদি এই হয় যে, সাহিত্যে যাহা কিছু কথিত থাকিবে, তাহা সকলেই সমান ভাবে বুঝিবে, তাহা হইলে সে অর্থে সাহিত্য কখনও সার্ব্বজনীন হইতে পারে কিনা সন্দেহ। শিক্ষিত-অশিক্ষিতের তফাৎ আরও অনেককাল পৃথিবীতে থাকিবে; সকলের বুঝিবার ক্ষমতা সমান হওয়ার আরও দেরী আছে। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা বুঝিবে না বলিয়া যদি গরীয়সী চিন্তাকে সাহিত্যে প্রকাশিত হইতে দেওয়া না হয়, তাহা হইলে, পৃথিবীর লোকসান ছাড়া লাভ নাই। কিন্তু আর একটী অর্থে সাহিত্যের ভাবকে সার্ব্বজনীন করা চলে। আগে যে আলঙ্কারিকের অনুশাসন অনুসারে সদ্বংশপ্রভব নায়কের বিষয়ই সাহিত্যের একমাত্র কথনীয় ছিল, তাহা এখন অনেক কমিয়া আসিয়াছে। তথাপি ইউরোপের সাহিত্যে এখনও টলষ্টয়ের মতে উচ্চ শ্রেণীর লোকের জীবন কাহিনীর প্রাধান্যই বেশী। বিলাতের সাময়িক

সাহিত্যে যত ছোট গল্প বাহির হয়, তাহার মধ্যে বেশীর ভাগই লর্ড-লেডীর প্রণয়-বৃত্তান্ত। পুরাকালে সাহিত্য রাজদরবারের দরবারী ছিল; রাজার প্রাসাদে তাহার জন্ম, রাজার যত্নে তাহার পোষণ হইত; কালিদাস, বাণভট্ট প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত। সুতরাং তখন রাজাদের বৃত্তান্তই শিষ্ট সাহিত্যের উপাদান ছিল। কিন্তু এখন আর সাহিত্য প্রাকৃত জনের কুটীরে প্রবেশ করিতে কুণ্ঠা বোধ করে না; সুতরাং এখন সাহিত্যে সাধারণের অনুভব ও অভিজ্ঞতার স্থান হইতে পারে। এবং এই অর্থেই সাহিত্যকে সার্ব্বজনীন করা সম্ভব; শুধু সম্ভব নয়, করা উচিত। যে সাহিত্যে সমস্ত জাতির অনুভব ও জ্ঞান, অবশ্যই শিষ্ট ও মার্জ্জিত ভাবে, প্রকাশিত থাকে তাহাই আদর্শ সাহিত্য। সাহিত্যে সকলের আগে, জাতির সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত, ইহাতে শ্রেণীবিশেষের একান্ত আধিপত্য থাকা ঠিক নহে। কিন্তু এই সমস্ত প্রকাশের মধ্যে যে সংযম ও শিষ্টাচার থাকা উচিত, সাহিত্যিকগণ কি তাহা মনে রাখিবেন না?

আমরা সাহিত্যকে পঞ্চাগ্নির মধ্যস্থিত মুনিঠাকুরের কঠোর তপশ্চরণের মত নির্ম্মম ও নিরানন্দ করিয়া তুলিতে বলি না। মানুষের সমস্ত সুখ, সমস্ত আনন্দ, সমস্ত তৃপ্তি ইহাতে পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান থাকুক; একটা সবল, সতেজ, দীপ্তি তাহার প্রাণ সঞ্চার করিয়া দেউক; এ পৃথিবী যে ঈশ্বরের সৃষ্ট এবং বাসের উপযুক্ত, এ জীবন যে সুখের, এবং ভোগের উপযুক্ত,—এই ভাব সাহিত্যকে উল্লাসিত করিয়া দেউক; যে প্রাণ, যে জিজীবিষা, যে আনন্দ ও যে উল্লাস বৈদিক সাহিত্যকে, বাইবেলের সাহিত্যকে, আবেস্তার সাহিত্যকে সংপ্রাণিত করিয়া দিয়াছে, তাহাই আবার জগতের সাহিত্যকে প্রদীপ্ত করিয়া দেউক। অলস, নিরানন্দ, স্নায়ুহীন, মুমূর্ষুভাব যেন সাহিত্যকে প্রাণহীন করিয়া তোলে না।

মানুষের সমগ্র চিন্তা, সমগ্র অনুভূতি, সমগ্র জ্ঞান সাহিত্যের মধ্যে সম্যক্ ফুটিয়া উঠুক। কিন্তু তার মধ্যে যেন শিক্ষা ও সংযমের অভাব না হয়; উচ্ছৃঙ্খল ভোগলালসা, অসংযত উত্তেজনা, অমার্জ্জিত রুচি যেন তাহাকে কলুষিত করিয়া না দেয়। বাংলা সাহিত্যের এমারত আজ দ্রুত গড়িয়া উঠিতেছে; বাঙ্গালী সাহিত্যিকগণ কি একথা মনে রাখিবেন না যে সাহিত্য কর্ম্মে মানুষের অভিব্যক্তির অন্যতম, সুতরাং ইহাও একই নৈতিক নিয়মের অধীন? সত্য এবং শিব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া শুধু সৌন্দর্য্যের চর্চ্চা যে সাহিত্য করে, তাহা হইতে জাতির অমঙ্গল হইতে পারে। 'সত্যং শিবং সুন্দরং'—এ তিনের একত্বে যে জাতির কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভাষা গড়িয়া উঠে, সে জাতিই জগতে ধন্য।

ডিয়োন্যুসস্‌।

স্মৃতি বলিয়াছেন, মদ্য অপেয়, অদেয়, অগ্রাহ্য। ব্রহ্মহত্যা যেমন একটা বড় পাপ, সুরাপানও তেমনই। এখনও নানারূপ সভা ও সংসদ্‌, শাস্ত্র ও নীতি এবং রাসায়নিক বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত, বৈদ্যক শাস্ত্রের নির্দ্দেশ সংগ্রহ করিয়া উপদেশ করিতেছেন, সুরা সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য। ইহাতে দেহের অনিষ্ট হয়, মনের অনিষ্ট হয় এবং অনাবশ্যক অর্থব্যয় বাড়ে। তথাপি পৃথিবীর বারো আনা লোকই এখনও এই জিনিষটী ত্যাগ করিতে সম্মত হয় নাই। ইউরোপের ধর্ম্মযাজকেরা সে দেশের ঠাণ্ডা হাওয়ার দোহাই দেন; আর অনেকে আবার নিষেধ-বিধির প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়া অভ্যাসবশে ঐ জিনিষটীর প্রতি আকৃষ্ট হন। অসুরদের সঙ্গে লড়াই করিবার সময় দেবী চণ্ডী স্বয়ং বলিতেছেন, "তিষ্ঠ তিষ্ঠ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহং"—হে মূঢ় কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, কিছু মধু পান করিয়া লই। লড়াইয়ের সময় স্নায়ুগুলিকে উত্তেজিত করিবার জন্য যে মধু পান আবশ্যক হয়, অধুনা সমাপ্ত যুদ্ধে জর্ম্মেণী অন্ততঃ সে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে। এই মধু যে চাক-ভাঙ্গা মধু নয়, তান্ত্রিকেরা বোধ হয় তাহা স্বীকার করিবেন। তন্ত্রে আছে,—

"পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পুনঃ পততি ভূতলে।
উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।"

ইহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে, জানি। এখানে কুলকুণ্ডলিনীর উত্থান পতনের কথা বলা হইতেছে; কিন্তু তথাপি তান্ত্রিক পূজায় সুরা অদেয়, অগ্রাহ্য নয়। স্পষ্ট বিধান রহিয়াছে;—সুরা শোধনের মন্ত্র আছে; এখনও ইহা দত্ত হয় এবং গৃহীতও হয়। যে কয়টী প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক

সিদ্ধপুরুষের বংশ পূর্ব্ববঙ্গে বিদ্যমান আছে, সে সব বংশে 'মদ্য মদেয় মপেয় মগ্রাহ্যং' বিধি অনুসৃত হয় না।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করিতেছেন—'ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করিয়া উত্থান কর; 'যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ'—নির্ভয়ে লড়াই কর'। সেই সময়ে তাঁহার হাতে পান-পাত্র ছিল, এমন কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু তিনি নিজে যখন যাদবদের সঙ্গে শিশুপালের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন, তখন মাঘ-কবির মতে রৈবতক পর্ব্বতে তাঁহার বন-বিহার, জল-বিহার এবং রাত্রিবাস হইয়াছিল। তখন তিনি নিজে কি করিয়াছিলেন, তাহা কোথায়ও স্পষ্ট বলা না থাকিলেও যাদবেরা স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া যে মধুপান করিয়াছিল, তাহার দীর্ঘ বর্ণনা আছে।

'আচার্য্যত্বং রতিষু বিলসন্মন্মথশ্রীবিলাসা,
হ্রীপ্রত্যূহপ্রশমকুশলাঃ শীধবশ্চক্রুবাসাম্'।—

অর্থাৎ লজ্জা প্রশমনে কুশল মদ্য যাদবনারীগণের রতিবিষয়ে আচার্য্যের আসন গ্রহণ করিয়াছিল। পুনশ্চ,—

'দত্তমিষ্টতময়া মধু পত্যুর্বাঢ়মাপ পিবতো রসবত্তাম্'—প্রিয়তমা কর্ত্তৃক প্রদত্ত মধু পান-কারী পতির নিকট অত্যন্ত সুরস হইয়াছিল। মাঘ-কবি যদি নিতান্তই একটা অপ্রামাণ্য কথা বলিয়া থাকিতেন, যদি কৃষ্ণের জীবনচরিতে এই প্রসঙ্গ কাব্যরসিকেরা অসঙ্গত মনে করিতেন, তাহা হইলে যে 'মাঘে সন্তি ত্রয়োগুণাঃ', সেই মাঘ কবে লোপ পাইয়া যাইতেন, তাহার ঠিকানা নাই।

যদুবংশে যে মদ্যের ব্যবহার খুবই চলিত, তাহার আর একটা প্রমাণ, কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলদেব রেবতীকে যেমন ভালবাসিতেন, 'হালা'ও তেমনই ভাল বাসিতেন। এবং কালিদাস মনে করেন যে, বলদেব যে হালা পরিত্যাগ করিয়া সরস্বতী নদীর জলপান করিয়াছিলেন,

সরস্বতীর পবিত্রতার পক্ষে ইহার চেয়ে বড় প্রমাণ আর দরকার করে না। * কারণ, সুরাত্যাগ করা বলদেবের পক্ষে একটু কঠিন।

আর যদুবংশ যে মদ্যের প্রভাবেই ধ্বংস পাইয়াছিল, তাহা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা কবি নবীনচন্দ্র সেনও স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কৃষ্ণভক্ত ছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

শুধুই কি তাই? বৈদিক ঋষিরাও মদ্যকে অপেয় মনে করিতেন বলিয়া বোধ হয় না। মদ্য নানা জিনিস হইতেই হয় বলিয়া শুনি। যাহার মাদকতা গুণ আছে, তাহাই যদি মদ্য হয়, তবে সোমলতা হইতে যে তরল পদার্থ ক্ষরিত হইত, সেটাকে মদ্য না বলিবার কোন হেতু নাই। সোমকে লক্ষ্য করিয়া ঋষি বলিতেছেন, 'স্বাদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠয়া পবস্ব সোম ধারয়া'—হে সোম, তুমি অতিশয় স্বাদু এবং অতিশয় মাদক ধারায় ক্ষরিত হও। সুতরাং সোমলতা হইতে যাহা তৈয়ার হইত, তাহাকে অরিষ্টই বলি, আর যাই বলি, তাহার মাদকতা স্বীকৃত হইয়াছে। এই জিনিসটীকে ঋষিরা কেমন শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, সামবেদের 'পাবমানং পর্ব্ব' তাহারই প্রমাণে ভরা।

শুধু শতাব্দ গণনা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই যে এসব ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা নয়; ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে একজন জার্ম্মেণ অধ্যাপক (Treitschke) বলিতেছেন, 'সজীব, উদার সভ্যতার পক্ষে মদ্য নিশ্চয়ই একটী অত্যাবশ্যক অঙ্গ'। দেশের হাওয়ার সঙ্গে সে দেশের লোকের চরিত্রের কেমন নিকট সম্বন্ধ, সেই কথা বলিতে গিয়া ট্রাইট্‌চ্‌কে ইংলণ্ডের দিকে দৃক্‌পাত করিয়াছেন। তাঁহার নিজের কথার ইংরেজী অনুবাদ এই :—

---

* হিত্বা হালামভিমতরসাং রেবতীলোচনাঙ্কাং। বন্ধুপ্রীত্যা সমরবিমুখো লাঙ্গলী যাঃ সিষেবে। ৪৯। পূর্ব্বমেঘ।

'The misty, foggy climate has had a by no means favourable effect upon the inhabitants of England ; in London there are times when in a thick fog the spleen lies in the air. Besides, the country lacks wine and *wine is undeniably an important factor in a cheerful, liberal culture.* * অর্থাৎ ইংলণ্ডের অধিবাসীদের উপর সে দেশের কুজ্ঝটিকাময় হাওয়ার প্রভাব বড় ভাল হয় নাই। লণ্ডনে ঘন কুয়াসায় এমন অনেক সময় হয় যে, হাওয়ার ভিতরই এমন একটা কিছু থাকে যাহাতে আপনা হইতেই মন খারাপ হইয়া যায়। অধিকন্তু সে দেশে মদ নাই ; একটা সজীব, উদার সভ্যতার পক্ষে মদ খুবই দরকার।

অপিচ, "The climate, the lack of wine and of beauty of scenery have indisputably had an unfavourable effect upon English culture. While the English can exhibit a truly great literature, they have never achieved anything outstanding in music or in the fine arts. অর্থাৎ 'ইংলণ্ডের হাওয়া, সে দেশের মদ্যের অভাব এবং সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের অভাব— সে দেশের অধিবাসীদের উপর এ সকলের ফল যে ভাল হয় নাই, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে। ইংরেজেরা যদিও একটী অতি মহৎ সাহিত্যের অধিকারী, তথাপি সঙ্গীতে এবং ললিতকলায় তাহারা স্থায়ী তেমন কিছু করিতে পারে নাই'।

কথাটা হয়ত একেবারে মিথ্যা নয়। তবে, তাহার কারণ দেশে মদ্যোৎপত্তির অভাব, না আর কিছু, বলা কঠিন। কারণ, ইংলণ্ডে

* Treitschke, Lectures on Politics, Tr. by A. L. Gowens.

মদ্য উৎপন্ন না হইলেও সে দেশের লোকে মদ্য পান করেন না, এমন নয়। আর, আজ যদি ট্রাইট্‌চ্‌কে বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে, কি বলিতেন, ভাবিবার বিষয়।

অবশ্যই, মদ্যের মধ্যে নানা জাতি আছে। অধ্যাপক ট্রাইট্‌চ্‌কেও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সেটা মাদকতার বেশ কম মাত্র। ট্রাইট্‌চ্‌কের মতে যাহা কম মাদক (wine) তাহাই গ্রহীতব্য, অত্যধিক মাদক যে মদ (brandy), তাহা গ্রহীতব্য নহে। ইহা মাত্রা নির্দ্দেশ মাত্র, মদ্য নিষেধ নহে।

সুতরাং মদ্যের উপাসনা এখনও পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। তাহার অর্থ এই নয় যে, অতঃপর সকলকেই অবিলম্বে এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে। বেদের পরে ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্, পুরাণ, স্মৃতি হইয়া গিয়াছে; সুতরাং সোমলতার উপাসনা প্রচার করিবার সময়ও বোধ হয় চলিয়া গিয়াছে। তবে একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়ে আর্য্যজাতির বিভিন্ন শাখায় শুধুই যে সুরার প্রচলন ছিল তাহা নহে, ইহার প্রচুর স্তুতি ও প্রশংসাও হইয়া গিয়াছে। সমগ্র আর্য্য সভ্যতার সহিত, সমস্ত আর্য্য জাতির ইতিহাসের সহিত, ইহার একটা নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে। ইহা যদি শুধুই একটা পানীয় বলিয়া বিবেচিত হইত, যদি ইহা কখনও পূজনীয় বলিয়াও দৃষ্ট না হইত, তাহা হইলে সভ্যতার সঙ্গে ইহার সম্বন্ধের কথা বলার কোনই মানে থাকিত না। কারণ, মানুষ মাত্রেই পান-ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করে; সুতরাং খাদ্যের সঙ্গে তাহার সভ্যতা সম্পৃক্ত, একথা বলায় কোন বিশেষত্ব নাই। কিন্তু সোমলতা কিংবা দ্রাক্ষালতা কিংবা অন্যবিধ পদার্থ হইতে যে উত্তেজক পানীয় নিঃসারিত হইতে পারে, তাহাকে অনেক সময় অর্চ্চনীয় পর্য্যন্ত মনে করা হইয়াছে; এবং ইহার

ফলে ধর্ম্মে ও সাহিত্যে পর্য্যন্ত ইহার একটা আসন-লাভ ঘটিয়া গিয়াছে। এমন কি, যে সংস্কৃত সাহিত্যকে আমরা হয়ত অন্য সাহিত্য হইতে একটু বেশী মাত্রায় আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ মনে করি, সেখানেও ইহার ভূয়োভূয়ঃ স্তুতিবাদ দেখা যায়। পুরাণে এবং স্মৃতিতে যাহাই হউক,—বেদে এবং কাব্যসাহিত্যে ইহা নিন্দিত হয় নাই। ইহা বল, বীর্য্য, ধন, আয়ুঃ সমস্তই দান করিতে পারে—ইহাই যেন বেদের বিশ্বাস। ইহা দেবতাদের পেয়, এবং দেবতার প্রসাদ হিসাবে মানুষেরও অপেয় নহে। ইহা পান করিবার জন্য দেবতারা ভূমিতে অবতীর্ণ হইতেন। তাড়কাসুর বধ করিবার জন্য বিশ্বামিত্র যখন রামলক্ষ্মণকে নিয়া যান, সেই অবস্থায় রামলক্ষ্মণের বর্ণনা করিতে যাইয়া ভর্ত্তৃহরি বলিতেছেন, তাঁহাদিগকে তখন সোমরস পান করিবার জন্য ('সোমরসং পিপাসু') মর্ত্তে অবতীর্ণ দুইটী দেবকুমারের মত দেখাইতেছিল। সুতরাং সুরা এখন যেমন প্রায়ই সহরের অভদ্রোচিত স্থানে গিয়া বাসা লইয়াছে, চিরকালই এমন ছিল না। বিশেষতঃ এদেশে যেমন ইহার পদচ্যুতি ঘটিয়াছে, অন্য দেশে এখনও সেরূপ ঘটে নাই।

এ দেশে অবশ্যই সুরার পূজা অতীতের কথা। গত রাত্রের দুঃস্বপ্নের মত অতীতের এই উপাসনার কথা স্মরণ করার উদ্দেশ্য অতীতকে ফিরাইয়া আনার চেষ্টা নয়। কিন্তু অতীতকে যারা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মনে করেন, তাঁদের এই খানে বিবেচনা করিবার বিষয় আছে। সত্য যুগ পিছনে পড়িয়াছে, কিংবা সাম্‌নে আছে, ঠিক জানি না। সত্যযুগ অর্থে যদি এমন একটা সময় বুঝায় যখন কেহই এমন কিছু করিত না, যাহা এখন করিলে আমরা লজ্জিত হইব, তাহা হইলে সে যুগ আসিবার দেরী আছে। আর সত্যযুগ অর্থ যদি সেই সময় হয়, যখন মানুষ পাপের আতঙ্কে নিগৃহীত হয় না, তাহা

হইলে সে যুগ চলিয়া গিয়াছে। এখন আমাদের পাপপুণ্যের বিচার-শক্তিটা কিছু বেশী মাত্রায় তীক্ষ্ণ হইয়াছে। সেটা লাভ কি লোকসান, ঠিক বলিতে পারি না। এখন আমাদের যত বিষয়ে জুগুপ্সা জন্মিয়াছে, এখন আমরা যত সব বিষয়কে পাপ মনে করি, তার প্রায় সবগুলিই আদি যুগের মানুষ সাধারণ আহার-বিহারের মত নির্ব্বিকার চিত্তে করিয়া গিয়াছে। যে জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাওয়ার দরুণ বাইবেলের মতে আদমের ঈডেন হইতে বিচ্যুতি ঘটিয়াছিল, তাহা কোন বৃক্ষে ফলুক আর না-ই ফলুক, মানুষের মনে সম্যক্ পরিণত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার ফলে এখন আমরা পাপপুণ্যের বিচার যত সূক্ষ্ম ভাবে করি, তেমন আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা—গ্রীক কবি হোমরের নরনারীরা, অন্ততঃ করেন নাই। এখন যেমন আমরা কখন পাপ করিয়া ফেলি, এই ভয়ে সর্ব্বদাই আড়ষ্ট, কলশ ভরিয়া সোমরস ক্ষরণ করিবার সময় ঋগ্বেদের ঋষিদের মন সেরূপ হয় নাই। পাপ সম্বন্ধে একেবারে ভীতির অভাব, একেবারে বিতর্কের অভাব যদি সত্যযুগের লক্ষণ হয়, তবে সে যুগ চলিয়া গিয়াছে। লাভ হইয়াছে বলিয়া নীট্চে (Nietsche) অন্ততঃ বিশ্বাস করেন না; যদিও অনেকেরই মতে আমরা ধর্ম্মবুদ্ধিতে উন্নত হইতেছি, সুতরাং মোটের উপর উন্নতই হইতেছি।

সত্যযুগ অতীত হইয়া গিয়া থাকিলেও অতীত ঠিক যেমনটী ছিল তেমনই ভাবে ফিরাইয়া আনিবার আকাঙ্ক্ষা বোধ হয় আমরা সত্য সত্যই করি না। মানুষের কর্ম্মচেষ্টার গতি অনাগতের দিকে। সুতরাং সুরাপূজা জিনিষটা যদি অতীত হইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার দিকে দৃক্পাতের সার্থকতা শুধু ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসার চরিতার্থতা মাত্র। আরও একটা লাভ এখানে রহিয়াছে। সুরার

পূজা উপলক্ষ্য করিয়া আর্য্য জাতির যে একটা সাহিত্য উৎপন্ন হইয়াছে, যে একটী সৌন্দর্য্য তাঁহাদের উপাসনার ফলে সৃষ্ট হইয়াছে, সেই জিনিষটী অবহেলার যোগ্য নহে। সৌন্দর্য্য-মাত্রেরই ভিতর সামান্যতঃ এমন একটী সনাতন পদার্থ থাকে, যাহা চিরকালই উপভোগ্য।

আর্য্য জাতির এক প্রবীণ শাখা গ্রীকদের কল্পনায় সুরার একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ছিলেন, তাঁহার নাম ডিয়োন্যুসস্ (Dionysus) গ্রীক পুরাণ মতে ইনি মানুষীর গর্ভেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, যদিও ইঁহার জনক ছিলেন দেবরাজ জিউস্ (Zeus)। কিন্তু ইঁহার জন্ম সম্বন্ধে দুইটী বৃত্তান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। একটী কাহিনীর মতে, মানবীর গর্ভে জন্ম ইঁহার দ্বিতীয় জন্ম। প্রথমতঃ ইঁহার জন্ম হয় পার্সিফোনির (Persephone) গর্ভে। গ্রীক দেবরাজ জিউস্ আমাদের দেবরাজ ইন্দ্রেরই মত একটু বেশী পরিমাণে নারীর সম্মান করিতেন,—একটু অতিরিক্ত মাত্রায় Chivalrous ছিলেন। ফলে, দেবীকুলে এবং মানবীকুলে তাঁহার প্রণয়িনীর অন্ত ছিল না; ইন্দ্রের শচীর মত জিউসেরও প্রধানা মহিষী ছিলেন হীরা (Hera); এবং সাধারণ সাধ্বী স্ত্রীলোকের মত ইনিও স্বামীর ইতস্ততঃ যাতায়াতটা একটু কঠোর দৃষ্টিতে দেখিতেন। কাজেই জিউস্‌কে তাঁহার অসংখ্য প্রণয়ব্যাপার গোপনেই সারিতে হইত। কিন্তু 'গুপত পীরিতি বিষম বড়;' তিনি প্রায় সর্ব্বত্রই হীরার কাছে ধরা পড়িয়া যাইতেন, এবং পরে একটা কুকাণ্ড ঘটিয়া যাইত।

পার্সিফোনির সঙ্গে তিনি ভুজঙ্গের বেশে প্রণয় চালাইতেছিলেন। কিন্তু ক্রমে ডিয়োন্যুসস্ জন্ম নিলেন—অতি সুন্দর চেহারা, সোনালি রংয়ের চুল। জন্মিয়াই তিনি পিতার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিলেন। পিতা গোপনে তাঁহাকে লালন করিতে লাগিলেন—পাছে বিমাতা

হীরা সপত্নীপুত্রের বিনাশ সাধন করেন। একদিন জিউস্ শিবের কুঁচুনী পাড়া গমনের মত কোথায় প্রণয় করিতে যাইবেন; ছেলেটীকে একটী সুদৃঢ় কক্ষে আবদ্ধ করিয়া খেলিবার জন্য তাঁহার রাজমুকুট ও রাজদণ্ড তাহার হাতে দিয়া গেলেন। এদিকে হীরা সেই সুযোগে টাইটান্ (Titan) দিগকে পাঠাইয়া দিলেন; ইহারা খেলেনার লোভ দেখাইয়া ছেলেটীকে ভুলাইয়া আনিয়া হত্যা করিল এবং তাহার মাংসে উদরের তৃপ্তি সাধন করিল; অস্থিগুলি এপোলোর (Apollo) কাছে পাঠাইয়া দেওয়া হইল—এপোলোও জিউসের পুত্র। কিন্তু এপোলো বৈমাত্রেয় ভ্রাতার মৃত্যুতে বরং দুঃখিত হইলেন, এবং যথারীতি তাহার হাড় কয়খানিকে সমাহিত করিয়া রাখিলেন। এদিকে টাইটান্‌রা যখন ডিয়োন্যুসসের মাংসে ভোজ তৈয়ার করিতেছিল, হীরা তখন তাহাদের নিকট হইতে ডিয়োন্যুসসের হৃৎপিণ্ডটী কাড়িয়া লইয়াছিলেন; এবং জিউস ফিরিয়া আসিলে সংতৃপ্ত প্রতিহিংসার চিহ্ন স্বরূপ তখনও স্পন্দনশীল সেই হৃৎপিণ্ডটী নিয়া জিউসের নিকট উপস্থিত করিলেন। নিরুপায় জিউস্ সেই হৃৎপিণ্ডটী গ্রহণ করিলেন।

জিউসের আর একজন মানবী প্রণয়িনী ছিলেন, থিবিস্-রাজ (Thebes) ক্যাড্‌মসের (Cadmus) কন্যা সেমিলি (Semele)। জিউস্ মৃত হৃৎপিণ্ডটী মদ্যের সঙ্গে পান করিবার জন্য সেমিলিকে দিলেন। তাহা হইতে সেমিলির গর্ভ হইল, এবং ডিয়োন্যুসস্ দ্বিতীয় বার জন্মগ্রহণ করিলেন। এই হইল প্রথম বৃত্তান্ত।

দ্বিতীয় বৃত্তান্ত অনুসারে ডিয়োন্যুসস্ একবারই জন্ম গ্রহণ করেন; এবং তাঁহার একমাত্র জননী সেমিলি। সেমিলির সঙ্গে যে জিউসের গোপনে দেখা সাক্ষাৎ হয়, হীরা তাহা টের পান। এবং দেবরাজের সঙ্গে প্রেম করা মানবীর পক্ষে যে কত বড় ধৃষ্টতা তাহা শিক্ষা

দিবার জন্য, হীরা সেমিলিকে নানা কথার ছাঁদে ভুলাইয়া বুঝাইলেন যে, সেমিলির একবার দেবরাজকে দেবরাজরূপে—যে রূপে হীরা তাঁহাকে দেখেন সেই রূপে, দেখিতে চাওয়া উচিত। দেবরাজ সেমিলির সে প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন; কিন্তু দেবরাজের বজ্রের তেজ, তাঁহার বিদ্যুতের চকিত স্ফুরণ, মানবী সেমিলি সহ্য করিতে পারিলেন না; তাঁহার অকাল-মৃত্যু হইল, এবং অকালে ডিয়োন্যুসস্ প্রসূত হইলেন। জিউস্ ছেলেটীকে তৎক্ষণাৎ তাঁহার জঙ্ঘাদেশে লুকাইয়া রাখিলেন। পরে যথা সময়ে পরিপূর্ণদেহ ডিয়োন্যুসস্ জন্ম গ্রহণ করিলেন এবং দেবরাজের নির্দ্দেশ অনুসারে অপ্সরাগণ (Nymphs of Nysa) কর্ত্তৃক লালিত হইলেন।

এইভাবে যে দেবতাটী জন্মগ্রহণ করিলেন, গ্রীক কল্পনায় ইনি সর্ব্ব কনিষ্ঠ দেবতা। সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র বলিয়া দেবরাজও ইঁহাকে অত্যন্ত বাৎসল্যের চক্ষে দেখেন। আমাদের অনঙ্গ ঠাকুরের মত ইনিও মানব মানবীর উপর নানা প্রকার উপদ্রব করিয়া থাকেন; কিন্তু দেবতা এবং মানুষ সকলেই সে সব নিঃশব্দে সহ্য করেন। স্বর্গে এবং মর্ত্ত্যে ইঁহার অখণ্ড প্রতাপ। একাধিক রূপে, একাধিক নামে ইনি পূজিত হইয়াছেন। গ্রীকদের কল্পনায়, তাহাদের ধর্ম্মে, তাহাদের জীবনে, ইঁহার যে কত বড় স্থান, তাহা বলিয়া বুঝান কঠিন। এই কথা বলিতে গিয়াই পেটার * লিখিয়াছেন—

"ডিয়োন্যুসসের পূজা গ্রীকদের কাছে কত বড় ছিল—এই ধর্ম্মের ভিতর যাহাদের জীবন নিহিত ছিল, তাহাদের কাছে ইহা কত বিস্তৃত ছিল, এই একটী পরিস্ফুট অথচ জটিল প্রতীকের ভিতর তাহারা

* Walter Pater, *Greek Studies.*

কত কি দেখিত,—ইহা যদি কেহ বুঝিতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে চিন্তা করিতে হইবে, দ্রাক্ষালতা এবং পানপাত্রের মূর্ত্তিকে আশ্রয় করিয়া যে সমস্ত ভাব এবং অভিব্যক্তি সাহিত্যে উৎপন্ন হইয়াছে, সে সমস্তকেই যদি বিদ্যমান কাব্যের দেহ হইতে অপসারিত করা হয়, তাহা হইলে তাহাতে কি ক্ষতি হইবে? কত মধুর চিন্তালহরী, কত বর্ণ-বৈচিত্র্য, কত বস্তু-বৈচিত্র্য তাহা হইলে বাদ পড়িয়া যাইবে। খ্রীষ্টান ধর্ম্মের শ্রদ্ধা-ভীতিময় ব্যাপার-বিশেষের সহিত সম্পর্ক, গ্যালাহাডের (Galahad) পানপাত্রের সহিত সম্পর্ক বাদ দিলেও দ্রাক্ষালতার ফলের ছবিটী কত রকমে এই কাব্যসাহিত্য পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে!" তথাপি, এই কল্পিত ক্ষতি হইতেও ইয়ত্তা করা যাইবে না, গ্রীকদের হৃদয়ে ডিয়োন্যুসসের প্রভাব কত বিস্তৃত ছিল!

বলাই বাহুল্য, এমন যে একটী দেবতা, তাহার পূজার বিধির অন্ত নাই। ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণীবিশেষের চিন্তা ও জীবনধারার বৈশিষ্ট্য অনুসারে ইনি এক এক সময়ে এক এক রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, এক এক ভাবে পূজিত হইয়াছেন।

বৃক্ষলতার যে জীবন আছে, এই বিশ্বাসটা প্রাচীন জগতের প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়। তপঃক্লিষ্ট ঋষির অনতিরঞ্জিত ভাষায়—

'অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ'—বৃক্ষলতার ভিতরেও সংজ্ঞা আছে, ইহাদেরও বেদনা বোধ আছে। এই কথাটীকেই কবিত্বময়, ভাবময়, মধুরতাময় করিয়া কবি কালিদাসের তুলিকা ফুটাইয়া তুলিয়াছে। শকুন্তলা লতিকা বনজ্যোৎস্নাকে অপত্যের মত ভাল বাসিতেন, সেটা তেমন বেশী কিছু নয়। কিন্তু শকুন্তলা যখন পতিগৃহে যাত্রা করেন, তখন যে সব বস্ত্র ভূষণে তাঁহাকে সাজানো হইয়াছিল, সে গুলিকে আশ্রমবাসিনীরা বৃক্ষলতার দান বলিয়া

গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনিন্দ্যসুন্দরী শকুন্তলাকে যাহাতে আরও সুন্দর দেখায়, সেই জন্য বৃক্ষসকল সে দিন কতই না ফুল দিয়াছিল। শকুন্তলার চরণপদ্ম যাহাতে রঞ্জিত হয়, সেজন্য বৃক্ষ সেদিন কতই না লাক্ষারস দান করিয়াছিল!

বৃক্ষলতার সজীবতার এই যে অতি প্রাচীন বিশ্বাস, ডিয়োন্যুসস্ পূজায় প্রথমে তার বেশী কিছু দেখা যায় নাই। বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষলতা, এবং বৃক্ষলতায় যে পত্রপুষ্পের উদ্গম হয়, আমরা হয়তো তাহাতে একটা রাসায়নিক ক্রিয়া বা বিক্রিয়া মাত্র দেখি। কিন্তু ইহারই ভিতর প্রাচীনদের কবিচক্ষুঃ একটা জীবনের, একটা প্রাণের সঞ্চার দেখিত! ইহারই গ্রীক নাম ডিয়োন্যুসস্!

বৃক্ষলতার নিকট হইতে মানুষ শুধু শকুন্তলাকে সাজাইবার জন্য পুষ্প, স্তবক ও লাক্ষারসই কেবল গ্রহণ করে না; মানুষের কান্তি, পুষ্টি, তৃপ্তি—তাহার সমগ্র জীবন, কত উপাদানের জন্যই না বৃক্ষলতার নিকট ঋণী! সুতরাং নিশ্চল, নির্ব্বাক্ উদ্ভিজ্জ জগতের ভিতর যে একটা প্রাণ, সেটা ত একটা কম বিরাট ব্যাপার নয়! ইহারই নাম ডিয়োন্যুসস্।

যে ব্যক্তি দ্রাক্ষার চাষ করে, দরজার সামনে দিনে দিনে পরিবর্দ্ধমান দ্রাক্ষালতাটী তাহার কতই না উৎকণ্ঠার, কতই না যত্নের জিনিস! দিনে দিনে ইহার বৃদ্ধি হয়, দিনে দিনে ইহার পুষ্টি হয়, আর কল্পনার চক্ষে চাষী ইহার শেষ পরিণতির কতই না মধুময় একটা চিত্র দেখিতে পায়! যে দেবতা ইহার ভিতর বিচরণ করেন, যে দেবতা ইহাকে রসে পরিপূর্ণ করেন, যে দেবতা ইহা হইতে উপলব্ধ তৃপ্তির প্রাণ,—তিনিই ডিয়োন্যুসস্।

ডিয়োন্যুসস্ দ্রাক্ষার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; কিন্তু শুধু দ্রাক্ষা কেন? সমস্ত উদ্ভিজ্জ জগৎই ত মানুষের কান্তি পুষ্টির সহায়ক; সুতরাং

ডিয়োন্যুসস্ সমগ্র উদ্ভিজ্জ জগতেরই অধিষ্ঠাতা। তথাপি বিশেষভাবে দ্রাক্ষাই তাঁহার আসন। দ্রাক্ষার ভিতর যত আনন্দ আছে, যত উৎসাহ আছে, যত তৃপ্তি আছে, আর কোন্ লতায় তাহা আছে, আর কোন্ বৃক্ষ তাহা দিতে পারে?

উদ্ভিদ্ হইতে শস্য হয়, উদ্ভিদ্ হইতে তৈল হয়, উদ্ভিদ্ হইতে সুরা হয়। উদ্ভিদের দেবতা ডিয়োন্যুসস্ সুতরাং এ সকলের দেবতা। শুধু তাই নয়; উদ্ভিদ্ যে প্রকৃতির শোভা ও সম্পদ্, সেই প্রকৃতি হইতে মানুষ মধু পায়, দুগ্ধ পায়, জল পায়; সুতরাং এ সকলও ডিয়োন্যুসসেরই দান।

বৃক্ষ লতাকে আশ্রয় করিয়া আরও কত দেব দেবী রহিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই ডিয়োন্যুসসের সঙ্গী, তাঁহার অনুচর। বৃক্ষবিশেষ হইতে বাঁশীর জন্ম হয়; বাঁশীর সঙ্গীতে যে আনন্দ আছে, তাহা তাঁহার অনুচরের দান, সুতরাং তাঁহারই।

বিদ্যুতের অগ্নির স্পর্শে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়—অগ্নির ভিতর তাঁহার জন্ম। সুতরাং মরুতে যে শ্যামলতা, কঠোর হইতে যে কোমলের উৎপত্তি, ডিয়োন্যুসস্ তাহারও দেবতা। পত্রে, পুষ্পে, ফলে যে আনন্দ, যে ভোগ রহিয়াছে, তাহার জন্মের জন্য জননী নিসর্গরাণীকে কতই না গর্ভ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়! ডিয়োন্যুসস্-জননীও সেরূপ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিলেন। সেমিলির গর্ভে ডিয়োন্যুসসের উৎপত্তি; সেমিলিই প্রকৃতি; সুতরাং প্রকৃতি ভিতর যত আনন্দ, ডিয়োন্যুসস্ তাহাই।

জিউস্ ইঁহার পিতা। জিউস্ কে? অনন্ত, উন্মুক্ত আকাশ—বেদের দ্যৌঃ। পিতা, অকালে প্রসূত, সাত মাসের শিশু ডিয়োন্যুসস্কে রক্ষার নিমিত্ত অপ্সরাদের হাতে দেন। এই অপ্সরাদের কেহ থাকেন

শিশিরে, কেহ থাকেন নির্ঝরিণীতে! শিশিরে, নির্ঝরে, যে স্ফূর্ত্তি, যে বিকাশ, যে মধুর নবীনতা রহিয়াছে, সেই সব দিয়া যে দেবতার দেহপুষ্টি হইয়াছে, তিনিই হইলেন ডিয়োন্যসস্।

এইরূপে প্রাচীন গ্রীকদের কল্পনা নানা ভাবে এই দেবতাকে দেখিয়াছে, নানা ভাবে ইঁহার পূজা করিয়াছে। শুধু কল্পনায়—শুধু কাব্যেই যে তাঁহাকে নানা মূর্ত্তিতে দেখি, তাহা নয়। গ্রীকদের সময়ে এবং গ্রীকদের পরেও চিত্রে তিনি নানা ভঙ্গিতে চিত্রিত হইয়াছেন, প্রস্তর তাঁহাকে মূর্ত্তি দিতে গিয়া নানা আকার ধারণ

এই যে বহুরূপী দেবতাটী, কিরূপে ইঁহার পূজা গ্রীসে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল? গ্রীক কল্পনায় তাহারও একটা জবাব আছে, এবং সেইটাকে আশ্রয় করিয়া ইউরিপিডস্ (Euripides) এর লেখনী একখানি প্রসিদ্ধ নাটক সৃষ্টি করিয়াছে।

আমাদের দেশেও 'পাঁচালী' সাহিত্য ও 'মঙ্গল' সাহিত্য অনেক সময় বলিয়া দেয়, কিরূপে দেবতাবিশেষের পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। 'অন্নদামঙ্গলে' ভারতচন্দ্র বলিয়া দিতেছেন, কিরূপে অন্নদার পূজা কিংবা অন্নদারূপে ভগবতীর পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। 'চণ্ডী' তে কবিকঙ্কণ বলিতেছেন, চণ্ডীর পূজা কিরূপে প্রচারিত হয়। 'পাঁচালী'তে বলা থাকে, কেমন করিয়া লোকে শনি বা সত্য নারায়ণের পূজা শিখিয়াছিল। কিন্তু কবিকঙ্কণ বা রায় গুণাকরের সহিত ইহার বেশী সাদৃশ্য ইউরিপিডিসের নাই। ইউরিপিডিস্ শুধুই পূজা প্রচারের কথা বলিতে চান নাই। তার ভিতর যে একটা নাটকত্ব রহিয়াছে, সেইটাই তাঁহার বস্তু; তার ভিতর দেবতার নিকট মানুষের একটা যে বিরাট পরাজয়ের কাহিনী রহিয়াছে, যে একটী মহতী

শক্তির লীলা তাহাতে রহিয়াছে, এবং সেই শক্তির মহত্ত্বের ভিতর যে একটা বিরাট সৌন্দর্য্য রহিয়াছে,—সেইটীই নাটকের আকারে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং নাটক ও পাঁচালীর সাধারণ বৈষম্য বাদ দিলেও তাঁহার সৃষ্টি এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস। ইহার ভিতর শুধুই যে পূজা প্রচারের কথা, শুধুই যে মানুষের পরাজয়ের কাহিনী রহিয়াছে, তাহাও নয়; সেই সঙ্গে যে একটা অপার সৌন্দর্য্য উৎপন্ন হইয়াছে, যেখানে সেখানে তাহার সাক্ষাৎ মিলে না।

ডিয়োন্যুসস্ যে সেমিলির পুত্র, ইউরিপিডিস্ এই টুকুই মানিয়া লইয়াছেন। থিবিস্ প্রদেশে তাঁহার জন্ম, কিন্তু সেখানে কেহ তাঁহাকে চিনে না, কেহ তাঁহার পূজা করিতে জানে না। সকল দেবতারাই পৃথিবীর কোন না কোন জায়গায় পূজা পাইয়া থাকেন; কিন্তু স্বয়ং দেবরাজের পুত্র ডিয়োন্যুসসের উপাসক মানব জাতির ভিতর থাকিবে না, ইহা অসম্ভব কথা। তাই তিনি স্বয়ং পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছেন এবং যেখানে যাইতেছেন, সেইখানেই অবনত মস্তকে মানব তাঁহার উপাসনা গ্রহণ করিতেছে। তিনি লিডিয়ার (Lydia) স্বর্ণবহুল ভূমি, ফ্রিজিয়া (Phrygia), রবিতাপে পরিতপ্ত পারস্যের সমভূমি, ব্যাক্ট্রীয়া (Bactria), মিডিয়া (Media) আনন্দময় আরব দেশ, সমগ্র এসিয়া ঘুরিয়া আসিয়াছেন, এবং সর্ব্বত্রই তাঁহার পূজা গৃহীত হইয়াছে, সর্ব্বত্রই দ্রাক্ষার চাষ আরম্ভ হইয়াছে। অতঃপর তাঁহার জন্মভূমি থিবিস্ দেশে আগমন। তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে এসিয়া হইতে একদল মেয়েলোক। থিবিসে তাঁহার পূজাবিধি প্রচারিত হইলেই সমগ্র গ্রীস দেশ তাঁহাকে দেবতা বলিয়া জানিবে।

এইখানে ভারতবর্ষের কোন উল্লেখ নাই, তাইতে টীকাকারেরা কেহ কেহ মনে করেন, ইউরিপিডিসের ভৌগোলিক জ্ঞানে গলদ

ছিল। অর্থাৎ ডিয়োন্যুসস্ ভারতবর্ষও জয় করিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সংস্থান ইউরিপিডিসের জানা ছিল না বলিয়াই তিনি উহার নাম বাদ দিয়াছেন।

ডিয়োন্যুসস্ যখন থিবিসে আসিয়াছেন, তখন সেখানের রাজা পেন্‌থিউস্ (Pentheus)। পেনথিউস্ ডিয়োন্যুসসের মাতামহ ক্যাড্‌মাসেরই আর এক কন্যার পুত্র, অর্থাৎ ডিয়োন্যুসসের মাসতুতো ভাই। ডিয়োন্যুসসের মাসীরা তাঁহার জন্মের কথাই ভুলিয়া গেছে, পূজা ত দূরের কথা। সেই অভিমানে তিনি থিবিস্ দেশের সমস্ত নারীদিগকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছেন। তাহারা গৃহ ছাড়িয়া পাহাড়ে আশ্রয় লইয়াছে—সেখানে বৃক্ষলতার স্নিগ্ধ ছায়ায় ডিয়োন্যুসসের পূজা আরম্ভ হইয়াছে। আর তাঁহার সঙ্গের স্ত্রীলোকেরা পেন্‌থিউসের প্রাসাদের চারিদিকে বাদ্য করিয়া সমস্ত সহর তুলিয়া ধরিয়াছে।

স্বয়ং ক্যাড্‌মাস্ তখনও জীবিত—বার্দ্ধক্য হেতু রাজ্যশাসনের গুরুভার দৌহিত্রের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন; কিন্তু ডিয়োন্যুসস্ তাঁহার দৌহিত্র হইলেও যে দেবাংশে জাত, সুতরাং পূজনীয়, তাহা তিনি জানিতে পারিয়াছেন; এবং বৃদ্ধ বয়সেও এই নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। তাঁহার আর এক সঙ্গী বৃদ্ধ টাইরেসিয়াস্ (Tairesias)। দুই বৃদ্ধ মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়া, লতাবিশেষের মুকুট মস্তকে ধারণ করিয়া, বৃক্ষবিশেষের শাখাগ্র হাতে করিয়া, হাত ধরাধরি করিয়া পাহাড়ের দিকে যাইতেছেন, সেখানে ডিয়োন্যুসসের পূজা হইবে।

এমন সময় পেন্‌থিউস্ আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার প্রজাদের ভিতর, বিশেষতঃ রমণীদের ভিতর হঠাৎ এই দুর্নীতির আবির্ভাব হইয়াছে—সেই চিন্তায় তিনি উৎকণ্ঠিত। তাঁহার মা, মাসী সকলেই এই ব্যাপারে যোগ

দিয়াছেন। লিডিয়া হইতে যে কে একজন আসিয়াছে,—যে আপনাকে দেবতা বলিয়া পরিচয় দেয়—যাহার লম্বা লম্বা চুল, মদের মত গায়ের রং,—প্রেমে আঁখি ঢুলু ঢুলু—সেই ব্যক্তিই এই সব অনিষ্টের মূল। ইহাকে ধরিবার জন্য চারিদিকে লোক প্রেরিত হইয়াছে; এবং যে সব মেয়েলোক ইহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া আপাততঃ কারাগারে রাখা হইতেছে, বিচার পরে হইবে। কিন্তু এ কি? বৃদ্ধ মাতামহ স্বয়ং ক্যাড্‌মাস্‌ যে ঐ পূজার বেশ ধারণ করিয়াছেন? বৃদ্ধ টাইরেসিয়স্‌ও যে! বার্দ্ধক্য ইঁহাদিগকে রক্ষা করিল, নইলে এতক্ষণ ইহারা কারাগারে যাইতেন!

বৃদ্ধ টাইরেসিয়স্‌ তখন বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন যে, পেন্‌থিউস্‌ বড় অধর্ম্ম করিতেছেন। দেবতার সম্বন্ধে এরূপ অশ্রদ্ধা প্রকাশ উচিত নয়। কে বলে, ডিয়োন্যুসস্‌ দেবতা নন? আসলে ত দুই জন মাত্র দেবতা; এক, ডিমিটির (Demeter) বা ধরিত্রী—যিনি মানুষকে ধারণ করিয়া আছেন এবং তাহাকে পোষণ করেন; আর, ইনি ডিয়োন্যুসস্‌—যিনি মানুষের জন্য আর্দ্র পানীয় আবিষ্কার করিয়াছেন; এই পানীয় মানবের দেহে সঞ্চারিত হইলে তাহার দুঃখের অবসান হয়, সে নিদ্রার ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করে এবং সকল কষ্ট ভুলিয়া যায়। দুঃখের আর এমন ঔষধ কি আছে?

কিন্তু পেন্‌থিউস্‌ তাহা মানিতে রাজী নন। সুরার ঢেউ যখন রমণীর দেহে বহিতে থাকে, তখন যাহা হইতে পারে তাহাকে সৎ মনে করা কঠিন। সুতরাং চারিদিকে উন্মত্ত নারীদিগকে ধরিয়া আনিবার জন্য লোক প্রেরিত হইল। বৃদ্ধেরা রাজাকে দেবতার বিরুদ্ধে লড়াই করিতে মানা করিয়া প্রস্থান করিলেন।

এমন সময় চর আসিয়া খবর দিল, যে সকল রমণীকে কারাগারে আবদ্ধ করা হইয়াছিল, তাহারা ডিয়োন্যুসসেরই আর এক নাম 'ব্রোমিও'

'ব্রোমিও' বলিয়া ডাক দেওয়া মাত্রই আপনা হইতেই কারাগৃহের অর্গল খসিয়া পড়িয়াছে! এবং তাহারা সকলেই পলায়ন করিয়াছে। 'যে ব্যক্তি এই সব আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটাইতেছে, এই তাহাকে ধরিয়া আনিয়াছি'—এই বলিয়া দূত স্বয়ং ডিয়োন্যুসস্‌কে উপস্থিত করিল।

পেন্‌থিউস্ তখন ডিয়োন্যুসস্‌কে অনেক কটূক্তি করিলেন! অমন নাদুস্ নুদুস্ চেহারা! কখনও শারীরিক ব্যায়াম করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না; লম্বা লম্বা চুল। কন্দর্পের ছায়া যেন সমস্ত দেহে জড়াইয়া রহিয়াছে! পেন্‌থিউস্ কহিলেন, 'হে বিদেশী, কেমন তোমার তথাকথিত দেব! কেমন তাহার পূজা পদ্ধতি? সূর্য্যালোকে কেন তাহার পূজা হয় না! চুল কেন লম্বা রাখিয়াছ? বুঝিয়াছি, অন্ধকারের ছায়ায় তুমি সুন্দরীদের রূপ ভোগ করিয়া লও!'

গুপ্তবেশী ডিয়োন্যুসস্ উত্তর করিলেন 'আমি ডিয়োন্যুসসের পূজক। লিডিয়া আমার জন্মভূমি। ডিয়োন্যুসস্ স্বয়ং আমাদিগকে এই পূজা শিখাইয়াছেন। তিনি জিউসের পুত্র। অন্ধকারে তাঁহার পূজা হয়, কেন না অন্ধকার যে পবিত্র! লম্বা চুল রাখি, কারণ, উহা দেবতার নামে মানত। অদীক্ষিতের কাছে তাঁহার পূজাবিধি প্রকাশ করা যায় না।'

পেন্‌থিউস্ উত্তর করিলেন, 'জিউস্ কি আবার নূতন দেবতার জন্ম দিতে আরম্ভ করিলেন?'

হুকুম হইল, ডিয়োন্যুসস্‌কে কারাগারে রুদ্ধ করিতে হইবে।

এসিয়া হইতে আগত রমণীরা ডিয়োন্যুসসের আদেশে মশাল হাতে করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। ভীষণ বাদ্য হইতে লাগিল। পেন্‌থিউসের রাজপ্রাসাদ কাঁপিয়া উঠিল, জ্বলিয়া উঠিল, ভূমিসাৎ হইল। ডিয়োন্যুসস্ কারামুক্ত হইলেন।

উন্মত্তপ্রায় পেন্থিউস্ ছুটিতে ছুটিতে আবার তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলেন! এমন সময় কিথাইরন্ পাহাড় হইতে লোক ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, সেখানে পূজা হইতেছে। সহরের সমস্ত রমণীরা সেখানে আছেন। পেন্থিউসের জননী স্বয়ং সেখানে রহিয়াছেন। সে কি বিস্ময়ের ব্যাপার! বিচিত্র মৃগচর্ম্ম ইহাদের পরিধান! সর্প তাহাদের কটিবন্ধ—সেই সর্প আবার মুখ বাড়াইয়া তাহাদের গণ্ডদেশ লেহন করিতেছে! যে সকল নবপ্রসূতী শিশু সন্তান ফেলিয়া গিয়াছে, এবং দুধে যাহাদের বুক ভরিয়া উঠিতেছে, তাহারা বন্য হরিণশিশু কিংবা ব্যাঘ্রশিশুকে কোলে লইয়া তাহাকেই দুধ দিতেছে। মাথায় তাহাদের লতার মুকুট, হাতে বৃক্ষবিশেষের শাখা। যখন তাহাদের পিপাসা হয়, তখন আঙ্গুল দিয়া মাটী খুঁড়িলেই দুগ্ধের স্রোত বহিতে থাকে, বৃক্ষের শাখা হইতে মধুর ধারা ক্ষরিত হয়। সে দৃশ্য দেখিলে আপনা হইতেই এই নূতন দেবতার প্রতি ভক্তি উদিত হয়। যাহারা ইহাদিগকে ধরিয়া আনিতে গিয়াছিল, তাহারা ইহাদের শক্তি দেখিয়া পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছে। ইহাদের গাছের ডাল ছাড়া কোন অস্ত্র নাই; কিন্তু হাতে ছিঁড়িয়া বড় বড় ষাঁড় পর্য্যন্ত চক্ষের নিমিযে মারিয়া ফেলিতেছে। এমন যে শক্তিদাতা দেব, তাহার পূজা গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ। দুঃখহারী দ্রাক্ষালতা ইহাঁরই দান বলিয়া শোনা যায়। দ্রাক্ষারস না হইলে প্রেম হয় না, ইহা না হইলে কোন তৃপ্তিই মানুষের হয় না। সুতরাং ডিয়োন্যুসস্ অপূজ্য নহেন, অন্য কোন দেবতা হইতে তিনি হীন নহেন।

কিন্তু পেন্থিউস্ ভীত হইলেন না, তাঁহার মতি ফিরিল না। তিনি সৈন্যগণকে সজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন, স্বয়ং রমণীদের বিরুদ্ধে অভিযান করিবেন। ছদ্মবেশী ডিয়োন্যুসস্ আবার তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পেন্থিউস্এর দেবতা-বিদ্বেষ অটল। সুতরাং

অতঃপর তাঁহার বিনাশ না হইলে দেবতার পূজা প্রচারিত হয় না। ডিয়োন্যুসস্ তাঁহাকে বুঝাইলেন, সৈন্য সমভিব্যাহারে নারীর বিরুদ্ধে অভিযান লজ্জার কথা; তিনি স্বয়ং একবার গিয়া দেখিয়া আসুন ব্যাপার খানা কি, তারপর কর্ত্তব্য বিধান করিবেন। কিন্তু তাঁহার গুপ্ত বেশে যাওয়া উচিত, নইলে বিপদ্ ঘটিতে পারে। ক্রমে পেন্‌থিউস্ রমণীর বেশে যাইতেই রাজী হইলেন।

পাহাড়ে ভীষণ ব্যাপার সংঘটিত হইল। গুপ্তবেশে পেন্‌থিউস্ বৃক্ষের শাখায় বসিয়া ব্যাপার কি দেখিতেছেন। এদিকে ডিয়োন্যুসসের প্রভাবে উন্মত্তপ্রায় রমণীরা তাঁহাকে পশু মনে করিয়া শাখা হইতে টানিয়া নামাইয়া ফেলিল! সহস্র নারী-হস্তের বিকট আকর্ষণে তাঁহার দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইল; তাঁহার জননী স্বয়ং তাঁহার মস্তকটা ছিঁড়িয়া লইলেন। দেবতার রোষে বিপাকে পেন্‌থিউসের জীবনলীলা সমাপ্ত হইল।

ইউরিপিডিসের নাটকখানি এই খানেই শেষ হইল না বটে, কিন্তু ডিয়োন্যুসস্ পূজার পথ পরিষ্কৃত হইল। তাঁহার একমাত্র বিরোধী অন্তর্হিত হইল।

এইখানে ডিয়োন্যুসসের পূজা প্রবর্ত্তনের এবং সেই পূজার বিধির একটা বৃত্তান্ত পাইলাম। বলা বাহুল্য, ইহার প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিই যে ঐতিহাসিক সত্য, এমন নহে। ডিয়োন্যুসসের পূজা কোথা হইতে গ্রীসে গিয়াছিল, তাহা প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুসন্ধানের একটী বিষয়। ইউরোপেও প্রত্নতাত্ত্বিক আছেন; তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়াছেন, এই পূজা লিডিয়া না ফ্রিজিয়া না থ্রেস্ হইতে গ্রীসে গিয়াছিল। কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তর যাহাই হউক না কেন, এই পূজা গ্রীকেরা করিত; এবং এই পূজা ছিল,—'the widest and best worship known to the best spirits in the best days of the best community of

Hellas.'—গ্রীস দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্প্রদায়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দিনের সকলের চেয়ে উত্তম ব্যক্তিদের মধ্যে সকলের চেয়ে বেশী প্রচলিত এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূজা।

তার পর? তার পর অনেক দিন গিয়াছে। অনেক বাত্যা বহিয়াছে, অনেক নদীর জল সমুদ্রে মিশিয়াছে। আনন্দ যখন সংযমের রশ্মি ছিঁড়িয়া যায়, তখন যাহা হয়, গ্রীকদের ডিয়োন্যুসস্ পূজায়ও তাহাই হইয়াছিল। পেন্‌থিউসের আশঙ্কা একেবারে ভিত্তিহীন ছিল না। তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ফল হয় নাই। যিনি ছিলেন আনন্দের দেবতা, জীবনের অধিষ্ঠাতা, স্ফূর্ত্তির দাতা, কতকগুলি বীভৎস নৃত্য, বীভৎস সঙ্গীত, বীভৎস ক্রিয়াকাণ্ড তাঁহাকে দানবে পরিণত করিয়া দিল। ভারতে তান্ত্রিক পূজার বিকৃতি হইয়াছিল, ডিয়োন্যুসসের ইতিহাসেও সেই ইতিহাসের পুনরুক্তি রহিয়াছে।

সেই গ্রীস আর নাই, সে দিনও নাই। পশ্চিমে বিশ্বজয়ী রোমের নবীন জীবন আরম্ভ হইল। তাহার বিপুল অস্ত্রের আঘাতে গ্রীসের রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যাহত হইয়া গেল। তার পর জুডিয়ার একটী ক্ষুদ্র নগরে একটী দরিদ্র পরিবারের গৃহ আলোকিত করিয়া একটী শিশু জন্ম গ্রহণ করিল! বিশ্ববাসীর জন্য সে এক নূতন বার্ত্তা আনিয়াছিল। আপনার হাতে গড়া, আপনার কল্পনার সৃষ্টি দেবতার চরণে মস্তক লুটাইতে মানুষ আর চাহিল না! শুধু শিল্প ও কাব্যে তাঁহাদের অক্ষয় চরণ-চিহ্ন রাখিয়া দেবতারা একে একে নিরুদ্দেশ হইয়াছেন? যেখানে গাছের ছায়ায়, ঝরণার কল-নিনাদে, পাহাড়ের গাম্ভীর্য্যে, হাওয়ার আনন্দে, আকাশের নীলিমায়, সমুদ্রের বিশালতায়, দেবতাদের লীলা হইত—সেখানে কোন্ সুদূর, অতীত নিশার সুখস্বপ্নের মোহমদিরাময় স্মৃতিটুকু মাত্র জড়াইয়া রহিয়াছে। ইউরোপে এখন এক বিরাট দৈত্য রাজত্ব করিতেছে, তাহার নাম বিজ্ঞান।

ডিয়োন্যুসস্ সুতরাং আর নাই! তাঁহার স্মৃতি রহিয়াছে; আর রহিয়াছে যাহাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার দেবত্ব বিকশিত হইয়াছিল, সেই দ্রাক্ষা। এখনও স্পেনে, ফ্রান্সে, ইটালিতে—দ্রাক্ষার চাষ হয়; এখনও দ্রাক্ষা লতাইয়া লতাইয়া গৃহের প্রাঙ্গণে, পাহাড়ের গায়ে বাড়িয়া উঠে; এখনও দ্রাক্ষার ফল হয়; এখনও সে ফলে রস সঞ্চিত হয়; এবং এখনও সে রসে আনন্দ ও হাসি আছে। ডিয়োন্যুসস্ নাই বটে, কিন্তু এখনও কবি অকবি অনেকেই কীট্‌স্ (Keats) এর ভাষায় বলিয়া থাকেন—

O! for a beaker full of the warm south;

এখনও দক্ষিণদেশে, ইংলণ্ডের দক্ষিণে স্পেনে, ফ্রান্সে ও ইটালিতে যে উষ্ণবীর্য্য জিনিসটী উৎপন্ন হয়, তাহার এক পেয়ালার জন্য দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ে।

তবে দেবতাটীকে তাড়াইয়া আমাদের লাভ হইল কি? দেবতার অপমৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যদি ব্যাপারটীও শেষ হইয়া যাইত, তাহা হইলেই এক কথা হইত। কিন্তু যে ব্যাপারটী জীবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল না, তাহার দেবতাকে সরাইয়া তাহাকে প্রাণহীন ও শ্রীহীন করা হইয়াছে ভিন্ন আর কি লাভ আমাদের হইয়াছে? যীশু স্বয়ং সুরা পান করিতেন, সুতরাং ইউরোপ উহা ত্যাগ করিবার কোন হেতু পায় না। এবং খ্রীষ্টান ধর্ম্মের ব্যাপারবিশেষে উহার পবিত্রতাও হয় ত এখনও রক্ষিত হইয়াছে; স্বাস্থ্য পানের নিয়মে ইউরোপ ইহাকে এখনও ভদ্র করিয়া রাখিয়াছে; কিন্তু সে প্রাচীন সৌন্দর্য্যটুকু কি এখনও আছে?

হাস্যরস ও চিকিৎসক।

সংসারে যদি সব চেয়ে সুন্দর কিছু থাকে, তবে তাহা হাসি। প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা হাসির একটা রূপও কল্পনা করিয়াছিলেন। যে দেশে রাগ-রাগিণীরও একটা স্পষ্ট মূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছিল, সে দেশে হাসির মত অমন মধুর 'কোমল' কান্ত সামগ্রীর একটা রূপ কল্পনা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাই আমাদের আলঙ্কারিকেরা অমন যে স্বচ্ছ, সরস জিনিস হাসি, তাহাতে ধবলতা আরোপ করিয়াছিলেন। হাসির মত অমন নির্ম্মল, শুভ্র জিনিস আর কি আছে? তাই পর্ব্বত-রাজের তুষাররাশির উপমান খুঁজিতে গিয়া কালিদাস তাহাকে ত্র্যম্বকের রাশীকৃত অট্টহাস কল্পনা করিয়াছিলেন।

কিন্তু সকল হাসি সমান শুভ্র নহে। শিশুর অধরকোণে যে অমৃতোপম হাসির রেখা ফুটিয়া উঠে, তাহা যেমন অনাবিল, ঘোর বৈষয়িক বুদ্ধি-সম্পন্ন বিজয়-দৃপ্ত সংসারী শত্রুর পরাভবে যে হাসি হাসিয়া থাকেন, তাহা তেমন অনাবিল নহে। নন্দবংশের ধ্বংস সাধন করিয়া কুটিল চাণক্য, কিংবা ষোড়শ লুইর রক্তে স্নান করিয়া ফরাসী বিদ্রোহীরা যে হাসি হাসিয়াছিল, তাহা শিশুর স্বর্গীয় হাসি নহে। অধরের কোণে হাসির রেখা যে সব সময় একই মনের ভাব প্রকাশ করে না, হাসির বিশেষণসমূহই তার সাক্ষী! নিষ্ঠুর হাসি, তীব্র হাসি বক্র হাসি, কুটিল হাসি প্রভৃতি যত প্রকার হাসির সহিত আমরা পরিচিত, তার সকল গুলির মধ্যেই যিনি হাসেন তাঁর হৃদয়ের আনন্দ ছাড়া আরও কিছু বর্ত্তমান থাকে।

যে কখনও প্রাণ খুলিয়া হাসে না, তাহার সম্বন্ধে সতর্ক হইতে কবি উপদেশ দিয়াছেন। হাসির অতীত যে ব্যক্তি, সে হয় ঈশ্বর

না হয় পশু। কিন্তু তথাপি এমনও লোক আছে, যাহার নিকট সমস্ত বিশ্বটা একটা বিরাট ক্রন্দন। আর যাহার হাসির নেশা এত, যে, জগৎ জুড়িয়া একটা বিরাট, বিশাল হাসির হিল্লোল ছাড়া আর কিছু সে দেখিতে পায় না, বলিতে হইবে, সে ব্যক্তি হাতে স্বর্গ পাইয়াছে। হাসিবার অধিকার ভগবান্ যাহাকে না দিয়াছেন তাহার মত দুঃস্থ আর কেহ নাই।

সমস্ত বিশ্ব-সংসারের মানে খুঁজিতে যিনি নিরস্ত হন নাই, সেই যে বিধাতার অদ্ভুত সৃষ্টি দার্শনিক, তিনি হাসিরও একটা মানে খুঁজিতে চাহিয়াছেন। তিনি জানিতে চাহিয়াছেন, আমরা কেন হাসি এবং কিসে হাসি। কিন্তু এই বিশাল বিশ্বে এত অনন্ত হাসির তরঙ্গ দেখিয়াও যে ব্যক্তি তাহার মানে বুঝে নাই, বুঝিতে হইবে ভগবান্ তাহাকে হাস্যরসে বঞ্চিত করিয়াছেন। দার্শনিক বলিতে চান, যাহা দেখিয়া আমরা হাসি, তাহা হইতে নিজেদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করি। কেহ হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেলে আমরা হাসি, কেন না আমরা মনে করি, হোঁচট খাইবার অবস্থা আমরা পার হইয়া আসিয়াছি, অন্ততঃ বর্ত্তমানে আমরা হোঁচট খাওয়ার মত অবস্থার পর পারে, সুতরাং আমরা বড়। সুতরাং দার্শনিকের মতে হাসিবার বেলায় অন্য যাহাই আমাদের মনে থাকুক না কেন, তার সঙ্গে এই কুজ্ঞানটুকুও আমাদের হৃদয়ে থাকে যে, আমরা—যাহারা হাসিতেছি তাহারা—হাস্যাস্পদ ব্যক্তির চেয়ে বড়। বয়ঃপ্রাপ্ত জীবনের হাসি শিশুর অকারণ আনন্দের অনাবিল প্রকাশ মাত্র নয়; ইহাতে অনেক জ্ঞানের অণু মিশ্রিত রহিয়াছে। আমরা এক জনের না একজনের খরচে হাসি—এক জনের না এক জনের চেয়ে নিজেদিগকে বড় মনে করিয়া আনন্দ উপভোগ করি।

অবশ্যই, শিশুর মত অকারণ হাসি যে আমাদের একেবারেই জুটে না, তা নয়। এমনও অনেকে আছেন যাঁহারা না হাসিয়া কথা কইতে পারেন না ; জীবনের প্রত্যেক কাজে, প্রত্যেক কথায় তাঁহাদের একটা অফুরন্ত আনন্দ রহিয়াছে। কিন্তু সে আনন্দ, সে হাসি অন্যেতে সঞ্চারিত করিয়া দেওয়া কঠিন। পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য যাহাদের রহিয়াছে, হৃদয় যাহাদের নির্ম্মল ও অনাবিল, অস্পষ্ট হইলেও একটী ব্যক্ত হাসির রেখা তাহাদের অধর-কোণে লাগিয়া থাকিবে। কিন্তু এ হাসির অংশ অন্যকে দেওয়া কঠিন। সাধারণতঃ আমরা বাহিরের কোন একটী কিছুকে উপলক্ষ্য করিয়াই হাসি। এবং এই হাসিই আমরা যুগপৎ অনেকেই উপভোগ করিতে পারি।

কে আছে এমন নির্ম্মম, যে শিশুর হাসি দেখিয়া পেচকমূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে? কিন্তু শিশুর হাসির বর্ণনায় আমাদের জ্ঞান হইতে পারে, হাসি আসিবে কি না সন্দেহ। গোপাল ভাঁড়ের দেহটী যখন আমরা ভাবি, তখন মনশ্চক্ষুর সম্মুখে মূর্ত্তিমান্ হাসি দেখিতে পাই ; কল্পনার চক্ষে অন্ততঃ সে মূর্ত্তিটী আমাদের দেখা না হইলে হাসি ফুটিবে না। ব্যঙ্গচিত্র দেখিয়াই আমরা হাসি, শুধু তাহার বর্ণনা শুনিলে হাসি ফুটিতে চাহিবে না। সুতরাং শিশুর হাসি, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের হাসি ছাড়া আর যত রকম হাসি আছে, তাহা সমস্তই বাহিরের কোন না কোন একটা বস্তু উপলক্ষ্য করিয়া জন্মে। আবার এই বস্তুর চিত্র আমাদেব সম্মুখে ধরিলে যত সহজে হাসি উঠিবে, শুধু ভাষার বর্ণনায় তত সহজে তাহা হইবে না।

এই জন্যই সাহিত্যের মধ্যে মানবের যে হাসি ফুটিয়া রহিয়াছে, তাহা শ্রব্যকাব্য অপেক্ষা দৃশ্য কাব্যেই বেশী। কারণ, শ্রব্য কাব্যের ভাষার ঝঙ্কার হইতে হাস্যাস্পদ চিত্রটী আমাদের মানস-পটে আগে

আঁকিয়া লইতে হয় ; এবং এই অঙ্কনে যে আয়াস স্বীকার করিতে হয় তাহাতে ভবিষ্যৎ হাসির মাত্রা কিছু কমিয়া যায়। দৃশ্য-কাব্যে যাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া হাসিতে হইবে, তাহা প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান থাকে ; সুতরাং হাসি সহজেই উৎপন্ন হয়। অবশ্যই, নিপুণ শিল্পীর বর্ণনা-চাতুর্য্যে অনেক সময় শ্রব্য-কাব্যেও হাসির ফোয়ারা জমিয়া উঠে।

দৃশ্য-কাব্যেই হউক কিংবা শ্রব্য-কাব্যেই হউক, সাহিত্যের হাসি একটা কিছু উপলক্ষ্য করিয়া তবে জন্মে। ইহা অকারণ হাসি নহে, সুতরাং ইহার একটা কারণ চাই। এমন একটা বস্তু চাই যাহা হাসি উদ্রিক্ত করিতে পারে।

জগতের সাহিত্যে নানা সময়ে নানা শ্রেণীর লোক কিংবা নানা প্রকার ব্যক্তিবিশেষকে লইয়া হাসিবার চেষ্টা হইয়াছে। কোথাও বা পণ্ডিতকে উপলক্ষ্য করিয়া হাসির সৃষ্টি হইতেছে, কোথাও বা মূর্খ ইহার কারণ ; কোথাও বা কবি, আর কোথাও বা দার্শনিক ; কোথাও বা 'চিন্তাশীল,' আর কোথাও বা 'নীলকমল' ; কোথাও বা ব্রাহ্মণ আর কোথাও বা যজমান এমন আদরের বস্তু হাসির কারণ হইতেছে। দার্শনিককে যে উপহাস করা হইয়া থাকে তার একটা স্মরণীয় দৃষ্টান্ত এরিষ্টফেনিজের 'বারিবাহ' নামক নাটক, যাহাতে জগতের অমর দার্শনিক সোক্রেতিস্ হইয়াছেন হাসির বিষয়। মূর্খ কখনও ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয় নাই, সুতরাং যে সব মূর্খের খরচে সাহিত্য হাসিয়াছে, তাহারা অজ্ঞাত-নামা। সংস্কৃত কাব্যের বিদূষক একাধারে ব্রাহ্মণ ও মূর্খ। ইংরেজ ঔপন্যাসিক ফিল্ডিং বা ডিকেন্স প্রভৃতিতে আমরা অন্যান্য শ্রেণীর লোকের মধ্যে বিচারকের প্রতি হাসির কটাক্ষ দেখিতে পাই। 'চিন্তাশীল'কে স্বয়ং চিন্তাশীল লেখক রবীন্দ্রনাথ উপহাস করিয়াছেন। 'নীলকমল' আমাদের অতি পুরাতন বন্ধু।

ইংরেজ রাজত্বের প্রথমে সমাজে দ্রুত যে সকল পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছিল, সেই সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত নিজেদের জীবন পরিবর্ত্তিত ভাবে গড়িয়া লইতে পারেন বলিয়াই, ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ 'বিদ্যা-দিগ্‌গজ' উপহসিত হইয়াছেন! বাংলা সাহিত্যে যে সকল শ্রেণীর লোক উপহসিত হইয়াছেন, তার মধ্যে 'দুর্গেশ-নন্দিনীর' 'বিদ্যা-দিগজ' এক শ্রেণীর। ডেপুটী ও মুন্সেফদিগকে স্বয়ং ডেপুটী দ্বিজেন্দ্রলাল রায় হাসির পাত্র করিয়া উপস্থাপিত করিয়াছেন। উকীলের বর্ণনা 'কান্ত' কবির লেখায় আছে। কিন্তু রোগের আবাস ভূমি বাংলাদেশে চিকিৎসককে উপহাস করিতে কেহই বোধ হয় এ পর্য্যন্ত তেমন সাহস পান নাই। কিম্বদন্তীতে এক ভিষগ্‌রত্নের পরিচয় পাই. যিনি রোগীর নাড়ী ধরিয়াই চরকের বচন মনে করিয়া আওড়াইয়াছিলেন—'জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যোতিং, ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং';—অর্থাৎ কিনা জবাফুলের রসের সহিত শঙ্খের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া' ইত্যাদি। হারাণ গরু ফিরাইয়া পাইবার জন্য যিনি গো-স্বামীকে বিরেচক ঔষধ দিয়াছিলেন, তিনিও কিম্বদন্তীর কবিরাজ, সাহিত্যের যশঃ তাঁহার ভাগ্যেও ঘটে নাই।

কবিরাজ ছাড়া আরও অনেক প্রকার চিকিৎসকের সহিত আমরা পরিচিত; তন্মধ্যে ডাক্তার প্রধান। কিন্তু একটী ঝকঝকে মোহর হাতে তুলিয়া না দিলে যিনি বাড়ীর কিনারায়ও আসেন না, এবং যন্ত্রের সাহায্যে যিনি হৃদয়ের সকল রহস্য বলিয়া দিতে পারেন, তাঁহাকে উপহাস করিবার মত সাহস বাঙ্গালীর এখনও হয় নাই। সুতরাং যতদূর মনে পড়ে, বাংলা সাহিত্যে চিকিৎসককে, বিশেষতঃ ডাক্তারকে কোথাও উপহাস করা হয় নাই।

কিন্তু যে মহাদেশে ডাক্তারী শাস্ত্রের জন্মভূমি, সেই ইউরোপের সাহিত্যে ডাক্তার একাধিক বার তীব্র উপহাসের পাত্র হইয়াছেন। ইংলণ্ডের ইদানীন্তন প্রসিদ্ধ নাট্যকারদের অন্যতম বার্ণার্ড শ ডাক্তারদের উপর তীব্র আক্রমণ করিয়াছেন। নিজে নিতান্ত নীরোগ না হইলে এরূপ সাহস অনেকের পক্ষেই দুষ্কর। 'চিকিৎসকের উভয়-সঙ্কট' (The Doctor's Dilemma) নামক নাটকে বার্ণার্ড শ' এই সাহস করিয়াছেন। সেখানে একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার যক্ষ্মারোগের একটা নূতন অমোঘ ঔষধ আবিষ্কার করিয়া সরকার হইতে 'স্যর' উপাধি লাভ করিয়াছেন; চারিদিকে তাঁহার যশঃ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এবং এত সব রোগী চব্বিশ ঘণ্টাই তাঁর দ্বারস্থ রহিয়াছে যে, অনেকের সঙ্গেই দেখা করিবার অবকাশও তাঁর নাই। সমব্যবসায়ী সকলেই তাঁহার এই উন্নতিতে আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন; কিন্তু সকলে তাঁর এই চিকিৎসা প্রণালীর সমর্থন করিতেছেন না। তাঁহার মতে এক প্রকার বিষাক্ত জীবাণু অবস্থা বিশেষে রোগীর দেহে প্রবিষ্ট করিয়া দিতে হয়। কিন্তু অন্য একজনের মতে, ইহাতে কোনই ফল পাওয়া যায় না, বরং হিতে বিপরীত হয়। তৃতীয় একজন মনে করেন যে, সর্ব্ববিধ রোগেরই একমাত্র মূলকারণ, দেহের মধ্যে একটী অনাবশ্যক ক্ষুদ্র থলের মত আছে, তাহা। সুতরাং দেহকে নিরাময় করিতে হইলে ঐ থলেটী কাটিয়া ফেলা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

উপাধি গেজেটে প্রকাশিত হইবার পর অন্যান্য ডাক্তারেরা তাঁহার সম্মানে আনন্দ প্রকাশ করিতে আসিয়াছেন এবং এইরূপ তর্কবিতর্ক করিতেছেন, এমন সময় নীচে বসিবার ঘরে রোগীর মেলা জমিয়া গিয়াছে। 'ফরসুত নাই' বলিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে ডাক্তার সকলকেই বিদায় দিতেছেন। কিন্তু একটী স্ত্রীলোক কিছুতেই যাইবে না। অত্যন্ত

বিরক্তির সহিত অবশেষে তিনি তাহাকে দেখা করিবার অনুমতি দিলেন। সে তাহার যক্ষ্মাক্রান্ত স্বামীর চিকিৎসা তাঁহার হাতে সমর্পণ করিতে চায়। অনেক পীড়াপীড়িতে ডাক্তার তাঁহার নবাবিষ্কৃত ঔষধটী পুনর্ব্বার পরীক্ষা করিবার অনুরোধে রোগীটী হাতে লইতে স্বীকার পাইলেন। কিন্তু তাঁহার নিজের সময়াভাব, সুতরাং নিজের হাতে ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিবেন না। তাঁহার উপদেশ অনুসারে অন্য একজন ঔষধ প্রয়োগ করিবেন।

যথারীতি ঔষধ প্রযুক্ত হইলে, রোগীর মরণ-কাল দ্রুত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। তখন 'স্যর' ডাক্তার কহিলেন, ঔষধ ঠিক ঠিক প্রয়োগ করা হয় নাই; যখন দেহে ঋণ-তাড়িতের পরিমাণ বেশী হয়, তখনই ইহা প্রয়োগ করা উচিত; দেহের অবস্থা ঠিক ধরা হয় নাই, ইত্যাদি, ইত্যাদি। 'থলের' ডাক্তারটী কহিলেন, ঐ থলেটা কাটা হয় নাই বলিয়াই যত অনর্থের উৎপত্তি হইয়াছে। এই সকল পণ্ডাপূর্ণ গবেষণার ভিতর রোগীর আত্মা দেহমুক্ত হইল।

বার্ণার্ড শ' এই একখানি নাটকে ডাক্তারদের উপর আক্রমণের সঙ্গে ধর্ম্ম, সমাজ প্রভৃতির উপর আক্রমণও মিশ্রিত করিয়াছেন বলিয়া ডাক্তারদের প্রতি উপহাস একটু প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। ডাক্তারদের প্রতি উপহাসে একাধিক নাটকে ফরাসী নাট্যকার মলিয়ার (Moliere) যেমন কৃতকর্ম্মা হইয়াছে, এমন বোধ হয় আর কেহ হন নাই।

ডাক্তারদের প্রতি উপহাসের প্রধান কারণ, তাঁহারা নিত্য নূতন বিধি গ্রহণ করেন, নিত্য নূতন ঔষধ বদলান, দ্রব্যের নিত্য নূতন গুণ আবিষ্কার করেন, এবং অনেক সময় গুণ না জানিয়াও দ্রব্য ব্যবস্থা করেন। কখনও হয় ত শুনি, সকল রোগেরই উৎপত্তি রক্তে; সুতরাং যে কোন রোগ হইলেই, শরীর হইতে দূষিত রক্ত বাহির করিয়া দেওয়া উচিত। কখনও

হয় ত শুনি, পাকস্থলীই সকল রোগের আধার, সুতরাং উপবাসের মত আর ঔষধ নাই। আবার কখনও হয় ত শুনি, ঔষধ সেবন করিলে হজম হইয়া তাহা বিকৃত হইয়া যায়, সুতরাং তাহার গুণের যাহাতে পরিবর্ত্তন না ঘটে সেই জন্য মাংস কাটিয়া সোজাসুজি তাহাকে রক্তে চালাইয়া দেওয়া উচিত। কখনও হয় ত শুনি, পঁচা জিনিষ মাত্রেই অস্বাস্থ্যকর; দই পঁচা দুধ ভিন্ন আর কিছুই নহে; সুতরাং দইয়ের মত অপকারী জিনিষ আর কিছু নাই। আবার কখনও শুনি, দই নানাপ্রকার কীটাণু নষ্ট করে, সুতরাং ইহা জ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া যক্ষা প্রভৃতি সমস্ত রোগের মহৌষধ। ইত্যাদি প্রকার ক্ষিপ্র মত পরিবর্ত্তনের জন্য এবং কতকটা অনেক সময় নিজেদের অজ্ঞতা পোষাকের জাঁকে ঢাকিয়া রাখিতে চান বলিয়া, রোগীর পরম বন্ধু ডাক্তারকে মলিয়ার একাধিক নাটকে তীব্র উপহাস করিয়াছিলেন। তাহার দুই একটীর পরিচয় আমরা এখানে লাভ করিতে পারি।

'উড়ন্ত ডাক্তার' (The Flying Doctor) নামক নাটকে একটী যুবক প্রেমে পড়িয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সেই প্রেমের আস্পদ বালিকাটীর পিতা মেয়েকে অন্যত্র বিবাহ দিতে ইচ্ছুক এবং সেই অনুসারে বিবাহের দিন পর্য্যন্ত ঠিক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু পিতার ঈপ্সিত জামাতাকে বরণ করিতে বালিকা আবার অনিচ্ছুক, এবং যাহাতে বিবাহ সহজে না হয়, সে জন্য সে পীড়ার ভাণ করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। পিতা বাধ্য হইয়া ডাক্তার আনিতে পাঠাইলেন। যিনি ডাক্তার আনিতে গেলেন তাঁহারও ইচ্ছা প্রথমোক্ত যুবকের সঙ্গেই বালিকার বিবাহ হয়। সুতরাং তিনি সেই যুবকের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ঠিক করিলেন যে, এমন একটী ডাক্তার নিতে হইবে, যে রোগীর স্থান পরিবর্ত্তনের উপদেশ দেয়। তাহা হইলে পরে যুবক যুবতীর মিলন ও বিবাহ হইতে পারিবে। বিবাহ হইয়া গেলে

তাহা আর ভাঙ্গা যাইবে না ; সুতরাং একটু গালি দেওয়া ছাড়া পিতা আর কিছু করিতে পারিবেন না।"

কিন্তু এমন ডাক্তার কোথায় পাওয়া যাইবে? বৃদ্ধ পিতা একটু সাদাসিদে ধরণের লোক, সুতরাং তাঁহার চোখে ধুলি দিবার জন্য যে কোন একটা লোক হইলেই চলিবে। যুবকের চাকরটাকেই অতঃপর ডাক্তার সাজাইয়া নেওয়া স্থির হইল। চাকরও সম্মত হইল। সে মনিবকে কহিল, "আপনি কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন না ; আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, সহরের যে কোন ডাক্তারের মত আমি যে কোন ব্যক্তিকে মারিয়া ফেলিতে পারিব। প্রবাদ আছে যে, মৃত্যুর পরে ডাক্তার আসে, কিন্তু আমার বেলায় দেখিতে পাইবেন যে, ডাক্তার গেলেই মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত!"

মনিব তাহাকে শিখাইলেন, "তোমার বিশেষ কিছু করিতে হইবে না। হিপোক্রেটিস্ ও গ্যালেনের নাম আওড়াইতে হইবে, আর অবশ্যই চক্ষুলজ্জাও ত্যাগ করিতে হইবে।"

চাকর বলিল, "ও! আমাকে বুঝি দর্শন ও গণিত শাস্ত্র কপ্‌চাইতে হইবে? সে আমি খুব পারব।"

অতঃপর ইহাকে ডাক্তারের গাউনে সজ্জিত করিয়া লইয়া যাওয়া হইল।

বালিকার পিতা জর্জ্জিবাস কহিলেন ;—"ডাক্তার বাবু, আপনাতেই আমার সমস্ত আশা ভরসা। আমার মেয়েটাকে আরাম করিয়া দিন্।"

ডাক্তার। হিপোক্রেটিস্ বলেন এবং গ্যালেন্‌ও বলেন, এবং অনেক যুক্তিসহকারে বলেন যে, কাহারও রোগ হইলে সে কখনও সুস্থ বোধ করে না। আপনি আমাতেই আপনার সমস্ত আশাভরসা স্থাপন করিয়া ভালই করিয়াছেন, কেন না আমিই হইতেছি উদ্ভিজ্জ, প্রাণিজ, এবং

খণিজ বিদ্যাতে সব চেয়ে বড়, সব চেয়ে চতুর এবং সব চেয়ে প্রাজ্ঞ ডাক্তার।"

পিতা কহিলেন, "শুনে সুখী হইলাম।"

ডাক্তার কহিলেন, "ভাব্‌বেন না যে, আমি একজন সাধারণ ডাক্তার, একজন সামান্য ডাক্তার। আমার তুলনায় আর সব ডাক্তারের এখনও জন্মই হয় নাই, মনে করা যাইতে পারে।"

ইহার পর ডাক্তার কতকগুলি যা তা ল্যাটিন শব্দ আওড়াইয়া গেলেন, এবং 'দেখি' বলিয়া জর্জ্জিবাসেরই নাড়ী ধরিলেন। একজন তখন স্মরণ করাইয়া দিল যে, ইনি রোগী নন, রোগীর পিতা। ডাক্তার কহিলেন, "তাতে কিছু আসে যায় না। পিতার রক্তই পুত্রীর রক্ত; এবং পিতার রক্তের দোষ দেখিয়াই আমি কন্যার রোগ জানিতে পারিব।"

জর্জ্জিবাস কহিলেন, "ডাক্তার বাবু, আমার বড় ভয় হয়, মেয়েটী নাকি আর বাঁচে না।"

ডাক্তার কহিলেন, "আ! বলেন কি। তিনি কিছুতেই মরতে পারেন না। ডাক্তারের ব্যবস্থা পাইবার পূর্ব্বে তিনি কিছুতেই মরণসুখ অনুভব কর্‌তে পার্‌বেন না। আপনার মেয়েকে একবার দেখ্‌তে পারি।"

অতঃপর রোগিণী আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই ডাক্তার কহিলেন, "তা হ'লে, আপনি অসুস্থ?" মেয়ে কহিলেন "আজ্ঞে হাঁ।"

ডাক্তার। "সে ত বড় খারাপ! ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ নহেন। আচ্ছা, আপনি মাথায় এবং পিঠে বেদনা অনুভব করেন কি?"

রোগী। হাঁ।

ডাক্তার। আমিও তাই মনে করিয়াছিলাম। সেই যে বড় ডাক্তারের নাম করিয়াছি, তিনি জীবের প্রকৃতি সম্বন্ধে অধ্যায়ে বলিয়াছেন—ওঃ,

অনেক ভাল ভাল কথা বলিয়াছেন। এবং দেখাইয়াছেন যে, দেহস্থ যে সমস্ত ধাতুর মধ্যে সম্বন্ধ আছে তাহাদের পরস্পর সম্পর্ক রহিয়াছে ; যেমন, বিষাদ আনন্দের বিরুদ্ধ ; দেহে পিত্ত সঞ্চারিত হইলে আমরা হল্‌দে হইয়া যাই ; আর, রোগের মত স্বাস্থ্যের বিরোধী আর কিছু নাই। সুতরাং, মেয়েটীর নিশ্চয়ই অসুখ করিয়াছে।" ইত্যাদি।

তারপর টাকা নিবার সময়। জর্জ্জিবাস হাতে টাকা গুঁজিয়া দিতে গেলে ডাক্তার কহিলেন 'আপনি আমায় ঠাট্টা করিতেছেন ; আমি কখনও টাকা নেই না ; আমি পয়সাখোর নই।"—এই বলিয়া টাকা কয়টী পকেটে পুরিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

"প্রেমই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক" (Love Is The Best Doctor) নামক নাটকেও 'মলিয়ার' ডাক্তারদিগের প্রতি প্রচুর বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিয়াছেন। সেখানে একজন ভদ্রলোকের কন্যার ব্যাধি সত্য না হইলেও চিকিৎসার প্রয়োজন হইয়াছে। তিনি একেবারে চারজন ডাক্তার আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে একজন পূর্ব্বে আর এক বাড়ীতে এক সইসের চিকিৎসা করিয়াছিলেন ; সেই উপলক্ষ্যে এই বাড়ীর এক পরিচারিকা তাঁকে দেখিয়াছিল। তিনি পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সইসটী কেমন আছে ;" পরিচারিকা কহিল "ভালই আছে ; সে মারা গেছে।" "মারা গেছে ? হ'তেই পারে না।" পরিচারিকা কহিল, "হ'তে পারে কিনা জানি না, কিন্তু মারা যে গেছে, তা ঠিক।" ডাক্তার কহিলেন, "অসম্ভব ! তা কি করিয়া হবে ? হিপোক্রোটিল্ বলেন যে, এরূপ রোগ চৌদ্দদিন কিংবা একুশ দিনের দিন শেষ হবে। তার ত মোটে ছয় দিন অসুখ ছিল।"

যাহা হউক, তারপর বর্ত্তমান রোগীর সম্বন্ধে পরামর্শ হইবে। চারিজন নিরিবিলি বসিলেন। একজন কহিলেন, "প্যারিস প্রকাণ্ড সহর।

যার ব্যবসায় খুব বেশী, তাকে কত দূরই না ছুটাছুটি করিতে হয়!” আর একজন কহিলেন, “আমার একটা বেশ ভাল খচ্চর আছে, সেটা কিছুতেই হয়রাণ হয় না।” তারপর আর একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, “সেদিন যে আর্টেমিয়স্ ও থিওফেষ্ট্রাসের মধ্যে ঝগড়া হইল, তাতে আপনি কোন দিকে।” ইত্যাদি।

এবম্প্রকারে রোগীর ব্যাধি সম্বন্ধে গবেষণা চলিতেছে, এমন সময় রোগীর পিতা ত্রস্তভাবে আসিয়া কহিলেন, “আপনারা কি ঠিক করিলেন? রোগীর অবস্থা যে ক্রমেই খারাপ হইতেছে।”

তখন কে উত্তর দিবেন, তাই নিয়া ঠেলাঠেলি হইতে লাগিল। একজন বলেন আর একজনকে ‘আপনি বলুন’; উনি আবার আর একজনকে বলেন “আপনি বলুন।” ইত্যাদি আদবে অধীর হইয়া রোগীর পিতা যখন আবার তাগিদ দিলেন, তখন তাঁহারা সকলেই সমস্বরে উত্তর করিতে লাগিলেন। শেষে বুঝা গেল. একজনের মতে ‘রোগীর রক্তে অত্যন্ত উত্তাপ জন্মিয়াছে; সুতরাং তাহার রক্তমোক্ষণ প্রয়োজন।’ দ্বিতীয় একজনের মতে ‘রক্তমোক্ষণ করিলে পনর মিনিটের মধ্যেই মৃত্যু হইবে; জোলাপ নেওয়া ছাড়া ইহার আর কোন ঔষধ নাই।’ এইরূপে কলহ করিয়া দুইজন তৎক্ষণাৎ স্থান পরিত্যাগ করিলেন। বাকী দুইজনের দিকে চাহিয়া রোগীর পিতা কহিলেন, “এখন আমি কি করি, কার ব্যবস্থা গ্রহণ করি?” তৃতীয় ডাক্তার মন্থর ভাবে বলিতে লাগিলেন, “এ—রূ—প অ—ব—স্থায় অ—ব—শ্যই খু—ব বি—বে—চ—নার স—হি—ত কাজ ক—রিতে হয়। কেন না, হি—পো—ক্রে—টি—স্ বলেন, এ—সব অ—বস্থায় যে ভুল হ—ই—তে পারে তা—র ফ—ল বড় বি—ষ—ম।” চতুর্থ ব্যক্তিও তাহাতে সায় দিলেন। তারপর এই উভয়ের মতেই ঠিক হইল যে, রোগীর তলপেটে এক প্রকার বাষ্প

জন্মিয়াছে যাহাকে গ্রীক ভাষায় যাহা বলে তাহার অর্থও বাষ্পই। এই বাষ্প ঘনীভূত হইয়া মস্তিষ্কে আরোহণ করিয়াছে। সুতরাং রক্তমোক্ষণ ও বিরেচন—উভয়ই দরকার। একবারে উপকার না হইলে বার বার ইহাই করিতে হইবে। তৃতীয় ব্যক্তি আবার কহিলেন, "ইহা খুবই সম্ভব যে, এরূপ বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা সত্ত্বেও আপনার মেয়ের মৃত্যু হইতে পারে, কিন্তু তা হইলেও আপনি অন্ততঃ এ কথা বলিতে পারিবেন যে, বৈজ্ঞানিক প্রথামত তাঁর মৃত্যু হইল।" চতুর্থ ব্যক্তি সায় দিয়া কহিলেন, "নিয়ম ভঙ্গ করিয়া রোগমুক্ত হওয়ার চেয়ে নিয়ম মত চিকিৎসা অনুসরণ করিয়া মরা ভাল।"

ইহার পর অন্য এক দৃশ্যে পঞ্চম এক ডাক্তার প্রথমোক্ত ডাক্তারদের যে দুইজন ঝগড়া করিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া কহিতেছেন;—"আপনারা কি পাগল? রোগীর আত্মীয়ের সাম্‌নে এমন করিয়া ঝগড়া করিতে হয়? রোগীর সম্মুখে আমাদের সকলেরই একমত হওয়া উচিত এবং ভাল ফল যাহা হয়, তাহা সবই আমাদের চিকিৎসার গুণে হইয়াছে এরূপ বলিতে হয়, আর কুফল মাত্রেই অদৃষ্টের ঘাড়ে চাপাইয়া দিতে হয়।" ইত্যাদি।

রোগ-নির্ণয়ে ডাক্তারদের যে মতভেদের চিত্র 'মলিয়ার' এখানে আঁকিয়াছেন, টীকাকার বলেন, ইহার মূলে ঐতিহাসিক সত্য রহিয়াছে। কার্ডিন্যাল ম্যাজারিনের চিকিৎসায়ও নাকি এরূপ বিভ্রাট ঘটিয়াছিল।

এইখানেই মলিয়ারের ডাক্তার-প্রীতি শেষ হয় নাই। "দায়ে প'ড়ে ডাক্তার" (The Doctor In Spite Of Himself) নামক নাটকে দায়ে ঠেকিয়া এক কাঠুরিয়াকে ডাক্তার হইতে হইয়াছিল। স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া কাঠুরিয়া তাহাকে খুবই উত্তম মধ্যম প্রদান করিয়াছে। তারপর অবশ্যই আপোষ হইয়াছে, কিন্তু স্ত্রীর মনে মনে রাগ রহিয়া

গিয়াছে। সে ভাবিতেছে, কিসে এই প্রহারের প্রতিদান দিবে, এমন সময় এক ভদ্রলোকের কন্যার চিকিৎসার জন্য ডাক্তার খুঁজিতে খুঁজিতে দুই ব্যক্তি সেদিকে আসিয়া উপস্থিত। কাঠুরিয়া-পত্নী তাহাদিগকে কহিল, আমি একজন খুব ভাল ডাক্তারের খোঁজ বলিয়া দিতে পারি। কিন্তু তাকে দেখিয়া হঠাৎ মনে হইবে না যে, সে ডাক্তার; এমনই তার পোষাক পরিচ্ছদ। আর সে যে ডাক্তার একথা তাকে স্বীকার করানও কঠিন। অনেক সময় খুব আচ্ছা রকম না ঠেঙ্গাইলে সে কিছুতেই স্বীকার পাইবে না যে, সে চিকিৎসা জানে। অথচ সে আশ্চর্য্য সব ঔষধ জানে। একটা স্ত্রীলোককে সকলেই মরা মনে করিয়া কবর দিতে নিয়া যাইতেছিল; ছয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত সকলে পরীক্ষা করিয়া মরাই সাব্যস্ত করিয়াছিল; এমন রোগীকে সে এক ফোঁটামাত্র ঔষধ খাওয়াইয়া এমন আরাম করিয়াছিল যে, সে তৎক্ষণাৎ বিছানা হইতে উঠিয়া চলাফেরা করিতে পারিয়াছিল। তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে বার বছরের একটী ছেলে উপর হইতে রাস্তায় পড়িয়া গিয়া মাথা, হাত ও ঠ্যাং ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। এই ডাক্তার গিয়া কি একটা আরক দিয়া কিছুক্ষণ সর্ব্বাঙ্গ ঘসিয়া দিল, আর অমনি ছেলেটা উঠিয়া দৌড়িয়া খেলিতে গেল। অমন যে ডাক্তার, সে সহজে স্বীকার পাইবে না যে, সে চিকিৎসা জানে। ঐ বনে সে কাঠ কাটিতেছে।" এই বলিয়া কাঠুরিয়া পত্নী ইহাদিগকে তাহার স্বামীর নিকট পাঠাইয়া দিল।

কাঠুরিয়াকে প্রথম 'ডাক্তার' বলিয়া সম্বোধন করিতেই সে চমকিয়া উঠিল। প্রাথমিক স্কুলে একটু ল্যাটিন ব্যাকরণের বাহিরে সে কিছু পড়ে নাই। কিন্তু লাঠির মত আর যুক্তি নাই। দুজনে মিলিয়া যখন তাহাকে মারিতে আরম্ভ করিল তখন সে বুঝিল যে, ডাক্তার হওয়া ছাড়া আর তার গত্যন্তর নাই; এবং সঙ্গে সঙ্গে

ইহাও শিখিল যে, যদি কাহাকে সহজে ডাক্তার বানাইতে হয় তবে তাহাকে খুব করিয়া ঠেঙ্গাইতে হয়।

রোগীর বাড়ীতে ঢুকিয়া রোগীর পিতাকে দেখিয়া আমাদের নকল ডাক্তার কহিতে আরম্ভ করিলেন,—"হিপোক্রেটিস্ বলেন—"তারপর আর কিছু মনে হইল না, অগত্যা কি করেন, এই বলিয়া বাক্য শেষ করিলেনঃ—"হিপোক্রেটিস্ বলেন—যে, আমাদের উভয়েরই এখন মাথায় টুপি দেওয়া উচিত।" প্রশ্ন হইল, "বটে, হিপোক্রেটিস্ এই কথা বলেন ?"

"বলেন বৈ কি !"

"কোথায়, কোন্ অধ্যায়ে ?"

"তাঁর সেই—টুপি সম্বন্ধে অধ্যায়ে।"

অতঃপর আর টুপি মাথায় দিতে রোগীর পিতার কোন আপত্তি রহিল না। তারপর যা ঘটিল, এখানে তার দরকার নাই। অবশেষে রোগী দেখিতে যাওয়া হইল।

রোগ আর কিছু নহে। হঠাৎ মেয়েটীর জিহ্বায় কি হইয়াছে, কিছুতেই কথা কইতে পারে না। বলা বাহুল্য, রোগ মিথ্যা, কিন্তু মূর্খ পিতা তাহা টের পান নাই। তিনি ডাক্তারকে কহিলেন, "একটু বিশেষ যত্ন নিয়া দেখুন ; ইহার ব্যাধি আর কিছু নহে—হঠাৎ ওর কথা বন্ধ হইয়া গিয়াছে।"

ডাক্তার। আপনি কিছু ভাববেন না। আচ্ছা, আমায় বলুন দেখি, ওঁর কি খুব যন্ত্রণা হয় !

পিতা। হয় বৈ কি !

ডাক্তার। আচ্ছা, উনি কি খুব কষ্ট পান ?

পিতা। অত্যন্ত।

তারপর, নাড়ী ধরিয়া ডাক্তার কহিলেন, 'এই যে নাড়ী এইখানে, ইহা হইতে জানা যায় যে, ইনি বোবা।' তখন সকলে বলিলেন "আপনি ঠিক ধরিয়াছেন, এই ওঁর ব্যারাম।" উৎফুল্ল হইয়া ডাক্তার কহিলেন, 'আমরা, বড় ডাক্তার যারা তারা, নাড়ী ধরিয়াই বলিয়া দিতে পারি, কি ব্যারাম; এই দেখুন না, আমি স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, আপনার মেয়ে বোবা।"

মেয়ের পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হইতে এরূপ হইল?'

ডাক্তার। ওঃ! এর চেয়ে সোজা প্রশ্ন আর কি আছে! উনি কথা কইবার শক্তি হারাইয়াছেন বলিয়াই বোবা।

পিতা। কিসে সে শক্তি গেল?

ডাক্তার। সমস্ত প্রামাণিক গ্রন্থকারই বলিবেন যে, জিহ্বার জড়তা হইতে এই শক্তির লোপ হইয়াছে।

পিতা। এই জিহ্বার জড়তা সম্বন্ধে আপনার মত কি?

ডাক্তার। সে বিষয়ে আরিস্ততল বলেন—ওঃ, তিনি অনেক আশ্চর্য্য সব কথা বলেন।

পিতা। আমি আপনার কথা মানিয়া লইতেছি।

ডাক্তার। ওঃ, তিনি খুব বড় লোক ছিলেন।

পিতা। তাতে আর সন্দেহ কি।

ডাক্তার। আমার চেয়ে অনেক বড় ছিলেন। যা হ'ক, এখন আমাদের বিবেচ্য বিষয়ে আসা হউক। আমার মতে জিহ্বার এই ক্রিয়া লোপের কারণ শরীরের ভিতরের কতকগুলি দূষিত দ্রব পদার্থ—অর্থাৎ দূষিত দ্রব পদার্থ। যেখানে রোগের সৃষ্টি হয় সেখানে যে সব শক্তি রহিয়াছে তাহাদের ক্রিয়ায় যে সকল বাষ্প নিঃশ্বাসিত হয় তাহা যেন ইসে গিয়া...ইসে। আপনি ল্যাটিন জানেন?

পিতা। মোটেই না।

ডা। আপনি ল্যাটিন বুঝেন না?

পিতা। না।

তখন ডাক্তার পরম উৎসাহের সহিত বাল্যে ল্যাটিন ব্যাকরণে যে কয়েকটী শব্দ শিখিয়াছেন তাহাই আওড়াইতে লাগিলেন; যথা ঈশ্বর পবিত্র। এক বচন, কর্ত্তৃপদ। সৎ, সন্, সতী। উত্তমং, উত্তমঃ, উত্তমা।" ইত্যাদি। সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, কি পণ্ডিত ব্যক্তি!'

ডাক্তার বলিয়া যাইতে লাগিলেন;—"সেই যে বাষ্পগুলির কথা বলিয়াছি, সেই গুলি বাম দিক হইতে অর্থাৎ যে দিকে যকৃৎ রহিয়াছে সে দিক হইতে, ডান দিকে অর্থাৎ যে দিকে হৃৎপিণ্ড রহিয়াছে সেদিকে, যাইবার সময়, ফুস্‌ফুস্, যাহাকে ল্যাটিন ভাষায় (একটা কিছু) বলে, এবং যাহার সঙ্গে মস্তিষ্ক, যাহা গ্রীক ভাষায় (একটা কিছু) কথিত হয়, সেই যে ধমনী যাহার হিব্রু ভাষায় একটা নাম আছে, তাহা দ্বারা সম্বদ্ধ সেই যে ফুস্‌ফুস্, তাহা ঐ বাষ্পগুলির পথে পড়ে; এবং তার ফলে ফুস্‌ফুসের সমস্ত রন্ধ্রগুলি বদ্ধ হইয়া যায়; সেই যে বাষ্পগুলি—ভাল করিয়া বুঝুন—সেই বাষ্পগুলি উদর-গহ্বরে জাত একটা তরল পদার্থ দ্বারা দূষিত হইয়া—(এই খানে আর কিছু ল্যাটিন ঝাড়িলেন)। ইহা হইতেই আপনার মেয়ে বোবা হইয়া পড়িয়াছেন।" ইত্যাদি।

আর উদ্ধৃত করার প্রয়োজন নাই। এই টুকু বলিয়া রাখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সে দিন হইতে আমাদের কাঠুরিয়া একজন বড় ডাক্তারই হইয়া পড়িয়াছিলেন। এবং ইহার পর তিনি আরও অনেক রোগীর চিকিৎসা করিয়াছিলেন।

আড়াই শ বৎসর পূর্ব্বে ফরাসী সাহিত্যে ডাক্তারদের নিয়া কি বিদ্রূপের বন্যা বহিয়াছিল, ইহা হইতেই আমরা তার প্রমাণ পাই।

ইউরোপের সাহিত্যের সহিত সে দেশের ডাক্তারদের সম্বন্ধ নিতান্ত দূর নহে। 'জন বুল' বলিলে যে ইংরেজকে বুঝায় তার জন্য একজন ডাক্তারকে ধন্যবাদ দিতে হয়। ইহা ছাড়া আরও অনেক ডাক্তার বিশেষ মূল্যবান্ গ্রন্থও সাহিত্যে অর্পণ করিয়াছেন। আর, কাব্যের চরিত্র হিসাবেও একাধিক বার সে দেশের সাহিত্যে ডাক্তারের সাক্ষাৎ পাই। ডাক্তার কষ্ট অন্যান্য বিদ্যার সঙ্গে চিকিৎসাশাস্ত্রও জানিতেন। কিন্তু হাস্য-রসের আধার করিয়া ডাক্তারকে সাহিত্যে আনিতে মলিয়ারের মত আর কেহ কৃতকার্য্য হইয়াছেন কিনা সন্দেহ।

এমন তীব্র উপহাস যিনি করিয়াছিলেন, সেই মলিয়ার স্বয়ং এক রকম চিররোগী ছিলেন। তবে, তাঁহার মৃত্যু এত হঠাৎ হইয়াছিল যে, ডাক্তারকে বেশীক্ষণ নাড়ী টিপিতে হয় নাই। 'প্রেমই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক' নামক নাটকে এক পরিচারিকা মনিবকে কহিতেছে "এতগুলি ডাক্তার দিয়া কি হইবে? একজনই কি রোগীকে মারিতে পারে না?" মনিব কহিলেন, "ডাক্তারেরা বুঝি রোগীকে মারিয়া ফেলে?" পরিচারিকা কহিল, "মারে না ত কি? আমি একজন লোককে জানিতাম, সে স্পষ্ট প্রমাণ করিয়া দিতে পারিত যে, অমুক এই ব্যারামে মরিয়াছে না বলিয়া আমাদের বলা উচিত, অমুক চারিজন ডাক্তার ও দুই জন ঔষধ-বিক্রেতার কবলে পড়িয়া মরিয়াছে।" কিন্তু মলিয়রের ভাগ্যে এরূপ ঘটে নাই। তাঁহার যক্ষ্মা ছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বদিনও রোগ নিয়া নাটকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। রঙ্গমঞ্চে থাকার সময়ই রোগের বৃদ্ধি হয়, এবং বাড়ীতে আসার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রক্ত বমন করিতে করিতে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

পাতকী।

আরিস্ততল কহিয়াছিলেন, সমাজে কতকগুলি মানুষ যে গোলাম হইয়া থাকিবে, ইহা বিধির বিধান। মনু কহিয়াছিলেন, কতকগুলি মানুষ ব্রহ্মার পাদ দেশ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, চিরকাল দাস হইয়া থাকাই তাহাদের প্রতি বিধির বিধান। মনু ও আরিস্ততল্ উভয়ের মতেই সমাজের কোন উচ্চ কর্ম্মে ইহাদের অধিকার রহিবে না। মনু ও আরিস্ততলের বিধান কোন সভ্য সমাজে এখন আর আইনের সংহিতায় স্বীকৃত নহে। কোন সভ্য দেশের আইনই এখন আর একথা বলিতে সাহস পায় না যে অমুক অমুক বংশের সকলই চিরকাল দাসত্বই শুধু করিবে, আর কিছু করিতে পাইবে না। কিন্তু দাস এবং তার চেয়েও বেশী, ক্রীতদাস, ত এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। নামে না হইতে পারে, আইনের চোখে না হইতে পারে, কিন্তু কার্য্যে দাস বর্ত্তমান নাই এমন সমাজ কোথায় আছে?

সকল সমাজেই উচ্চ ও নীচ, ভদ্র ও অভদ্রের পার্থক্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। কোন খানে বা ইহা অত্যন্ত কঠোর, কোথাও বা কোমল, কোথাও বা পরিবর্ত্তনসহ আর কোন খানে বা অভঞ্জনীয়, কিন্তু সবখানেই এই একটা প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং আরিস্ততল ও তাঁহার মতানুযায়ীদিগ হইতে আমরা এইটুকু মাত্র উন্নীত হইয়াছি যে, আমরা আর এখন এরূপ প্রভেদকে বৃক্ষ ও লতার প্রভেদের মত সনাতন প্রভেদ বলিয়া মনে করি না। এরূপ প্রভেদ ছাড়া সমাজ কিরূপ হইত, কবি ও দার্শনিক কল্পনার চক্ষে দেখিতে চাহিয়াছেন সত্য, কিন্তু সামাজিকগণ কখনও সেরূপ সমাজের ছায়াও স্পর্শ করিতে পারেন নাই। সুতরাং

বাস্তব সমাজে উচ্চ ও নীচ, প্রভু ও ভৃত্য, রক্ষক ও রক্ষিত, শাসক ও শাসিত—এ পার্থক্য রহিয়া গিয়াছে!

আর আমরা যতই মিষ্ট কথা কই না কেন, সমাজে সব চেয়ে জঘন্য কাজ যারা করে তাহাদিগকে আমরা এমনই ভাবে রাখি যে কোনও খাতায় লেখা না থাকিলেও তাহারা আরিস্তত্‌লের বিধি-সৃষ্ট ক্রীতদাস। মালী মেথরকে খুন করিলেও অপরাধ খুনেরই হয় বটে, কিন্তু মালী মেথর ও নবাবজাদার মধ্যে তফাৎ অনেক; অন্য সব রকমেই উভয়ের অধিকার-অনধিকারের প্রভেদ অনেক। অবশ্যই এমন দেশও আছে যেখানে মুচিখানা হইতে রাজ প্রাসাদে ঢুকিবার অধিকার ও উপায় আছে; এমন দেশও আছে যেখানে মুচির ছেলেও রাষ্ট্র-নায়ক হইতে পারে; কিন্তু তেমন যে দেশ আমেরিকা সেখানেও রকফেলর ও তাঁহার জুতা বুরুশ করে যে ব্যক্তি, এ উভয়ের সামাজিক আসন ঠিক এক নয়। গোপাল ভূপাল হওয়ার দৃষ্টান্ত প্রচুর রহিয়াছে; তথাপি ভূপাল না হওয়া পর্য্যন্ত গোপাল গোপালই; এবং পথে, ঘাটে, হাটে মাঠে এ উভয়ের সাম্য কোথাও নাই! একথা সুতরাং আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, সমাজে উচ্চ ও নিম্নের প্রভেদ রহিয়াছে।

আর ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ইতিহাসে যে সব বিপ্লব হইয়া গিয়াছে, সে সকলের মধ্যে মাঝে মাঝে উচ্চ ও নীচের বিরোধও দৃষ্ট হয়। অনেক সময় অবশ্য জমীদারে জমীদারে যেমন ভূমি নিয়া ফৌজদারী হয়, তেমনই রাজায় রাজায়ও দেশ লইয়া কিংবা বাণিজ্যের সুবিধা-অসুবিধা লইয়া কলহও হইয়াছে। সেগুলি ঠিক সামাজিক বিপ্লব নয়; কারণ তাতে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজাদের সমাজে আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তন বিশেষ কিছু হয় নাই। কিন্তু কোনও একটা সমাজের অন্তর্ভুক্ত উচ্চ ও নীচ শ্রেণীর মধ্যে যে সব কলহ হইয়াছে তাহাতে সেই সেই সমাজের আভ্যন্তরীণ

পরিবর্ত্তন প্রচুর হইয়াছে। সাধারণতঃ এই সকল কলহের কারণ রাষ্ট্রীয় অধিকার, শাসনপ্রণালী গঠিত করিবার অধিকার, সমাজের বিধান কানুন প্রবর্ত্তিত ও পরিবর্ত্তিত করিবার অধিকার। এবং সাধারণতঃ ইহা দেখা যায় যে যখনই এরূপ কলহ হইয়াছে, তখনই তার ফলে নিম্নশ্রেণীর অধিকার বাড়িয়াছে, এবং মোটের উপর জাতি উন্নতির পথেই চলিয়াছে। শক্তিস্পৃহা মানুষের স্বাভাবিক; সকল ব্যক্তি এবং সকল শ্রেণীই চায় ষোল আনা শক্তি নিজের হাতে রাখিতে। সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা তাহা চায়, নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাও চায়। এবং যখন উচ্চ শ্রেণীর শক্তিব্যবহারের ফলে নিম্ন শ্রেণীর অধিকার ক্রমে হ্রাস পাইতে থাকে, বাঁচিবার হইলে নিম্ন শ্রেণীর লোকদের তখন আত্মজ্ঞান হয় এবং তাহারাও শক্তি লাভের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে; নইলে তাহাদের একেবারে নিষ্পেষিত হইয়া যাওয়া অপরিহার্য্য। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর লোকদের হাতে পূর্ব্ব হইতে শক্তি থাকায় তাহারা একেবারে শক্তিশূন্য বড় হয় না; প্রায়ই উভয় শ্রেণীর মধ্যে সমাজশাসনের শক্তি ভাগাভাগি হইয়া যায়। প্রাচীন রোমেও এইরূপ হইয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবের ফলে ফরাসী দেশে তাহা হইয়াছে; ইংলণ্ডে পার্লেমেণ্টের সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত যে সকল পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহার ফলেও তাহাই হইয়াছে।

কোনও একটা জাতির জীবনে যখন এইরূপ জাগরণের সাড়া পড়িয়া যায়, যখন সাধারণ লোকেও বিশিষ্ট, সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর কবলস্থিত শাসন-শক্তিতে ভাগ বসাইতে চায়, তখন সেই উদ্বোধনের উত্তেজনা যাদের নিকট হইতে আসে তারা সাধারণ, গণ্ডমূর্খ, কৃষক মাত্র নহে; এইরূপ চেষ্টায় প্রাণসঞ্চার যারা করে, দরিদ্র হইলেও তারা শিক্ষিত, বুদ্ধিমান্ লোক। ফরাসী দেশের অত বড় ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বিপ্লবের যারা প্রাণ-সঞ্চার করিয়াছিল, তারা লেখা-পড়া জানা লোক। ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয়

বিধানে যত পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহার মূলেও ঐরূপ লোকেরই প্রাধান্য রহিয়াছে। সাধারণতঃ আমরা এই শ্রেণীর লোককে মধ্য-বিত্ত কহিয়া থাকি। যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, ইহারা ঠিক সকলের উচ্চ শ্রেণীর লোক নয়, কিন্তু একেবারে নিরক্ষর কৃষক শ্রেণীর লোকও নহে। সেইজন্যই ইহাদের চেষ্টার একটা বিশিষ্টতা আছে।

এক জনের একচ্ছত্র অধিকারে যে শক্তি রহিয়াছে তাহা, কিংবা তাহার অংশ, কাড়িয়া লইতে হইলে প্রায়শঃই যে বলপ্রয়োগ করিতে হয়, ইহাদের চেষ্টা সাধারণতঃ সে চেষ্টা নহে। অবশ্যই এইরূপ বলপ্রয়োগের সময় যখন যে দেশের ইতিহাসে আসিয়াছে, তখন এই শ্রেণীর লোক যে কখনও তাহা করে নাই, এমত নহে; কিন্তু এই বলপ্রয়োগের পূর্ব্বে লোকের মন গড়িয়া তুলিতে হয়, সমাজে নূতন ভাবের নূতন উত্তেজনার সৃষ্টি করিতে হয়; তাহাতে অনেক সময় রক্তপাত বিনাও অভীপ্সিত পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া যায়। এইজন্য এই ভাব পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে সাহিত্যে তাহার আভাস দৃষ্ট হয়। ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব্বে এইরূপ নূতন ভাব নিয়া সেদেশে এক প্রকাণ্ড সাহিত্য গঠিত হইয়াছিল। সুতরাং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিবর্ত্তনে সাহিত্যিকের দান কতটুকু তাহা সহজেই অনুমেয়।

অবশ্যই একটা নব জাগরণের উন্মাদনা যখন জাতির মনে আস্তে ২ প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে, ভাবের নেশায় সাহিত্যিক তখন প্রায়ই স্বপ্ন দেখেন। বাস্তব জগতের কার্য্যকারণ পরম্পরার লৌহ-নিগড়ে তাহা কি ভাবে পরিণতি লাভ করিতে পারে, সাহিত্যিক অনেক সময় তাহা দেখিবার অবসর পান না। কিন্তু সে দোষ কেবল সাহিত্যিকের নয়; অভূতপূর্ব্ব ভাবের উন্মেষ যার চিত্তে হয় তাহারই এই দোষ হইয়া থাকে। ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব্বে স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রীর যে মন্ত্র সমস্ত জাতির

চিত্তকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল, তাহার প্রভাবে তখনকার লোক দেখিতে পায় নাই যে, তাহাদের এই আদর্শের পূর্ণ সিদ্ধি সম্ভব হইবে না। পরিপূর্ণ সাম্য ও মৈত্রী শুধু ফরাসী দেশে নয়, কোথাও আসে নাই, এবং জগতে কখনও আসিবে কিনা সে বিষয়েও অনেকে সন্দেহ করেন। তথাপি বাস্তব জগতে সম্পূর্ণরূপ সম্ভাব্য না হইলেও এই মন্ত্রের উৎপ্রেরণা না থাকিলে ফরাসী বিপ্লব যাহা করিয়াছে তাহা সাধিত হইত না। সুতরাং সাহিত্যিক-দের কল্পনা সম্পূর্ণ সিদ্ধ না হইলেও, তাহারা সমাজের চিন্তা যে কোনও এক বিশিষ্ট দিকে চালিত করেন, তাহার ক্রিয়া রাষ্ট্রে ও সমাজে প্রকাশ না পাইয়া পারে না। বর্ত্তমানে রুশিয়া দেশ তাহার আর একটী দৃষ্টান্ত।

রুশিয়া প্রকাণ্ড দেশ। ইউরোপ ও এশিয়ার এক প্রকাণ্ড অংশ লইয়া এই বিশাল সাম্রাজ্যের বিপুল কলেবর পুরিয়াছে। জায়গার অনুপাতে লোকসংখ্যা তত বেশী না হইলেও সমষ্টিতে নিতান্ত কম নহে। এত বড় একটা জন-সঙ্ঘের মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, বহু ভাষাভাষী পৃথক্ পৃথক্ জাতির লোকের একত্র সমাবেশ সত্ত্বেও একদেশবাসী ও এক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দরুণ ইহাদের মধ্যে একটা স্থূল ঐক্য রহিয়াছে। এবং ইহাদের একটা রাষ্ট্রীয় ইতিহাসও রহিয়াছে। খুব প্রাচীন না হইলেও অন্ততঃ দুইশত বৎসর পূর্ব্বে জগতের ইতিহাসে রুশের নাম অনেকবার উঠিয়াছে। ইংলণ্ডের সঙ্গে, ফরাসীদেশের সঙ্গে এবং ইদানীং চীন ও জাপানের সঙ্গে রুশের বহু সংঘর্ষ হইয়াছে; এবং প্রায়শঃই পরাজিত হইলেও, দূর হইতে প্রহারের মত এই সকল পরাজয় রুশ-দেহে কাহারও স্থায়ী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। এই সকল পরাজয় সত্ত্বেও, বরং রুশ-সাম্রাজ্যের কলেবর বৃদ্ধিই পাইয়াছে। রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে রুশ সুতরাং নিতান্ত নগণ্য নহে।

তথাপি দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সভ্যতার যে সকল উপকরণ রহিয়াছে, সে গুলির ইতিহাসে রুশের পুনঃ পুনং উল্লেখ দেখা যায় না। দর্শনশাস্ত্রের যে কয়খানা নামকরা ইতিহাস আছে তাহাদের বেশীর ভাগই জর্ম্মাণ পণ্ডিতদের লেখা। কিন্তু সেগুলিতেও ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের ভূয়োভূয়োঃ উল্লেখ ছাড়া চলে নাই। এমন কি, এমন যে অধঃপতিত দেশ হিন্দুস্থান, তাহারও নাম করিতে হইয়াছে। অবশ্যই, গভীর জ্ঞান পরিপূর্ণ জর্ম্মাণ মনেও ভারত সম্বন্ধে জ্ঞান খুব বেশী নহে। ইউবারবেগ্ নামক প্রসিদ্ধ দার্শনিক ঐতিহাসিক শকুন্তলাকে ও মনুসংহিতাকে ভারতীয় দর্শনের অন্যতম প্রধান গ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এবং আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নহে, যে ইহাদের ভিতর তিনি দার্শনিক তত্ত্ব তেমন কিছু পান নাই। ইউবারবেগের পরে ইউরোপ ভারত সম্বন্ধে অবশ্যই আরও জানিয়াছে। ইউবারবেগের মত লোকও ভারতের উল্লেখ আবশ্যক মনে করিয়াছেন। কিন্তু কই, রুশিয়ার ত সেখানে উল্লেখ নাই। তেমনই, বিজ্ঞান ও কলাশিল্পেও রুশিয়ার বিশিষ্টতার তেমন কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে, বিশেষতঃ চতুর্দ্দশ লুইর আমলে, ফরাসী সাহিত্য ও চিন্তার প্রভাব সমস্ত ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল ; এমন কি, জর্ম্মেণীতেও তাহার প্রচুর আধিপত্য ছিল। কিন্তু জর্ম্মেণী তার পরে নিজের জাতীয় একটা বিশিষ্ট ধারা বুঝিয়া লইয়াছে, রুশিয়ার বোধ হয় এখনও তাহা সম্পূর্ণ রূপে হয় নাই।

কিন্তু বিগত শতাব্দীতে বিশেষতঃ তাহার শেষভাগে রুশিয়ার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিবর্ত্তন বহু হইয়া গিয়াছে। রুশিয়াতে ক্রীতদাস প্রথারই একটা প্রকারান্তর অনেক কাল বর্ত্তমান ছিল। আমাদের দেশে যেমন নান্‌কার জমী দিয়া সম্ভ্রান্ত লোকদের ঘরে পুরুষানুক্রমিক 'গোলাম'

রাখা হইত এবং এখনও যেমন স্থানে স্থানে এই প্রথার কোমলতর রূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে, রুশিয়াতে প্রায় সমস্ত কৃষকই এক সময়ে ভূম্যধিকারীর এইরূপ নান্‌কার প্রজা ছিল এবং ভূম্যধিকারীর যত কিছু কাজ তাহা এই সকল নান্‌কারভোগীরাই করিত; এমন কি, বিলাসী রোমে যেমন ছেলেপিলেদের লেখাপড়া শিক্ষার ভারও এক সময়ে ক্রীত-দাসের উপর পড়িত, রুশেও তেমনই এই নান্‌কারভোগীরা প্রভুর ছেলেদিগকে লেখাপড়া শিখাইত, সঙ্গীতাদি দ্বারা প্রভুর মনোরঞ্জন করিত, এবং গৃহ কর্ম্মের অন্য সকল কাজও ইহাদেরই দ্বারা সম্পন্ন হইত। ইহা এক প্রকার ক্রীত-দাস প্রথা, এবং রুশিয়ার জাতীয় প্রকৃতি বাহ্য দৃষ্টিতে অন্ততঃ যেমন কঠোর, ইহার ভিতরও সেই রূপ একটা কঠোরতা বর্ত্তমান ছিল। আমেরিকাতে যখন নিগ্রো ক্রীতদাস রাখা প্রচলিত ছিল, তখন যেমন পলাইয়া যাওয়া ক্রীত-দাসের পক্ষে একটা সাজ্যাতিক অপরাধ ছিল, রুশিয়াতেও তেমনই এই প্রকার ক্রীত দাসেরা যে ইচ্ছামত নান্‌কার পরিত্যাগ করিবে এবং দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবে, সে উপায় ছিল না।

অর্থশাস্ত্রবিদেরা বলেন, যে সমাজে অস্থাবর সম্পত্তির মত ভূমিরও সহজ ক্রয়-বিক্রয় না চলে সে সমাজ অর্থশাস্ত্রের চক্ষে অন্ততঃ তেমন উন্নত নহে। আমাদের দেশে—বিশেষতঃ বাংলার স্থানে স্থানে এখনও দেখা যায় এক খণ্ড ভূমির উপর পাঁচ সাত জনের পাঁচ সাত রকমের অধিকার বর্ত্তমান রহিয়াছে। জমীদার, তালুকদার, পত্তনীদার, জোতদার, বর্গাদার, এবং 'গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকঃ' রেহাণদার—প্রভৃতি বহু 'দারের' ধার এক খণ্ড ভূমি ধারিয়া থাকে। এরূপ স্থলে এমনও ঘটে যে, নিজের কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা ক্রয় করিয়াও ক্রেতা ভূমিতে প্রবেশ করিতে পায় না। এবং যদিও প্রত্যেকেই প্রায় তাহার স্বত্ব বিক্রয় করিবার অধিকার রাখে, তথাপি অন্য সব জিনিসের মূল্য যেমন

সাধারণতঃ বাজারে উপস্থিত জিনিসের পরিমাণ এবং ক্রেতার আগ্রহ ও তাহাদের সংখ্যার উপর নির্ভর করে, ভূমির বেলা প্রায়ই তাহা নহে। সেখানে দেশাচার—গ্রাম-সরহ—তাহার মূল্য ঠিক করিয়া দেয়। দৃষ্টান্ত, ভূম্যধিকারী যখন তাহার স্বত্বের কতক অংশ বিক্রয় করিতে চায় অর্থাৎ জমী পত্তন করিতে চায়, তখন সে যদি ভূমিগ্রহণেচ্ছু প্রজার গরজ অনুসারে ভূমির খাজানা ধার্য্য করিয়া লয় তাহা হইলে আইন তাহা অত্যন্ত সন্দেহের চক্ষে দেখিবে। অথচ, বহু ক্রেতা যেখানে উপস্থিত সেখানে মাছ তরকারী বিক্রেতা যদি সুবিধা বুঝিয়া জুলুম দাম আদায় করে, তাহা হইলেও আইন অন্যায় মনে করে না। ক্রয় বিক্রয়ের বাজারে ভূমির এই স্থাণুবৎ নিশ্চলতা অনেকের মতে সমাজের অনুন্নতির লক্ষণ। কিন্তু রুশিয়ার ভূমি আমাদের ভূমির চেয়েও স্থাণু ছিল। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশে অন্ততঃ ভূমি একাধিক ব্যক্তির স্বত্ব অক্লেশে বহন করিতে পারে, এবং কৃষকের স্বত্ব আইনের রক্ষকতায় সুরক্ষিত; কিন্তু রুশিয়াতে যারা চাষ করিত, তাহাদের বৃক্ষের মত ভূমিতে শিখর-বদ্ধ হইয়া থাকিবার অধিকার ছাড়া অন্য অধিকার কিছু ছিল না। বিক্রয় বা পরিত্যাগের স্বাধীনতা তাদের ছিল না। কিন্তু বিগত শতাব্দীর প্রথমভাগে এই প্রথা লুপ্ত হইয়াছে এবং সাধারণের রাষ্ট্রীয় অধিকারের প্রথম সোপান নির্ম্মিত হইয়াছে।

ইহার পর রুশিয়া এতদূর অগ্রসর হইয়াছে—রুশিয়ার জনসাধারণের অধিকার এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছে যে, ইংলণ্ডের পার্লেমেণ্টের অনুকরণে 'ডুমা'-নামক একটা প্রতিনিধি-সভার প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। অবশ্যই ইংলণ্ডের অনুকরণ পূর্ণতা লাভ করে নাই, তথাপি সাধারণের অধিকার অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। আগে যেখানে রাজা এবং উচ্চ রাজসচিবেরা সুরক্ষিত না হইয়া সাধারণের সমক্ষে বাহির হইতে সাহস

পাইতেন না, সেখানে সেদিন সম্রাট্ স্বয়ং 'ডুমায়' পদার্পণ করিয়া ইহাকে দেশের শাসন পরিচালনের একটী অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। মনে হয়, রুশিয়ার রাষ্ট্রীয় উন্নতির পথ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে; এবং কেহ কেহ আশা করেন, এক সময়ে ফরাসী সভ্যতার যেমন দোহাই চলিত, কিছু দিন পূর্ব্বেও সমগ্র জগতে যেমন জর্ম্মাণ সভ্যতার দোহাই চলিত, কালে রুশিয়ার সভ্যতাও সেরূপ স্থান অধিকার করিতে পারিবে। ভবিষ্যতে যাহা হউক, আধুনিক যুগে রাষ্ট্রীয় উন্নতির প্রথম সোপান যে সাধারণের অধিকারবৃদ্ধি, রুশিয়ার নবীন ইতিহাসেও তাহার প্রমাণ পাই। *

কুসুম কলির ফুটিবার সংবাদ তাহার সুবাস বহন করিয়া আগেই যেমন প্রাভাতিক সমীরণ দিয়া থাকে, জাতির জাগরণের পূর্ব্বাভাসও তেমনই সাহিত্যে পাওয়া গিয়া থাকে। রুশিয়ার এই নব জাগরণের পূর্ব্বাভাস যে সকল সাহিত্যিকের মনে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, টল্‌ষ্টয় ও ডোষ্টয়্‌য়েফ্‌স্কী তাঁহাদের অন্যতম। ইহাঁরা উভয়ই প্রধানতঃ ঔপন্যাসিক।

টল্‌ষ্টয় তাঁহার লেখায় এবং কার্য্যে সাধারণের প্রতি যে অনুরাগ দেখাইয়াছেন, তাহার কাহিনী দীর্ঘ। কিন্তু ডোষ্টয়য়েফ্‌স্কী সাধারণের জীবনের যে একটা বিশিষ্ট দিকে দৃক্‌পাত করিয়াছেন, তাহার আংশিক বিবরণ সংক্ষেপে দেওয়া এখানে অসম্ভব নয়।

ইংরেজের সুশাসনের ফলে আমাদের প্রত্যেক বড় সহরে, প্রত্যেক জিলার এবং মহকুমার সদর সহরে উচ্চপ্রাচীর-পরিবেষ্টিত, সশস্ত্র-প্রহরী-পরিরক্ষিত, সাধারণের দৃষ্টির ঈষৎ অন্তরালে যে একটী সুনির্ম্মিত গৃহ

* পাঠক মনে রাখিবেন যে, এই প্রবন্ধটী 'সোভিয়েট' গবর্ণমেণ্ট হওয়ার অনেক পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল এবং তখন সোভিয়েটের আবির্ভাবের কোন্ পূর্ব্বলক্ষণই প্রকাশ পায় নাই।

দেখা যায়. আমাদের দৃষ্টি বড় একটা সে দিকে যায় না, সাহিত্যিকের ত মোটেই নয়। 'দ্বারোপান্তে লিখিতবপুষৌ শঙ্খচক্রৌ চ দৃষ্ট্বা' মেঘ তাহার বাড়ী চিনিয়া লইতে পারিবে, যক্ষ মেঘকে এই কথা বলিয়াছিল। কয়েদখানার দ্বারে তেমন কিছু লিখিত না থাকিলেও ইহার চারিদিকে এমনই একটী বিষাদ-গম্ভীর ছায়া রহিয়াছে যে, সহজেই ইহাকে চিনিয়া লওয়া যায়। কবির নিকট শুনিতে পাই, নরকের তোরণে নাকি লিখিত আছে, 'এখানে যারা প্রবেশ করিবে তারা সকল আশা পরিত্যাগ করুক' : জেলখানার দ্বারে তেমন কিছু লিখিত না থাকিলেও, যারা সেখানে প্রবেশ করে তাদের প্রতি সমাজের ব্যবহার কিরূপ? বাহুর শক্তি, বিধানের শক্তি, নিন্দাস্তুতির শক্তি—সামাজিক সকল শক্তিই কি ইহাদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত নহে? সব দেশেই এইরূপ পাতকী রহিয়াছে। এবং সব দেশেই ইহাদিগকে এমনই কঠোরভাবে পিঞ্জরে পূরিয়া রাখা হয়।

কিন্তু ইহাদের দুঃখের কথা—ইহাদের পাপ-চিকীর্ষার মূলে যে অংশতঃ হইলেও সমাজের সহায়তা রহিয়াছে তাহার কথা, টলষ্টয় ও ডোষ্টয়েফ্স্কী ছাড়া আর কেহ বোধ হয় এমন করুণ ভাবে সাহিত্যে উপস্থিত করেন নাই। ইহাদের বেশীর ভাগই সাধারণ শ্রেণীর লোক, —কদাচিৎ দুই একজন উচ্চশ্রেণীর লোক দেখা যায়। আর ইহাদিগকে যারা শাস্তি দেয়, স্বাধীন দেশে শাসন-দণ্ড যাদের হাতে থাকে, তারা সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোক। অথচ ধনীর অর্থ যে ইহাদিগকে সময়ে সময়ে পাপের পথে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে, টলষ্টয় একস্থানে তাহা দেখাইয়াছেন; এবং অর্থাভাবই যে অধিকাংশ স্থলে পাপ-প্রবণতার মূল কারণ, টলষ্টয় ও ডোষ্টয়েফ্স্কী উভয়ই তাহা দেখাইয়াছেন। সুতরাং পাতকীর প্রতি কয়েদের বিধানে সমাজের অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীর লোকদের ন্যায়তঃ অধিকার কতটুকু, এ প্রশ্ন আজ উঠিয়াছে। যে দেশ, যে সমাজ

নিজেকে সকল রকমে উন্নত করিতে চায়, এই পাতকীদের প্রতি আইনের ব্যবস্থার কথাও কি তার ভাবা উচিত নহে? জনসাধারণের উন্নতি ছাড়া কখনও দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হয় না যে।

সুদূর সাইবেরিয়াতে কয়েদীদের অন্য যে সকল কয়েদ খানা রহিয়াছে, কয়েদীদের ভাষায় সেগুলিকে 'মৃতের গৃহ' বলা হয়। 'মৃতের গৃহ' নামক উপন্যাসে ডোষ্টয়েফ্‌স্কী জেলখানায় কয়েদীজীবনের দীর্ঘ কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা নামে উপন্যাস বটে, কিন্তু উপন্যাস বলিতে বাংলাদেশে অন্ততঃ যাহা বুঝায়, তাহার কিছুই ইহাতে বর্ত্তমান নাই। বরং ইতিহাসকে কার্য্যকারণের কঠোর, বৈজ্ঞানিক বৃত্তান্ত না করিয়া মানুষের সুখদুঃখের সহিত সমঞ্জস করিয়া লিখিলে যেমন মধুর হয়, ইহা তাহাই।

কিন্তু 'বিধিভঙ্গ ও তাহার শাস্তি'—নামক তাঁহার অন্যতম উপন্যাসে ডোষ্টয়েফ্‌স্কী পাপীর চিত্তের গভীরতম প্রদেশ উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। এই উপন্যাস খানার নায়ক একজন কলেজের ছোকড়া। দারিদ্র্যের পীড়নে তাহার পড়াশুনা বন্ধ হইয়া গিয়াছে; আলোক-বাতাস রহিত এক খানা জীর্ণ কোঠায় সে থাকে এবং অর্থের অভাব হেতু ভাল করিয়া সব দিন খাইতে পায় না, কোন দিন বা অনাহারেই কাটিয়া যায়। সামান্য মূল্যের জিনিসও যাহা ছিল তাহা একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের নিকট বন্ধক দিয়া যে কিছু অর্থ পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে কয়েক দিন চলিয়াছে। কিন্তু আর চলে না। একটী অতি জীর্ণ শীর্ণ পরিচ্ছদ ছাড়া তাহার এখন আর কিছুই নাই।

তাহার চিত্তে অনেক দিন হইতে একটা ভাবের উদয় হইয়াছে, যারা দিগ্বিজয়ী বীর, যারা পৃথিবীর প্রভু তাহারা শত শত লোকের শোণিত পাত করিয়া নিজের পথ পরিষ্কার করিয়াছে; আমি কেন

ঐ বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটীর সংহার করিয়া তাহার অর্থে নিজের উন্নতির পথ পরিষ্কার করিতে পাইব না? নেপোলিয়নের মত বীর, "সত্য সত্যই যে প্রভু, সে সকল কাজই করিতে পারে, তুলোঁ সহর ভূমিসাৎ করিতে পারে, প্যারিসে শত শত লোকের রক্তপাত করিতে পারে, একটী সমগ্র সেনার কথা ভুলিয়া গিয়া মিশরে তাহাদিগকে মৃত্যুমুখে ফেলিয়া আসিতে পারে, মস্কো-অভিযানে পাঁচ লক্ষ লোক অতিরিক্ত খরচ করিয়া ফেলিলে তাহার পক্ষে দোষের হয় না, এবং ভিল্‌না সহরে একটু কৌতুক করিয়া নির্ব্বিঘ্নে দেশে ফিরিতে পারে; আর মৃত্যুর পর তাহার স্মৃতিরক্ষার জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়; এরূপ লোক সকল কাজই করিতে পারে, তাহার পক্ষে কিছুই দূষণীয় নয়।" সমাজের কোন কাজে আসে না এমন যে একটা বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, আমি কেন তাহাকে নিহত করিতে পারিব না? এই ভাবিয়া সত্যসত্যই সে ঐ স্ত্রীলোকটাকে নিহত করিয়াছিল। অবশ্যই, সে এই পাপ হজম করিতে পারে নাই; প্রচুর মানসিক কষ্ট ভোগ করিয়া সে তাহার পাপ স্বীকার করে এবং সমাজের বিহিত শাস্তি—সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসন-দণ্ড গ্রহণ করে।

উপাখ্যানটীর এই মূল ঘটনা হইতে প্রতিপন্ন হয়, অভাব অনাহার পাপের জন্য কতটুকু দায়ী। অভাব হইতে শুধু এই প্রকার পাপের উৎপত্তি হয় না; সমাজে যাহারা পতিতা রমণী তাহারা যে অনেক সময় চিত্তে পাতকিনী নয়, দুর্জ্জয় অভাবের পীড়নে বাহিরে শুধু পাতিত্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, এই উপন্যাসেই সোনিয়ার চরিত্রে ডোষ্টয়েফ্‌স্কী তাহাও দেখাইয়াছেন। গ্রন্থ খানার সাহিত্যিক মূল্যই বেশী; ইহার নৈতিক উদ্দেশ্য খুব প্রকট নহে। তথাপি উদ্দেশ্য যে একটা রহিয়াছে, বিষয় নির্ব্বাচনেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

ডোষ্টয়য়েফ্‌স্কীর ইহার চেয়ে বেশী পরিচয় এখানে দেওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, জাতির জাগরণের দিনে সাহিত্য সাধারণের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করে এবং সাধারণের চিন্তায় পাতকীর কথাও উঠিয়া পড়ে। পাতকীর প্রাচুর্য্য সমাজের কলঙ্ক, পাতকীর অস্তিত্ব তাহার অসম্পূর্ণতা। যে সমাজ নিজেকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে চায়, তাহার সাহিত্যকে ভাবিতে হইবে পাপ কেন হয় এবং কিসে তাহার নিবৃত্তি বা হ্রাস সম্ভব। পাপীকে কয়েদে আবদ্ধ করিলেই সমাজ নিরাপদ্ হইবে না; কারণ যত দিন বর্ত্তমান থাকিবে কার্য্য তত দিন দেখা দিবেই। আর রুশিয়ায় যদি নিহিলিষ্ট্‌দের সংখ্যা কমিয়া থাকে, অন্যদেশেও তবে পাতকীর সংখ্যা হ্রাস পাইতে পারে।

য়্যানাতোল ফ্রান্স।

আমাদের বেশ মনে হয়, এদেশে কিছুদিন পূর্ব্বে এমন এক শ্রেণীর সুরুচিসম্পন্ন লোক ছিলেন, যাঁরা সংস্কৃত সাহিত্যের উপর, বিশেষতঃ সংস্কৃত সাহিত্যের কোহিনূর কালিদাসের উপর অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের তথাকথিত অশ্লীলতাই ছিল ইহার কারণ। এখন আর বোধ হয় অশ্লীলতার নিমিত্ত সংস্কৃত সাহিত্যের কেহ অনাদর করে না। কারণ, ইউরোপের সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে আমরা জানিয়াছি, সে দেশের সাহিত্যেও এমন সব নামকরা লেখক আছেন, যাঁহারা অশ্লীলতায় কালিদাসকেও জয় করিয়াছেন। ইংরেজ ঔপন্যাসিক লরেন্স্ ষ্টার্ণের সৃষ্টি—ট্রীষ্ট্রাম শ্যাণ্ডী এবং ফিল্ডিং এর সৃষ্টি 'টম্ জোনস্' প্রভৃতির নাম করিতে সাহিত্যের ইতিহাস লেখকেরা ভুলেন না; অথচ, ইহাদের নিকট কালিদাসকে নিতান্তই বর্ণহীন

দেখাইবে। শুধু অশ্লীল ক্রিয়াকলাপ বর্ণনা করিবার জন্যই কালিদাস কোন নাটক বা কাব্যের অবতারণা করেন নাই। রঘুবংশের শেষ সর্গটাই বোধ হয় কালিদাসের সকল লেখার মধ্যে বেশী অশ্লীলতা দাবী করিতে পারে; কিন্তু সেখানেও তিনি ভাষার ও ভাবের অলঙ্কারে তাঁহার বক্তব্য অশ্লীল বিষয়গুলি এমনই ভাবে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন যে, ফিল্ডিংএর বর্ণনার কাছে তাহা ধর্ম্ম-শাস্ত্র বলিয়া প্রতীত হইবে।

বাঙ্গালার হঠাৎ উত্থিত সুরুচির মতে কালিদাস হয়ত অনেক জায়গায়ই অনাবশ্যকরূপে অশ্লীল উপমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। মেঘ ও নদীর মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া তিনি একটু রসিকতা করিয়াছেন এবং হয়ত তেমন সুরুচি রক্ষা করিতে পারেন নাই; কিন্তু ইহা একটা উপমার ছায়া মাত্র, মূল বক্তব্য বিষয় নহে; এবং ইহাকেও তিনি এমনই সাধারণ ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে, কোন বিশিষ্ট চিত্র আমাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠে না। কিন্তু ফিল্ডিং কি করিয়াছেন? পথে, ঘাটে, মাঠে, হোটেলে কিংবা জঙ্গলে তিনি ব্যক্তিবিশেষের ক্রিয়ার যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা উপমা মাত্র নয়, মূল বর্ণনীয় বিষয়।

"কুমারসম্ভবের" শেষ কয় সর্গ যে অশ্লীল, একথা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য। কিন্তু সেগুলি কালিদাসের লেখা কি না সন্দেহ। মল্লিনাথ সেগুলির টীকা করেন নাই; এবং আলঙ্কারিকেরা সেগুলিকে 'পিতৃবিহারবর্ণনমিব' বলিয়া অত্যন্ত নিন্দা করিয়াছেন।

সুতরাং একথা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, হাজার অশ্লীল উপমা প্রভৃতির আশ্রয় নিলেও কালিদাস রুচিতে ফিল্ডিং প্রভৃতির চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। অশ্লীলতার জন্য স্বর্ণ-কেয়ুর যদি কাহারও প্রাপ্য

হয়, তবে তাহা ইউরোপের সাহিত্যিকেরাই পাইবেন; সংস্কৃত সাহিত্যিকদের ভাগ্যে সে পুরস্কার জুটিবে না।

আমরা জয়দেবের কথা ভুলিয়া যাইতেছি না। কিন্তু জয়দেবেরও দেশ-কাল-পাত্রের জ্ঞান আছে। তিনি যে বিহার-বর্ণনা করিয়াছেন তাহাকে প্রেমের বিকাশ হিসাবে দেখিতে হইবে; ইহা একটা আকস্মিক মিলন নহে; ইহাতে দিনের পর দিনের সাধনা ও আকাঙ্ক্ষা পরিণতি লাভ করিয়াছে। ইহা কামীর পশুপ্রবৃত্তির আকস্মিক উৎসব মাত্র নহে, ইহা সাধিকার অভিলাসের চরিতার্থতা, ইহা দীর্ঘ বিরহে উদ্দীপ্তপ্রেমা প্রেমিকার আত্মোৎসর্গ। দিনান্তরে যে প্রেম বিস্মৃত হয়, ইহা সেরূপ পণ্য-প্রেমের ক্ষণিক স্ফুরণ মাত্র নহে। সুতরাং দাম্পত্য প্রেম মাত্রেই যদি নিন্দিত না হয় এবং বিবাহিত জীবন মাত্রেই যদি অশ্লীল না হয়, তাহা হইলে জয়দেবের নামে নাসিকা কুঞ্চিত করিবার অধিকার আমাদের নাই।

জয়দেবের পক্ষে যাহা বলা যাইতে পারে, এক ভারতচন্দ্র ছাড়া সমগ্র প্রাচীন বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধেও তাহা বলা যাইতে পারে। ভারতচন্দ্রের বিষয়টী হয় ত তত সুনির্ব্বাচিত হয় নাই, কিন্তু তথাপি তিনি যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা লোকচক্ষুর অন্তরালে ঘটিয়াছে, এবং তখনকার সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করিলে ইহাও বোধ হয় বলা যায় যে, ইহা বৈধ উপায়ে ঘটিয়াছে। সেখানেও একটা কাব্যকলা আছে, একটা প্রতীক্ষা আছে, এবং ঈপ্সিত বস্তুর প্রতি একটা একনিষ্ঠা আছে; ফৌজদারী আদালতে যে সকল ব্যাপার দণ্ডিত হয়, তাহাদের অদম্য আকস্মিকতা ইহাতে নাই; এবং পণ্য-প্রেমের অসংযমও ইহাতে লক্ষিত হয় না। প্রকৃত প্রেম ও আদালতে দণ্ডনীয় শারীরিক ব্যাপারের যে একটা পার্থক্য আমরা করিয়া থাকি, তাহা মনোবৃত্তির পার্থক্য।

প্রেম মনেতে যে ভাব আনয়ন করে তাহা কখনও নিন্দনীয় নহে, কিন্তু পশু-প্রবৃত্তির সাময়িক উত্তেজনা সর্ব্বদাই গর্হিত। আমরা ভারতচন্দ্রের সম্পূর্ণ সমর্থন করিতে পারি না, কিন্তু তথাপি এইটুকু তাহার পক্ষে বলিতে পারি যে, তিনি প্রীতির চিত্রই আঁকিয়াছেন, যদিও ইহা—'গুপত পিরীতি'।

এই সকল প্রাচীন সাহিত্যিকদিগকে যে আমরা কখনও কখনও অশ্লীল বলিয়া থাকি, তাহার কারণ তাঁহাদের বর্ণনীয় বিষয় নহে, বর্ণনার অত্যধিক পরিস্ফুটতা; চিত্রে এত অধিক রং না ফলাইলে—প্রত্যেক বিন্দু ও প্রত্যেক রেখাকে এত ব্যক্ত করিয়া না বলিলে—আমরা কখনই ইঁহাদের নিন্দা করিতে পারিতাম না। নরনারীর প্রেম বর্ণনা যদি নিষিদ্ধ হইত, তাহা হইলে এতদিন সাহিত্যের সমাধিতে আমরা স্মারক লিপি লিখিতে বসিতাম। কিন্তু বর্ত্তমান রুচি সাহিত্যে এই সব ব্যাপারের এত স্ফুট বর্ণনা চায় না; ইঙ্গিতকেই আমরা এখন যথেষ্ট মনে করি। চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব, বিকাশ এবং পরিণতির দিকেই আমরা বেশী দৃষ্টি রাখিতে চাই, ইহার বেশী আমরা কিছু চাই না; আর সর্ব্বত্রই আমরা চাই—বিহিত প্রেমের চিত্র; গর্হিত প্রেমের বর্ণনা আমরা কখনও প্রশংসা করিতে পারি না।

এই কথাটা আজ বিশেষ করিয়া আমাদের মনে রাখা উচিত। কারণ, বহুরূপীর দ্রুত বেশ পরিবর্ত্তনের ন্যায়, বাঙ্গালীর মত এত সহজে পরিবর্ত্তিত হয় যে, যে দেশে এক সময় কালিদাসকে কুরুচিপূর্ণ মনে করা হইত, সেখানেই এখন সুরুচির কথা স্মরণ করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে।

এই মত পরিবর্ত্তনের কারণ, ইউরোপের নবীন সাহিত্যের সহিত আমাদের নিকট পরিচয়। ইউরোপের নবীন সাহিত্যিকদের মধ্যে

যাঁহাদের নাম ঘাটে, বাটে, মাঠে উচ্চারিত হয়, তাঁহাদের অনেকেরই রুচির কথা ভাবিলে 'বিদ্যাসুন্দরের' দেশেরও আতঙ্ক উপস্থিত হইতে পারে। 'বিদ্যাসুন্দর' অতীতের কথা, সে সময়ের সামাজিক অবস্থা আর এখন নাই। এখন প্রায় সব ভদ্রপরিবারেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই পড়িতে জানে এবং পড়িয়াও থাকে। এখন আবার কেহ অমন সাহিত্য রচনা করিতে আরম্ভ করিলে সমাজ শঙ্কিত হইতে পারে। কিন্তু ঠিক এমনই দিনে, যখন আমরা বিস্ফারিত নেত্রে চারিদিকে সাহিত্য-সামগ্রীর অনুসন্ধান করিতেছি তখন, আমাদের সকল জ্ঞানের আপণ ইউরোপে যে এক শ্রেণীর সাহিত্যিকের আবির্ভাব হইতেছে, তাহার কথা ভাবিলে ইউরোপকে খুব প্রশংসা করিতে ইচ্ছা হয় না।

ইউরোপের ইদানীন্তন সাহিত্যরথীদের মধ্যে মোটামুটি দুইটী বিশিষ্ট ধরণ লক্ষ্য করা যায়। এক শ্রেণীর লেখক আছেন যাঁরা যত সব সামাজিক ও নৈতিক সমস্যাকে সাহিত্যের আসরে টানিয়া আনিয়া কাব্যের রঙ্গীন বেশে সজ্জিত করিয়া উপস্থিত করিতেছেন। ইংলণ্ডের বার্ণার্ড শ এই শ্রেণীর একজন প্রধান পাণ্ডা। আর এক শ্রেণীর লেখক আছেন, যাঁহারা সাহিত্যের সনাতন উদ্দেশ্য চিত্ত-বিনোদনকেই উদ্দেশ্য বলিয়া মানিয়া লইতেছেন, কিন্তু সকল শ্রেণীর লোকের চিত্ত-বিনোদন বোধ হয় ইঁহাদের উদ্দেশ্য নহে।

সকল সমাজেই যাহারা সর্ব্বদা কোনও একটা কাজে ব্যাপৃত, তাহাদের পক্ষে কার্য্য হইতে একটু অবসর, একটু বিশ্রামই যথেষ্ট চিত্ত-বিনোদন; কিন্তু যাঁহাদের কোন কর্ম্ম নাই, অলসতা যাঁহাদের দুর্ব্বহ হইয়া পড়ে, তাঁহাদের চিত্তবিনোদনের জন্য একটু মধুর কোমল বিষয়ের পঠনাদি ব্যাপার অনেক সময় প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। সাহিত্যের মদিরা-রস ইঁহারা উপভোগ করিতে পারেন, কিন্তু আখরোটের খোসার

মত কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া, বুদ্ধি শক্তিকে একটু আয়াস দিয়া, যেখানে সাহিত্য রস উপভোগ করিতে হয়, সেখানে ইঁহারা যাইতে নারাজ। মিল্‌টন বা গেটের সাহিত্য ইঁহাদের জন্য নহে। ইঁহারা চান এমন বিষয় যাহা সকলেই জানে, আর এমন বর্ণনা যাহা হইতে একটুও না ভাবিয়াই বক্তব্য বিষয় বুঝা যায়; ইঁহাদের পক্ষে তেমন সাহিত্য আদরের জিনিস, যাহা রসে ভরপুর অথচ যাহার রস অনায়াসলভ্য। এমন রস কিরূপ সাহিত্যে মিলে? রায়-গুণাকরের দেশে তাহা কে না জানে?

কিন্তু সাহিত্যের এই শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকদিগকে অবহেলা করা যায় না। ইঁহারা আমোদের জন্য অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত নন। সুতরাং যাঁহারা শুধু পৃথিবীর সংস্কারের জন্য সাহিত্য রচনা করেন না, 'যশসেঽর্থকৃতে' যাঁহাদের চেষ্টা, তাঁহারা জানেন শেষোক্ত জিনিষটী কোথায় মিলে। দুই একজন কঠোর সমালোচকের নিন্দা স্তুতিতে ইঁহাদের কিছু আসে যায় না; দীর্ঘ অর্থের ঝুলি উন্মুক্ত করাইতে পারিলেই ইঁহারা কৃতার্থম্মন্য। এইরূপে অলস ধনীশ্রেণীর চিত্ত-বিনোদনার্থে যে কিরূপ সাহিত্য রচিত হইতে পারে, লরেন্স ষ্টার্ণ তার উদাহরণ। এবং এই শ্রেণীর লেখকের সংখ্যা ইউরোপের বর্ত্তমান সাহিত্যেও কম নহে। ইহাদের মধ্যে ফ্রান্সের য়্যানাতোল ফ্রান্সও বোধ হয় একজন।

বর্ত্তমানে একটা কথা প্রায়ই শুনিতে পাই যে, সাহিত্যের মধ্যে প্রধান দ্রষ্টব্য তাহার বক্তব্য বিষয় নহে, তাহার বর্ণনা-চাতুর্য্য, তাহার প্রকাশ-ভঙ্গি, এক কথায়, তাহার শিল্প। যে কোন বিষয় নিয়াই লেখা হউক না কেন, লেখন-ভঙ্গি যদি পরিপাটী হয়, তাহা হইলেই তাহা প্রশংসাভাজন হইবে। দেবাসুরের দ্বন্দ্বই আলোচ্য বিষয় হউক, আর সহরের কোন জঘন্যস্থানের চিত্রই অঙ্কিত হউক, সাহিত্যের প্রশংসা উভয়েই লাভ করিতে পারে, যদি তাহাতে শিল্প-চাতুর্য্য থাকে। এই

শিল্প-চাতুর্য্যের কি মানে তাহা আমরা ঠিক জানি কিনা সন্দেহ। তবে মনে হয়, সাহিত্যিকেরা যেন আজকাল বলিতে চান, "কি লিখিয়াছি তাহার বিচার করিও না, কেমন লিখিয়াছি তাই দেখ।" কিন্তু 'কি' ছাড়া কি 'কেমনের' বিচার হয়? আর, যে কোন উপায়ে শক্তির পরিচয় দিলেই কি আমরা শক্তিমান্‌কে প্রশংসা করিতে পারি? শারীরিক শক্তির প্রমাণ ত কত রকমেই দেওয়া যায়, কিন্তু সকল গুলিকেই আমরা ভাল মনে করি কি? অথচ, সাহিত্যে যে শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার বিচারের সময় কেন যে আমরা বক্তব্য বিষয়ের সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিব না, কেন যে আমরা শুধু ভাষা ও প্রকাশ-ভঙ্গির কথাই ভাবিব, তাহা বুঝা কঠিন। তথাপি, আমরা ইহা স্বীকার না করিয়া পারিতেছি না যে, বর্ত্তমানে অনেকেই সাহিত্য সমালোচনা অর্থে শুধু ভাষা ও তার অলঙ্কারের সমালোচনা মাত্র বুঝিতে চান।

এই ধারণার ফলে, বর্ত্তমানে ইউরোপে দেখিতে পাই, অনেক সাহিত্যিকই এমন সব বিষয় নির্ব্বাচিত করেন, যাহা বিষয় হিসাবে নিতান্তই হেয়। জর্ম্মাণ ঔপন্যাসিক স্যুডারম্যানের একখানা উপন্যাসের অনুবাদ প্রথম যখন বিলাতে প্রকাশিত করিবার চেষ্টা হয়, তখন পুলিশ একটু আপত্তি উত্থাপন করে। প্রকাশক জন্ লেন্ তখন একটা বেশ নূতন উপায় অবলম্বন করেন; তিনি প্রায় সমস্ত প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ও সাহিত্যিকদের নিকট গ্রন্থের এক এক খণ্ড পাঠাইয়া দিয়া তাঁহাদের মত চাহিয়া পাঠান। অনেকেই ইহাকে অশ্লীল মনে করেন বটে, কিন্তু অধিকাংশের মতেই ইহা প্রকাশ করায় কোন আপত্তির কারণ লক্ষিত হয় নাই। এই উপলক্ষ্যে বার্ণার্ড শ' যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতেই বইখানার রকম কতক বুঝা যাইবে। তিনি বলিয়াছিলেন "স্যুডারম্যান এই গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে সমাজের বিহিত মতে সচ্চরিত্র থাকার চেয়ে

অসচ্চরিত্র হওয়াই সুশ্রী বালিকাদের পক্ষে অধিক লাভ জনক।" অর্থাৎ গ্রন্থখানা আর কিছু নহে, একটী রমণীর পতন ও তাহার পতিত জীবনের ইতিহাসই ইহার বর্ণনীয় বিষয়। জন্ লেন্ এই সকল মত সম্বলিত করিয়া গ্রন্থখানা প্রকাশ করিয়াছেন; আমরা সকলেই সে জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি, কারণ, যাহারা জর্ম্মাণভাষা জানেন না তাঁহারাও এখন এমন অমূল্য সম্পদের রসাস্বাদে বঞ্চিত হইবেন না!

তথাপি বইখানি প্রশংসিত। স্যুডারম্যান নিজে ইহাকে তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহের অন্যতম মনে করেন। ইহার বর্ণনীয় বিষয় এত পরিচিত যে, যে কোন ব্যক্তি এরূপ দুই একটা কাহিনী বলিতে পারে। তবে যে ইহার প্রশংসা করা হয়, তাহার কারণ নাকি—ইহার শিল্প-চাতুর্য্য। বলা বাহুল্য, "ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতিতে" অঙ্কিত চিত্রের ন্যায় ইহার চাতুর্য্য সকলের চক্ষে ধরা দিবে কিনা সন্দেহ।

য়্যানাতোল্ ফ্রান্সও একজন বিখ্যাত এবং প্রশংসিত লেখক। ফরাসীদেশের বর্ত্তমান সাহিত্যিকদের মধ্যে বোধ হয় তাঁহাকেই আমরা বেশী চিনি। এবং তাঁহারও প্রশংসার কারণ বোধ হয় এই শিল্প-চাতুর্য্য। কিন্তু এই শিল্প-চাতুর্য্যের একটা বিশিষ্টতা আমাদের চোখে বড় লাগিয়াছে, তাহারই কথা এখানে বলিতে চাই।

'ফচ্‌কিমি' বলিলে বোধ হয় একটু কঠোর ভাষা প্রয়োগ করা হয়, কিন্তু ফরাসী লেখকেরা অনেক সময় অতি গুরু বিষয় নিয়াও এমন হাসি ঠাট্টা করিতে পারেন যে, ভাবিলে মনে হয়, তাঁহারা যেন কেবল বড় ঘরের মেয়েদের আলস্যের হাই নিবারণ করিবার জন্যই বই লেখেন। ভল্‌তেয়ার ঠাট্টা করেন নাই, এমন জিনিস বোধ হয় দুনিয়াতে নাই। তথাপি ভল্‌তেয়ারকে আমরা প্রশংসা করি, কারণ তাঁহার সংস্কারের উদ্দেশ্য স্পষ্ট; শুধু ইয়ারকি করাই তাঁর উদ্দেশ্য নহে।

তখনকার দিনে প্রচলিত কদাচারের উপর তিনি যে তীব্র কশাঘাত করিয়াছেন, সে কথা ইতিহাস অনেক কাল মনে রাখিবে। য়্যানাতোল্ ফ্রান্সের সেরূপ উদ্দেশ্য নাই, একথা সাহস করিয়া বলিতে পারি না, কিন্তু তাহা তত স্পষ্ট কিনা সন্দেহ।

আর তিনি স্থানে অস্থানে অনাবশ্যক অশ্লীল চিত্র যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপেও অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার রুচির প্রশংসা করিতে আমাদের মোটেই ইচ্ছা হয় না। 'ফেরেস্তাদের বিদ্রোহ' (The Revolt of the Angels) নামক গ্রন্থে বোধ হয় তাঁহার বক্তব্য বিষয় এই যে, নূতন দর্শন-বিজ্ঞানের আলোক পাইয়া মানুষ পুরাতন সরল বিশ্বাস সমূহ হারাইতে বসিয়াছে; এবং ফলে অপকর্ম্ম করিতে মানুষ এখন আর ধর্ম্মের বাধা আগেকার মত অনুভব করে না। এই গ্রন্থে মরিস্ নামক এক যুবক একটী বিবাহিত রমণীর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন; উভয়ের মিলনের একটী নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে; এবং নির্দ্দিষ্ট দিনে সেখানে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়।

মনে হয়, ইহার বেশী না বলিলে তাঁহার মূল বক্তব্যের কোনই হানি হইত না। তথাপি একাধিক বার এই সকল মিলনের গূঢ় ব্যাপারের বর্ণনায় তিনি 'রায় গুণাকর'-কেও যে কেন অতিক্রম করিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন, এই সকল বর্ণনায় ঘটনা সংস্থান ফুটিয়া উঠিতেছে। কিন্তু ইহা অপেক্ষা একটু কম বলিলে দোষ হইত কি?

'দেবগণ পিপাসু' (The Gods are Athirst.) নামক গ্রন্থ অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বিদ্রোহ নিয়া। উপন্যাসের আকারে তখনকার সামাজিক অবস্থা তিনি আঁকিতে চাহিয়াছেন। এমন একটা সময়ে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ-বন্ধন যে অত্যন্ত শিথিল হইয়া যায়, তাহা বলাই বাহুল্য;

বিশেষতঃ তার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদের সময় হইতেই ফরাসী সমাজে পাপের স্রোত বহিতে আরম্ভ হইয়াছিল। সুতরাং এমন একটা সময়ের চিত্র আঁকিতে যাইয়া য়্যানাতোল দুই একটা পাপের চিত্র আঁকিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু তাহার কয়েক বৎসর পরই নেপোলিয়নের দিগ্বিজয় আরম্ভ হয়; এবং নেপোলিয়নের সঙ্গে সংঘর্ষে রুষিয়া পরাজিত ও লাঞ্ছিত হয়; রুষিয়ার এই পরাজয়ের কারণ খুঁজিতে গিয়া টলষ্টয় দ্বিসহস্রাধিক পৃষ্ঠার এক উপন্যাসে তখনকার রুষিয়ার সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন; এবং অনেক অনাচার, অনেক ভোগবিলাসের বর্ণনাও তিনি করিয়াছেন। কিন্তু য়্যানাতোল ফ্রান্সের চিত্রের মত রং ফলাইবার চেষ্টা ত টলষ্টয়ে নাই।

একটা জাতি ধর্ম্মে, সমাজে, রাষ্ট্রে স্বাধীনতার জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছে, এরূপ চিত্র য়্যানাতোল ফ্রান্সের বই খানায় মিলে না; সেখানে মিলে, কোনও একটি যুবতী কেমন করিয়া একটী যুবকের মন ভুলাইতে চেষ্টা করিয়াছিল; এবং যুবতীরই নিরপরাধ পিতার ফাঁসির ব্যবস্থা দিয়া যুবক যখন তাহার নিকট আসিল, তখন যুবতী তাহাকে পিতৃ-হন্তা বলিয়া ঘৃণা না করিয়া বরং কেমন সাদরে আলিঙ্গন করিয়াছিল; আর মিলে কেমন করিয়া একটী প্রেমিকা তাহার দয়িতকে আইনের কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য গোপনে বিচারকের বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিল, এবং কেমন অম্লান বদনে কিছুক্ষণের জন্য বিচারকটীর চরণে স্বদেহ উপঢৌকন দিয়াছিল, আর কেমন করিয়া এমন দান গ্রহণ করিয়াও বিচারক বিচারে কিছুমাত্র দয়া প্রকাশ করিতে রাজী হয় নাই।

আর দৃষ্টান্তের কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। শুনিতে পাই এ সব গ্রন্থে খুব শিল্প-চাতুর্য্য রহিয়াছে। তা কি আর নাই? তা না হইলে আসর জমিবে কেন? বইয়ের কাটতিই বা হইবে কেন?

কিন্তু এমন শিল্প এদেশেরও যে কোন কোন বাজারে মিলে দেখিতেছি।

কোথায় ইউরোপের একজন প্রসিদ্ধ লেখক য়্যানাতোল ফ্রান্স, আর কোথায় অন্ধ এশিয়ার, ততোঽধিক অজ্ঞ ভারতের এক কোণে বসিয়া আমরা তাঁহার সমালোচনা করিতেছি। আমাদের কথা ত তাঁহার লক্ষ লক্ষ পাঠকদের একজনের কাণেও পৌঁছিবে না! তাহা জানি; কিন্তু আমরা য়্যানাতোল ফ্রান্সের জন্য লিখিতেছি না; তাঁহার পাঠকদের জন্যও লিখিতেছি না; এ দেশে যাঁহারা তাঁহার অনুকারী হইতে ইচ্ছুক, তাঁহাদেরই নিকট আমাদের এই নিবেদন—পশ্চিমের রঙ্গীন আলোকে মাতিয়া উঠা কিছু নয়; ইহা যে উষার নবীন জাগরণের চিহ্ন নহে; ইহা যে উত্থানের উৎসাহ-দীপ্তি নহে; ইহা ঝড়ের চিহ্ন; কিংবা ভোগক্লান্ত জীবনের হয়রাণির লক্ষণ।

বার্ণাড´ শ'।

আমার বন্ধুকে আমি চিনি এবং তাহার চরিত্র আমি জানি, এ কথা বলিলে কেহই আমাকে ভ্রান্ত কহিবে না। অথচ তাই বলিয়া অন্য সব লোকের সঙ্গে তিনি যে সব কথা বার্ত্তা বলেন কিংবা পত্র ব্যবহার করেন, কিংবা তাহার যে চিন্তা ও অনুভূতি অপ্রকাশিত থাকে, অথবা জীবন ভরিয়া তিনি যে সব কাজ করেন, তাহার সমস্তই আমাকে জানিতে হইবে এমন নয়। নাটকে নাট্যকার যে সব চরিত্র চিত্রণ করেন তাহাদের জীবনের সমস্ত ঘটনাই কখনও বিবৃত হয় না। দুষ্যন্ত বা শকুন্তলা, ওথেলো বা ডেস্‌ডিমোনা প্রভৃতির মুখে কবি যে সব কথা দিয়াছেন এবং তাঁহাদের জীবনের যে সকল ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন—যে কোন বাস্তব জীবনে তার চেয়ে বেশী কথা কথিত হয় এবং বেশী ঘটনা ঘটিয়া

থাকে; তথাপি ইহাদের চরিত্র কেমন ধরণের ছিল—কবির কল্পনায় ইঁহারা কি প্রকারের মানুষ, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। কোনও ব্যক্তির সম্বন্ধে একটা ধারণা করিতে হইলে সে কখন কি বলে এবং কি করে, তাহাই আমাদের লক্ষ্য করিতে হয় বটে; কিন্তু তাই বলিয়া তাহার জীবনের শেষ কথাটী পর্য্যন্ত শুনিবার জন্য কিংবা শেষ ঘটনাটী দেখিবার জন্য আমরা অপেক্ষা করি না; ইহার পূর্ব্বেই যে তাহার চরিত্র আমরা বুঝিতে পারি, একথা কেহ অস্বীকার করিবেন না। কাহারও সব কথা না শুনিয়াও, তাহার মত কি, তাহার চরিত্র কিরূপ তাহা জানা যাইতে পারে।

তেমনই কোনও গায়কের সব গান না শুনিয়াও সে কিরূপ গায়ক, তাহা আমরা জানিতে পারি; কোনও কবির সব কবিতা না পড়িয়াও তাহার কবিত্বের পরিচয় আমরা লাভ করিয়া থাকি; এবং কোনও এক গ্রন্থকারের সব কয়খানি গ্রন্থ না পড়িলে তাহার সহিত পরিচিত হওয়া যায় না, এ কথাও সত্য নহে। সুতরাং আমি বলিতে কিছু মাত্র লজ্জিত নই যে বার্ণার্ড শ'র সব কয়খানি বই আমার এখনও পড়া হয় নাই; তিনি এখনও জীবিত,—ভবিষ্যতে তিনি যাহা লিখিবেন, শুধু তাই যে আমি পড়ি নাই, তাহা নহে; এ পর্য্যন্ত তিনি যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহারও সব আমার পঠিত নহে। তথাপি, কেহ ধৃষ্টতা মনে করিবেন কি না জানি না—বার্ণার্ড শ' আমার পরিচিত, এ কথা বলিতে আমি সাহস করি।

বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ সাহিত্যের অধ্যাপনা যে ভাবে চলে তাহাতে কোনও কবির সম্বন্ধে স্বাধীন ভাবে মত গঠন করিবার সুবিধা ছাত্রকে বড় দেওয়া হয় না। চাকুরীর উমেদারের সহিত পরিচিত হইয়া তাহার চরিত্র সম্বন্ধে একটা মত গঠন করিবার অবকাশ পাইবার পূর্ব্বেই, মনীবকে

বাহির হইতে তৃতীয় এক জন যেমন বলিয়া দেয় যে, এই উমেদার এইরূপ, গ্রন্থ পাঠ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই তেমনই কোনও এক ভক্ত সমালোচকের মত শুনিয়া ছাত্রকে জানিতে হয়, এই লেখক এই ধরণের; পরে, স্বাধীন ভাবে নিজের একটা মত হইবার পূর্ব্বেই পরীক্ষাগারের অগ্নি সাক্ষী করিয়া তাহাকে বলিয়া আসিতে হয়, 'এই কবিকে আমি এইরূপ মনে করি'; এবং যাহার সাহিত্য চর্চ্চা এই খানেই শেষ হয়, কোনও এক লেখকের সম্বন্ধে তাহার নিজের অনুভূতি যে কি তাহা সে কখনও জানিতে পারে না। আমার পরিচিত কাহারও সম্বন্ধে অন্যে কি মনে করে, তাহা না জানিয়াও আমি নিজে একটা স্বতন্ত্র মত পোষণ করিতে পারি, এবং সে মতের যে কোন মূল্য নাই, এরূপও নহে। বরং আমার কাছে সে মতই অধিক সত্য; কারণ, ইহা পরের মুখে আস্বাদন করা নয়।

স্বয়ং পরিচিত হইবার পূর্ব্বেই কোনও এক লেখকের সম্বন্ধে অন্যের একটা মত যে আমরা গলাধঃকরণ করি, তাহা বোধ হয় ভুল; এবং বিদেশী গ্রন্থকারদের বিদেশী সমালোচনা সর্ব্বাগ্রে কণ্ঠস্থ করিয়া নেওয়া আরও ভুল; কারণ, জীবন এবং জীবনের এক অভিব্যক্তি সাহিত্য—এ উভয়কে দেখিবার প্রণালী এক এক দেশে এক এক রূপ। সেক্সপীয়র মিল্‌টনের চূড়ান্ত সমালোচনা ইংলণ্ডে হইয়া গিয়াছে; এদেশে তাহার পুনরাবৃত্তি ভিন্ন আর কিছু বলিতে কেহ সাহস পান না। কিন্তু নাম না বলিয়া এবং গৃহীত সমালোচকদের মত গোপন রাখিয়া যদি ইহাদেরই কোন কল্পনাকে এদেশের বলিয়া কেহ চালাইতে চেষ্টা করিত, তাহা হইলে, যাহারা বিলাতী সমালোচনা না পড়িয়াছে তাহারা যে ঠিক ঐরূপ সমালোচনাই করিত, এরূপ বলিতে ভরসা হয় না। সুতরাং কোনও এক সাহিত্যিকের লেখার সহিত পরিচিত হইতে হইলে অন্যের

কৃত সমালোচনা সর্ব্বাগ্রে জানিয়া লইতে হইবে, এমন নহে; বরং পূর্ব্ব হইতে একটী মত ধারণ করিয়া লওয়া স্বাধীন বিচারের অন্তরায়।

বিশেষতঃ, বার্ণার্ড শ' এখনও ইংরেজী সাহিত্যে সেক্সপীয়র মিলটনের মত একটা অবিসংবাদিত স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই। তিনি যশস্বী সন্দেহ নাই;—পৃথিবীতে যাহারা সাহিত্য আলোচনা করে তাহারাই তাঁহাকে চিনে; কিন্তু তথাপি তাঁহার সম্বন্ধে সমালোচকেরা এখনও একমত হইতে পারেন নাই; শুধু তাই নয়, তিনি যে সাহিত্যে চিরকালের জন্য একটা আসন পাওয়ার যোগ্য, এ কথাও এখন পর্য্যন্ত সর্ব্বসম্মতিক্রমে, এমন কি অধিকাংশের মতেও, স্বীকৃত হয় নাই। শিক্ষার কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার গ্রন্থের অধ্যাপনা হয় না; এমন কি, তাঁহার গ্রন্থের অধ্যয়নও অনেকে নিষিদ্ধ মনে করেন, এবং অনেক বিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে তাঁহার প্রবেশ-নিষেধ রহিয়াছে। * হাজার প্রসিদ্ধ হইলেও এমন গ্রন্থকারের কোন নিরপেক্ষ সমালোচনা পাওয়া যায় না। সুতরাং বার্ণার্ড শ' সম্বন্ধে অন্যের মত সংগ্রহ করিয়া পরে নিজের মত গঠন করিব, এরূপ চেষ্টাও আমরা করিতে পারি না। বার্ণার্ড শ' নাট্যকার; লণ্ডনের একাধিক রঙ্গমঞ্চে তাঁহার নাটকের অভিনয় হয়, এবং বহু সহস্র লোকে তাহা দর্শন করে; কিন্তু তথাপি সাহিত্য হিসাবে, সেক্সপীয়র মিল্টনের মত, তাঁহার লেখার পঠন, পাঠন ও সমালোচন এখনও আরম্ভ হয় নাই।

আর একটা কথা। নাট্যকারের সমালোচনায় সাধারণতঃ চরিত্র চিত্রণে ও ঘটনাবলী সন্নিবেশে তাঁহার কৌশলের দিকেই দৃষ্টি রাখা হয় বেশী। কারণ, সাধারণতঃ এই সব কৌশল দ্বারা দর্শকের চিত্তবিনোদন

* পাঠক এই প্রবন্ধ রচনার তারিখটী মনে করিবেন। এখন আর এই মন্তব্য সম্পূর্ণ সত্য নহে।

করা ছাড়া নাট্যকারের—কিংবা আরও সাধারণ ভাবে, কবির, অন্য কোন স্পষ্ট উদ্দেশ্য থাকে না। "কাব্যং যশসেঽর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে। সদ্যঃ পরনির্বৃতয়ে কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে"—ইত্যাদি কাব্যের বহু গুণ অলঙ্কারশাস্ত্রে কথিত থাকিলেও ইহাদের বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করিলে এই দাঁড়াইবে যে কাব্য পাঠে আনন্দ ও লোকব্যবহার সম্বন্ধে উপদেশ লাভ হইয়া থাকে; এবং কাব্যের আদর হইলে কাব্যলেখকের অর্থলাভও হইয়া থাকে। তা' ছাড়া,—ময়ূর-নামক কবির সূর্য্যশতক লেখার ফলে কুষ্ঠনাশ ছাড়া অন্য কোন 'শিবেতর-ক্ষতি' কাব্য-পাঠে কখনও হইয়াছে কি না ভগবান্ জানেন। কালিদাস ভবভূতি কিংবা সেক্সপীয়র মিল্‌টন যে মোক্ষোপায় নির্দ্দেশ করিবার জন্য কাব্য লেখেন নাই, ইহা ঠিক। ধর্ম্ম, সমাজ, বা রাষ্ট্র সম্বন্ধে কোনও একটা বিশিষ্ট মত প্রকাশের জন্যও তাঁহারা কাব্যের আশ্রয় নেন নাই। অবশ্যই ধর্ম্ম বা সমাজ সম্বন্ধে ইঁহাদের একটা মত ছিল; তাঁহাদের লেখায় তার পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু ঐ মত প্রচার করাই ইঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক বা সাধারণ জীবনের কোন কাহিনীকে দৃশ্য বা শ্রব্য কাব্যের আকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া সাধারণের চিত্তবিনোদনই ইঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ইঁহাদের কাব্য 'রসাত্মকং বাকং';—'কালপ্রিয়নাথের যাত্রা প্রসঙ্গে' ই হউক কিংবা বসন্তোৎসবেই হউক কিংবা অন্য কোন স্থলেই হউক, পরিষদের বিনোদনই,—শুধু দৃশ্য কাব্যের নয়, শ্রব্য কাব্যেরও মূল উদ্দেশ্য, এবং কেবল ভারতে নয়, ভারতের বাহিরেও ইহা সত্য। সেক্সপীয়রের একজন প্রসিদ্ধ সমালোচক ডাউডেন (Dowden) বলেন, সেক্‌স্‌পীয়র কোনও মত কিংবা তাহার ব্যাখ্যা কিংবা ভগবানের স্বপ্রকাশের কোনও বৃত্তান্ত জগতে প্রচার করেন নাই।

কিন্তু ইব্‌সেন বা বার্ণার্ড শ প্রভৃতি সেই ধরণের নাট্যকার নহেন। শুধু শিল্প-কৌশল দেখানই ইঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য নহে, এবং শুধু কাব্যসৃষ্টিই ইঁহাদের প্রসিদ্ধির একমাত্র কারণ নহে। সমাজে ও রাষ্ট্রে ধর্ম্ম ও নীতির গৃহীত পদ্ধতির বিরুদ্ধে একটা প্রবল প্রতিবাদ ইঁহাদের লেখার আত্মা; এবং লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য একটা প্রচণ্ড উত্তেজনা ইঁহাদের লেখায় শক্তির সঞ্চার করিয়া দিতেছে। রঙ্গমঞ্চে অভিনেয় নাটক ইঁহাদের এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির উপায়মাত্র। ধর্ম্ম বা নীতি সম্বন্ধে যাঁহাদের কিছু প্রচার করিবার থাকে, তাঁহারা নানা উপায়ে তাহা করিতে পারেন; সংবাদ-পত্রের স্তম্ভ, বাগ্মীর মঞ্চ, কিংবা প্রচারকের বেদী, কিংবা গ্রন্থ-প্রকাশ—এ সমস্ত উপায়েই লোকে নিজের প্রচার্য্য মত জ্ঞাপন করিতে পারে। কিন্তু অধুনা রঙ্গমঞ্চও তার মধ্যে একটী প্রধান উপায়।

ইউরোপের বর্ত্তমান নাট্য-সাহিত্য প্রাচীন নাট্যসাহিত্য হইতে কিসে পৃথক্, ম্যাটারলিঙ্ক্ একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে দৃশ্য ঘটনাবলীর চমক আধুনিক নাটকে আস্তে আস্তে কমিয়া আসিয়াছে; এবং, মানব-হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশে প্রবেশ করিবার, এবং সর্ব্বাগ্রে নৈতিক সমস্যার স্থান দিবার ইচ্ছা আধুনিক নাট্য-সাহিত্যে অত্যন্ত স্পষ্ট। শুধু তাই নয়; মানুষ আগে সাহিত্যে যাহা সুন্দর মনে করিত তাহা পরিত্যাগ করিয়া একটা নূতন সৌন্দর্য্য—একটা অধিকতর বাস্তব সৌন্দর্য্যের অনুসন্ধান পড়িয়া গিয়াছে। "ইহা নিশ্চিত যে, রঙ্গমঞ্চে এখন আর আগের মত অদ্ভুত বীর-রসাত্মক কর্ম্মের অভিনয় তত হয় না"। রঙ্গমঞ্চে রক্তারক্তি এখন অনেক কম হয়; শারীরিক শৌর্য্য এখন অনেকটা মৃদু হইয়াছে; এবং যদিও যেমন বাহিরে তেমনই রঙ্গমঞ্চেও এখনও লোক মরে, তথাপি মৃত্যুকে এখন

আর দৃশ্য কাব্যের অত্যাবশ্যক অঙ্গ মনে করা হয় না। কারণ, দুই চারটা আত্মহত্যার কথা বাদ দিলে, মৃত্যুকে এখন আর লোকে জীবনের সকল বিপদ্ হইতে নিষ্কৃতির একমাত্র পন্থা মনে করে না; এবং মানব-মনের এই পরিবর্ত্তন শীঘ্র হউক, বিলম্বে হউক, রঙ্গমঞ্চও স্বীকার না করিয়া পারে না।

ইটালী, স্কাণ্ডিনেভিয়া কিংবা স্পেন দেশের প্রাচীন কাহিনী, অথবা পরীর গল্পের মত প্রাচীন কল্পনার কাহিনী, শুধু সেক্সপীয়রের যুগের নয়, পরবর্ত্তী ফরাসী ও জার্ম্মেণ কল্পনা-প্রধান সাহিত্যের (Romanticism) অন্তর্ভুক্ত নাট্যাবলীর ঘটনা যোগাইত; কিন্তু এখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, আধুনিক নাট্যের মূল ঘটনা এ সব হইতে আর তেমন গ্রহণ করা হয় না। "আমাদের সময়ের কোন যুবক যদি প্রেমে পড়ে, এবং রোমিওর প্রেম যেমন তাহার সমসাময়িক অবস্থার অনুযায়ী সহস্র বিঘ্ন দ্বারা প্রতিহত হইয়াছিল, ইহার প্রেমও যদি তেমনই বর্ত্তমান সমাজে যাহা হইতে পারে এমন সহস্র বাধায় আক্রান্ত হয়, তাহা হইলেও ইহা নিশ্চয় যে রোমিও-জুলিয়েটের প্রেমকাহিনী যে সব অদ্ভুত ঘটনা—যে সব কবিকল্পনায় অলঙ্কৃত হইয়াছে, আধুনিক রঙ্গমঞ্চে তাহার দর্শন পাইব না"। "সুদৃশ্য রাজপথে সেই কলহ, সেই রক্তপাত, সেই অজ্ঞেয় হলাহল, সেই গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, প্রিয়চিকীর্ষু সমাধিস্থান—এ সকলকে আমরা আর ফিরিয়া পাইব না"। যাঁহারা এখনও প্রাচীন নাটকের অনুকরণ করেন—যাঁহারা এখনও প্রাচীনের বন্ধন ছেদন করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আধুনিক যে সকল নাটক, "তাহার ঘটনা-স্থল আধুনিক গৃহ, এবং পাত্রপাত্রী আধুনিক নরনারী"। আজ নাটকে "একটী ক্ষুদ্র গৃহে, টেবিলটীর চারিদিকে আগুনটীর নিকটে মানবের সুখদুঃখের নিষ্পত্তি হইয়া যায়।"

অবশ্যই ইহা ঠিক যে, এখনও নাটকে প্রেম, ঘৃণা, দুরাশা, ঈর্ষা, হিংসা, লোভ, এবং দয়া, দাক্ষিণ্য, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা প্রভৃতির ক্রিয়া দেখা যায়; এবং ইহাও ঠিক যে, নাটকে চিরকালই বিবিধ ক্রিয়া ও বিচিত্র ঘটনার প্রাধান্য থাকিবে। কিন্তু এই ঘটনার, এই ক্রিয়ার উৎপত্তি কোথা হইতে? লালসার সঙ্গে কর্ত্তব্যের যেখানে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, সেইখানেই মানুষের চিত্তে এই সকল বিচিত্র ঘটনার বীজ উৎপন্ন হয়। ম্যাটারলিঙ্ক্ মনে করেন, "এই জন্যই আধুনিক নাট্যকারদিগের চিত্ত অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সমসাময়িক নৈতিক সমস্যার দিকে ধাবিত; এমন কি, তাঁহারা কেবল এই সমস্ত সমস্যারই আলোচনা করেন, ইহা বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।"।

আলেক্জান্দার ডুমা-র নাট্যাবলীই এই নূতন পথের প্রবর্ত্তক। তিনি এমন সব নৈতিক সমস্যা রঙ্গমঞ্চে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন যাহা দর্শকের মনে কদাচিৎ উঠে; কারণ, ইহাদের সমাধান মোটেই কঠিন নহে। 'ন মানিনী সংসহতেঽন্যসঙ্গমম্';—মানিনীর পক্ষে কি ইহা উচিত? কিংবা পত্নী যদি তেমনই দোষে দুষ্ট হয়, পতির কি তাহাকে ক্ষমা করা উচিত-নহে? জারজ সন্তানের কি কোন অধিকার আছে? প্রেমের জন্য বিবাহ ভাল, না টাকার জন্য বিবাহ ভাল? ম্যাটারলিঙ্কের মতে, "ফরাসী দেশের আধুনিক সমগ্র নাট্য সাহিত্য এবং ফরাসী দেশের বাহিরে ফরাসী সাহিত্যেরই প্রতিধ্বনি যে সব সাহিত্য—তাহাদের একমাত্র উপাদান এই সব প্রশ্ন, এবং ইহাদের অনাবশ্যক উত্তর"।

ইহাই ম্যাটারলিঙ্কের মত হইলেও তিনি স্বীকার না করিয়া পারেন নাই যে, ব্যুয়র্ণসন্, ইবসেন্ প্রভৃতির নাট্যে ইহার চেয়ে গভীর প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। যে সব নাট্যকার এই সকল প্রশ্ন উত্থাপন

করিয়াছেন, স্বীকার করিতে হইবে বার্ণার্ড শ' তাঁহাদের অন্যতম। ইঙ্গিতে এ সকল প্রশ্নের যে উত্তর তাঁহারা দিয়াছেন, তাহা কখনও পৃথিবীতে গৃহীত হইবে কিনা জানি না; কিন্তু যে প্রশ্ন উঠিয়াছে, এ দেশে পর্য্যন্ত তাহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই; সুতরাং তাহার সহিত পরিচয় আমাদের অসঙ্গত নহে।

সুতরাং বার্ণার্ড শ'র সমালোচনায় আমরা তাঁহার নাট্য-কৌশলের প্রতি দৃষ্টি করিব না; তিনি যে সব অভিনব প্রশ্ন উথাপন করিয়াছেন,—যে সব অদ্ভুত মত প্রচার করিয়াছেন, সেগুলির সহিত পরিচিত হইলেই যথেষ্ট মনে করিব। এইখানে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, বার্ণার্ড শ' শুধু নাট্যকার নহেন, প্রবন্ধ ও সমালোচনায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত; এমন কি, তাঁহার নিজের গ্রন্থের সমালোচনাও তিনি নিজে করিয়াছেন, এবং প্রায়ই গ্রন্থের প্রথম মুখবন্ধে প্রতিপাদ্য বিষয়ের একটা বিশদ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তথাপি, নাট্যকার হিসাবেই তাঁহার প্রসিদ্ধি বেশী; এবং নাটকের প্রচারিত অভিনব মতই তাঁহার সুনাম-দুর্নামের কারণ। আর, ইহাও আমাদের মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, যদিও ছাপায় আমরা তাঁহার সব নাটকই পাই, তথাপি সব নাটক রঙ্গালয়ে অভিনীত হইতে পারে নাই। কারণ, বিলাতে একজন রাজকর্ম্মচারী অনুমতি না দিলে কোনও নাটক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতে পারে না। পাছে ধর্ম্ম বা সমাজের বিরুদ্ধে কোন কথা প্রচারিত হয়, এই জন্যই এই নিয়ম। বার্ণার্ড শ'র সব নাটক যে এই অনুমতি পায় নাই, ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, তিনি এমন সব মত প্রচার করিতে চান, এমন সব দৃশ্য অভিনীত দেখিতে চান, যাহা বিলাতী সমাজও সহ্য করিতে পারে না। অবশ্যই, যাহারা এই অনুমতি দেয় না, বার্ণার্ড শ' তাহাদিগকে জড়বুদ্ধি, অজ্ঞ প্রভৃতি বিশেষণে আপ্যায়িত না করিয়া

ছাড়েন নাই ; এবং তাঁহার মত উন্নত বলিয়াই যে ইহাদের বুদ্ধির অনধিগম্য, অত্যন্ত দম্ভ-সহকারে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।

তিনি অনেক জায়গায়ই নিজের ও নিজের মতের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বিলাতে রঙ্গমঞ্চে নাটক অভিনীত হইবার অনুমতি যিনি দেন, তাঁহার ক্রিয়াকলাপ ও উপযোগিতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য গত ১৯০৯ সনে পার্লেমেণ্টের এক কমিটী বসে। ঐ কমিটীতে সাক্ষ্য দিবার সময় বার্ণার্ড শ' বলিয়াছিলেন ;—"আমার পেশা রঙ্গালয়ের জন্য নাটক লেখা। আমি ১৮৯২ সন হইতে এই কাজ করিয়া আসিতেছি। গ্রন্থকার-পরিষদের কার্য্যকরী সমিতির আমি একজন সভ্য এবং ঐ পরিষদেরই নাট্যবিভাগেও আমার নাম আছে। আমি উনিশখানা নাটক লিখিয়াছি ; এবং ইহাদের কয়েকখানি তুরস্ক, গ্রীস ও পর্ত্তুগাল ছাড়া ইউরোপের অন্যান্য সকল দেশেই অনুদিত ও অভিনীত হইয়াছে। আমেরিকায় ইহাদের অত্যন্ত আদর। ইহাদের তিনখানা এ দেশে (বিলাতে) অভিনীত হইবার অনুমতি পায় নাই ; একখানা পরে পাইয়াছিল, কিন্তু বাকী দুইখানা এখনও অনুমতি পায় নাই। ইংলণ্ডের বাহিরে এক অষ্ট্রীয়াতে আমার একখানা নাটক অভিনয়ের অনুমতি পায় নাই। অন্য কোথাও এরূপ বাধা দেওয়া হয় নাই। আমেরিকাতেও একখানা নাটক প্রথম অভিনয়ের অনুমতি পায় নাই, কিন্তু পরে পাইয়াছিল।"

"আমি নাট্যকারদের সাধারণ ব্যবসায়ে নিযুক্ত একজন সামান্য নাট্যকার মাত্র নহি। 'I am a specialist in immoral and heretical plays'—গৃহীত নীতি ও ধর্ম্মের বিরুদ্ধে নাটক লেখাই আমার বিশেষত্ব। সর্ব্বসাধারণকে তাহাদের গৃহীত চরিত্রনীতির কথা ভাবিতে বাধ্য করি বলিয়াই আমার নাম। বিশেষ করিয়া কহিতে হইলে

বলিব যে, আর্থিক ও যৌন সম্বন্ধ বিষয়ে সাধারণের অনেক মতকেই আমি ভ্রান্ত মনে করি; এবং বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে গৃহীত খ্রীষ্টান ধর্ম্মের কোন কোন মতকে আমি ঘৃণা করি। লোকে এই সমস্ত বিষয়ে আমার মত গ্রহণ করুক, এই স্পষ্ট উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়াই আমি নাটক লিখি।”

অন্যত্র তিনি কহিতেছেন, “I had no taste for what is called popular art, no respect for popular morality, no belief in popular religion, no admiration for popular heroics.”—সর্ব্বসাধারণে যাহাকে কলা-শিল্প কহে তাহাতে আমার রুচি ছিল না, সাধারণে গৃহীত নীতিকে আমি শ্রদ্ধা করি নাই, সাধারণের ধর্ম্মে আমার বিশ্বাস ছিল না, সাধারণে যাহাকে বীর রস কহে তাহাকে আমি প্রশংসা করি নাই।

করুণা-প্রবণ চিত্ত বলিয়া, যুদ্ধেই হউক, ক্রীড়ায়ই হউক, আর কসাইখানায়ই হউক, বল-প্রয়োগ ও হত্যাকে আমি ঘৃণা করি। আমি সাম্যবাদী (socialist); আমাদের সমাজে অর্থের জন্য যে অসংযত, গৃধ্রবৎ কাড়াকাড়ি দেখিতে পাই, তাহাকে আমি ঘৃণা করি, এবং সর্ব্ববিধ সাম্যকেই আমি সমাজ-বন্ধন, শিক্ষা, সদাচার প্রভৃতির একমাত্র স্থায়ী ভিত্তি মনে করি।···সাধারণ মানুষে জীবনকে যে ভাবে দেখে আমি তাহা হইতে পৃথক ভাবে দেখি···।”

প্রথম বয়সে (“in my nonage’) বার্ণার্ড শ’ উপন্যাস লিখিতে চেষ্টা করেন এবং পাঁচখানা উপন্যাস লিখিয়াও ছিলেন। কিন্তু যদিও উপন্যাসগুলি পরে ছাপা হইয়াছিল, তথাপি ইহাতে তাঁহার তেমন নাম হয় নাই। তিনি মনে করেন, তাঁহার এই অকৃতকার্য্যতার কারণ, তাঁহার দৃষ্টি সাধারণের দৃষ্টি হইতে পৃথক। তিনি বলেন, ‘আমি যদি

কর্ম্মপটু সাধারণ অর্থলিপ্সু ইংরেজের মত হইতাম, তাহা হইলে বিষয়টী সহজ হইত; শতকরা নব্বই জন ভবিষ্যৎ পুস্তক-ক্রেতা যে দৃষ্টিতে দেখে, আমার স্বাভাবিক দৃষ্টিকে বিকৃত করিয়া একটা মানস চশমার ভিতর দিয়া আমিও সেই দৃষ্টিতে দেখিতে শিখিতাম। কিন্তু আমি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে এতই অভিমানী ছিলাম, নিজের এই অস্বাভাবিক দৃষ্টিকে এতই প্রশংসা করিতাম যে, এই ভণ্ডামি গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি আমার হয় নাই।"

"It was as Punch then that I emerged from obscurity."—তিক্ত-রসিক সমালোচক হিসাবেই অতঃপর আমি জনসমাজে পরিচিত হইতে আরম্ভ করি। একটী প্রসিদ্ধ পত্রিকার প্রধান স্থানটীই আমার জন্য আলাদা করিয়া রাখা হইতে লাগিল; এবং প্রতি সপ্তাহে তাহাতে আমি পৃথিবীর রাজধানী লণ্ডনের রঙ্গমঞ্চ, তাহার কন্‌সার্ট, ও অপেরার সমালোচনা করিতে লাগিলাম। আর "উচ্চশ্রেণীর লোকেরা আদরের সহিত আমার প্রবন্ধ পড়িত; সাধারণ লোকে ধীরভাবে আমার বক্তৃতা শুনিত"।

কিন্তু প্রথম যেখানে প্রতি সপ্তাহেই নূতন কথা থাকিত, ক্রমে, সেখানে পুরাতন কথারই পুনরুক্তি চলিতে লাগিল। প্রথম যাহা হাস্যপরিহাস মাত্র ছিল, ক্রমে তাহাই গম্ভীর ভাব ধারণ করিতে লাগিল। কিন্তু ইতিমধ্যেই বার্ণার্ড শ'র প্রসিদ্ধি লাভ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার প্রথম বয়সের উপন্যাসগুলি কোন প্রকাশক আগে প্রকাশ করিতে সম্মত হন নাই, "but now I listened to the voice of the publisher for the first time"—"কিন্তু এতদিনে প্রকাশকের আহ্বান আমি শুনিতে পাইলাম।" কিন্তু কি প্রকাশিত হইবে? সংবাদপত্রের সেই পুরাতন প্রবন্ধগুলি? না, নাটক!

অতঃপর তিনি কিরূপে নাট্যকারে পরিণত হন, বার্ণার্ড শ'র নিজের মুখেই আমরা তাহার বৃত্তান্ত পাই। উচ্চ জ্ঞান ও কলা-শিল্পের মর্য্যাদা বুঝে এমন লোকের উপযুক্ত একটী রঙ্গালয় লণ্ডনে ছিল না। বার্ণার্ড শ' নিজে যে নাটক ভালবাসেন এ কথা বলা অনাবশ্যক; তিনি অভিনয়ও করিতে পারেন। সুতরাং রঙ্গালয়ের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ স্বাভাবিক। এই সময়ে একটী নূতন ধরণের রঙ্গালয় স্থাপনের প্রস্তাব চলিতেছিল। কিন্তু এই নূতন পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের জন্য খুব উচ্চ ধরণের দুই একখানি নাটকের প্রয়োজন ছিল; এবং ইব্‌সেনের নাটক না হইলে এই 'নূতন রঙ্গালয়ের' প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইত না।

১৮৮৯ সনে সর্ব্বপ্রথম ইব্‌সেনের 'পুতুলের ঘর' নামক নাটক লণ্ডনে অভিনীত হয়, এবং ঠিক এই সময়েই অন্য একটী রঙ্গালয়ে ইব্‌সেনের 'প্রেতাত্মা (Ghosts) নামক নাটকও অভিনীত হয়। কিন্তু তথাপি কোনও ইংরেজ গ্রন্থকার এই নূতন ধরণের কোনও নাটক তখন পর্য্যন্ত লিখেন নাই। বার্ণার্ড শ'র কথায়, 'In this humiliating national emergency I proposed to Mr. Grein that he should boldly announce a play by me'—"এই লজ্জাজনক জাতীয় দুর্দ্দশার সময় আমি মিঃ গ্রীন্‌কে (জনৈক রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ) বলি যে তিনি সাহস করিয়া আমার কৃত একখানি নাটকের কথা ঘোষণা করিতে পারেন"। এবং ১৮৮৫ সনে আর একজনের সঙ্গে একযোগে তিনি একটা নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং যাহার দুইটী মাত্র অঙ্ক লেখা হইয়াছিল এবং উভয়ের মতের অনৈক্য হওয়ায় যাহা সম্পূর্ণ হয় নাই, তাহাই তৃতীয় অঙ্কে সম্পূর্ণ করিয়া তিনি ১৮৯২ সনে অভিনয়ের জন্য প্রদান করেন। এইরূপে বার্ণার্ড শ' সাধারণের সম্মুখে নাট্যকার হিসাবে উপস্থিত হন।

"বিপত্নীকের বাড়ীগুলি"—(Widower's Houses) নামক তাঁহার এই প্রথম নাটক লিখিতে কেন তিনি তাঁহার সহযোগীর সহিত একমত হইতে পারেন নাই, এবং প্রথম অভিনয়ের পর ইহা কি ভাবে গৃহীত হইয়াছিল, জানিলে তাঁহার কৃত পরবর্ত্তী নাটকগুলির ধারা বুঝা যাইবে। তাঁহার সহযোগীর (Mr. Archer) ইচ্ছা ছিল, তখনকার দিনে প্রচলিত পদ্ধতিতে মানবের সুখদুঃখের প্রতি সহানুভূতিতে পূর্ণ কোনও একটি কাল্পনিক বিষয় নিয়া একখানি সুন্দর নাটক লিখেন; কিন্তু বার্ণার্ড শ' অত্যন্ত রোখের বশবর্ত্তী হইয়া ইহার অদল-বদল করিয়া ফেলেন; এবং কুলিমজুরদের জন্য যাঁরা ভাড়াটে বাড়ী রাখেন তাঁদের এবং মিউনিসিপালিটীর কুকাণ্ডের অদ্ভুত অথচ অবিকল কাহিনী নিয়া হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিতে চান; আর, স্বাধীন আয় আছে বলিয়া যে সব হৃষ্টচিত্ত লোক মনে করেন যে, এ সব জঘন্য বিষয় তাঁহাদের জীবন স্পর্শ করে না, তাঁহাদের ও ইহাদের সহিত যে আর্থিক ও বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘটে তাহা নির্দ্দয়ভাবে লোকে প্রকাশ করিয়া দিতে চান"।* এই নাটকখানি সম্বন্ধে বার্ণার্ড শ' অন্যত্র বলিয়াছেন, 'বিপত্নীকের বাড়ীগুলি'তে আমি দেখাইয়াছি, মক্ষিকা যেমন আবর্জ্জনা হইতে পুষ্টিলাভ করে সেইরূপ মধ্যশ্রেণীর সম্ভ্রান্ত বংশীয়েরা এবং বড় লোকদের কনিষ্ঠ পুত্রের শাখাসম্ভূত ভদ্র-শ্রেণী (middle class respectability and younger son gentility) কুলিমজুরদের দারিদ্র্যে পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে"।

---

* "Perversely distorted it into a grotesquely realistic exposure of slum-landlordism, municipal jobbery, and the pecuniary and matrimonial ties between them and the pleasant people of independent incomes who imagine that such sordid matters do not touch their own lives."

নাটকখানির ঘটনা সংক্ষেপে এই। নিজে লর্ড উপাধির অধিকারী নন, অথচ লর্ড-বংশ-সম্ভূত একজন যুবক প্রেমে পড়িয়া একজন ভদ্রলোকের মেয়েকে বিবাহ করিতে চান। কিন্তু ভদ্রলোকটীর পরিচয় জানার পূর্ব্বেই অন্ধ প্রেমের উৎপত্তি হয়। ভদ্রলোকটী কন্যাদান করিতে সম্মত হন এবং ভবিষ্যৎ জামাতাকে তাহার কুটুম্বগণের, বিশেষতঃ তাহার অন্যতম আত্মীয়া লেডী রক্স্ডেলের সম্মতি লইতে আদেশ করেন। প্রেমের সঙ্গে টাকার লোভও যে জড়িত ছিল না, এমন নহে। কিন্তু পরে জামাতা যখন জানিতে পারিলেন যে শ্বশুরের সম্পত্তি আর কিছু নয়, মজুরদের জন্য কতগুলি জঘন্য বাড়ী; এবং এই সমস্ত বাড়ীর ভাড়া তিনি কসাইর মত নির্ম্মম ভাবে আদায় করেন, তখন তিনি বিবাহ করিতে সম্মত থাকিলেও শ্বশুরের প্রদত্ত কোন টাকা নিতে কিম্বা স্ত্রীকেও উহা নিতে দিতে অসম্মত হন। তাঁহার ভবিষ্যৎ স্ত্রী শুধু তাঁহার অল্প আয়ে সন্তুষ্ট থাকিতে নারাজ; সুতরাং এইখানেই আপাততঃ বিবাহ ভাঙ্গিতে বসিল। কিন্তু পরে শ্বশুর আসিয়া জামাতাকে বুঝাইলেন যে, তিনি যে বাড়ী ভাড়া দিয়া টাকা পান, ঐ বাড়ীগুলি রেহাণ রাখিয়া টাকা কর্জ্জ করিয়াই তিনি ঐ বাড়ীগুলি কিনিয়াছেন; এই রেহাণদার আর কেহ নহে, জামাতা স্বয়ং; সুতরাং মজুরদের দারিদ্র্য যদি কাহারও পুষ্টির কারণ হইয়া থাকে, তবে সে শ্বশুর জামাতা উভয়েরই। জামাতা এবার সম্মত হইলেন, কিন্তু পাত্রী এখন নারাজ; তিনি এমন একটা বেকুবকে বিবাহ করিবেন না। সুতরাং বিবাহ আর হয় না। কিন্তু এর মধ্যে আর একটি ঘটনা ঘটিল। ভাড়া আদায় করিবার জন্য শ্বশুরের একটি গোমস্তা ছিল। সে মনীবের বিনা অনুমতিতে কোনও একটা বাড়ীর সিঁড়িতে ধরিয়া উঠিবার জন্য যে রেল থাকে তাহাই একটু মেরামত করিয়া দিয়াছিল, কারণ সেটার অবস্থা এরূপ হইয়াছিল যে, কখন কে

পড়িয়া মারা যায়। এই অন্যায় খরচের জন্য তাহার কর্ম্মচ্যুতি ঘটে। এর পরে সে একটা অজাত কোম্পানীর অংশী হয়।

এদিকে মিউনিসিপালিটী কোন কোন জায়গায় ঐ সব জঘন্য বাড়ীর স্বত্বাধিকারীরদিগকে জরিমানা করিয়া বাড়ীগুলি মানুষের বাসের উপযুক্ত করিতে বাধ্য করিতে লাগিলেন, আর কোন কোন স্থানে ঐ সব বাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া রাস্তা বড় করিতে লাগিলেন। ঠিক এই সময় এই সকল কোম্পানী বাড়ী-ওয়ালাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া ঐ সব বাড়ীতে কোম্পানীর গুদাম করিতে লাগিল এবং বাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য মিউনিসিপালিটী যে ক্ষতিপূরণ দিত তাহাতে ভাগ বসাইতে লাগিল। ইহাতে কোম্পানী ও বাড়ী-ওয়ালা উভয়েরই লাভ। বাড়ী-ওয়ালার ভাড়া বজায় থাকিত; অথচ কোম্পানীর গুদাম ভাঙ্গার দরুণ মিউনি-সিপালিটীকে ক্ষতিপূরণ বেশী দিতে হইত; কোম্পানী এই ক্ষতিপূরণে যে অংশ পাইত; তাহা হইতে বাড়ীর ভাড়া দিয়াও লাভ করিতে পারিত।

কর্ম্মচ্যুত গোমস্তা অতঃপর এইরূপ এক প্রস্তাব নিয়া তাহার পুরাতন মনীবের নিকট উপস্থিত হয়। এই প্রস্তাব অনুসারে কোম্পানী কতকগুলি বাড়ী ভাড়া নিবে, আর বাকী গুলি স্বত্বাধিকারী এমনভাবে মেরামত করিবেন, যেন মিউনিসিপালিটী আর কিছু বলিতে না পারে। ইহাতে বাড়ীগুলির মূল্য বাড়িবে এবং ক্ষতিপূরণও বেশী পাওয়া যাইবে। কিন্তু আপাততঃ হাত হইতে টাকা দিতে হইবে। শ্বশুর একেলা সেই টাকাটা দিতে সাহসী না হইয়া যাঁর জামাতা হইবার কথা ছিল তাঁকে আবার স্মরণ করিলেন। জামাতার হৃদয়ে পূর্ব্বের সুপ্ত অনুরাগ আবার জাগিয়া উঠিল। শ্বশুরের কন্যা আপাততঃ এরূপ একটা ভাগাভাগিতে নিজকে দানসামগ্রী মনে করিতে না চাহিলেও যখন দেখা গেল যে, এ বন্দোবস্তে উভয় পক্ষেরই অর্থলাভের সম্ভাবনা আছে, এবং তিনি বিবাহে সম্মতি

দিলে উভয় পক্ষই এক হইয়া যায়, তখন আবার প্রেমে পড়িতে কোন আপত্তির কারণ দেখিলেন না।

এই নাটকে প্রসঙ্গক্রমে আমরা ইহাও জানিতে পারি যে, যদিও মিউনিসিপালিটী মধ্যে মধ্যে ঐ সব বাড়ীগুলিকে মানুষের বাসের উপযুক্ত করিতে চায়, তথাপি যাহাদের উপর এ কাজের ভার পড়ে, তাহাদেরই অনেকে ঐ সমস্ত বাড়ীর স্বত্বাধিকারী বলিয়া ফলে বিশেষ কোন উন্নতি হয় না।

কোথায় সেক্সপীয়রের রোমিও-জুলিয়েট, ওথেলো, বা গ্রীষ্ম রাত্রের স্বপ্ন; আর কোথায় এই নাটক! ইহারই নাম নবীন বস্তু-তন্ত্র, ইহারই নাম 'নূতন নাটক'। বাস্তব, অতিবাস্তব ঘটনায় ইহার ভিত্তি।

এই নাটক অভিনয়ের পূর্ব্বে যবনিকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বার্ণার্ড শ' এক বক্তৃতা করিলেন। অভিনয় দর্শন করিয়া সাম্যবাদীরা (Socialist) উচ্চৈঃস্বরে প্রশংসা করিতে লাগিল; সাধারণ দর্শকেরা উন্মত্তের মত গালি দিতে লাগিল; পক্ষাবধি সংবাদপত্রে ইহার আলোচনা চলিতে লাগিল।

বার্ণার্ড শ' যে খুব একটা জয়লাভ করিয়াছিলেন, তা নয়; কিন্তু চারিদিকে হৈ হৈ পড়িয়া গেল, এবং সেটা তার এত ভাল লাগিল যে, আবার ও রকম চেষ্টা করিতে ইচ্ছা হইল। ('and the sensation was so agreeable that I resolved to try again')। তার ফলে ১৮৯৩ সনে "The Philanderer—"ভুজঙ্গ বা কামুক"—নামক নাটক লিখিত হয়। এই নাটকের নায়ক মিঃ চার্টারিস্ (Mr. Charteris) সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজের মত 'অষ্টাদশভাষা-বারবিলাসিনী-ভুজঙ্গ' নহেন, কিন্তু বিলাসিনী-ভুজঙ্গ। 'স খলু সুভগঃ যমঙ্গনাঃ কাময়ন্তে'—এই লক্ষণ অনুসারে তিনি 'সুভগ'। 'ত্বম্ জীবিতম্

ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং, ত্বম্ কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে, ইত্যাদিভিঃ প্রিয়শতৈরনুরুধ্য মুগ্ধাং, তামেব' প্রথম নায়িকাকে পরিত্যাগ করিয়া এক বিধবার প্রতি তিনি অনুরক্ত হন। ইহাতে যা হইবার তাই হইল। অভিমান, ঈর্ষা, ক্রোধ—ইহাদের পৃথক্ ও যুগপৎ অভিব্যক্তি হইতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই যখন কোন ফল হইল না, তখন প্রথম নায়িকা দেখাইতে ইচ্ছা করিলেন যে চার্টারিস্ না হইলেও তাঁর চলে। নিতান্ত বিবেকীর মত তিনি এক বৃদ্ধ ডাক্তারের পত্নী হইতে সম্মত হইলেন।

বার্ণার্ড শ' নিজেই বলেন, তিনি এই নাটকে দেখাইয়াছেন, "বিবাহের আইন অনুসারে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কি একটা অদ্ভুত যৌন বন্ধন সৃষ্ট হয়, যাহা কাহারও কাহারও নিকট রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন, কাহারও মতে ভগবানের নির্দ্দেশ, কাহারও নিকট একটা কাল্পনিক আদর্শ, কাহারও মতে স্ত্রীলোকদের একটা গার্হস্থ্য ব্যবসায়, আবার কাহারও মতে একটা ভ্রান্ত জঘন্য নিয়ম—যাহা সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী নহে, অথচ যাহা সমাজ পরিবর্ত্তিত ও উন্নত করে নাই, এবং এই জন্যই যাহা হইতে উন্নতচেতা ব্যক্তিরা বাধ্য হইয়া সরিয়া পড়েন"। এই নাটকের প্রথম দৃশ্যটি একটু অনুধাবনের যোগ্য। যবনিকা উঠিলেই আমরা দেখিতে পাই, একজন ভদ্রলোক ও মহিলা পরস্পরের আলিঙ্গনে আবদ্ধ। ভারতীয় আলঙ্কারিকদের মতে 'দন্তচ্ছেদ্যং নখচ্ছেদ্যমন্যদ্‌ব্রীড়াকরঞ্চ যৎ, শয়নাধরপানাদি—'রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শন নিষিদ্ধ। এই নিয়মের উদ্দেশ্য স্পষ্ট। কিন্তু প্রাচী ও প্রতীচী পৃথক। বার্ণার্ড শ'র মুখেই শুনিতে পাই, যে, যদিও পাছে অশ্লীল কিছু অভিনীত হয়, সে জন্য অনুমতি না লইয়া কোন নাটক অভিনীত হইতে পারে না, তথাপি স্ত্রী-পুরুষের ব্যভিচারের কথা লোকে এতই উৎসাহের সহিত শুনে যে, এ না হইলে কোন নাটককে নাটকই বলা হয় না। তাঁহার মতে, যে দৃশ্যে এই নাটকের আরম্ভ, যে

ভাবে ইহার পরিণতি, এবং যে বিবাহ ইহার পরিসমাপ্তি, আধুনিক সমাজে জ্ঞান ও কলাশিল্পের মর্য্যাদা বুঝেন যাঁরা (intellectually and artistically conscious classes) তাঁদের জীবনও ঠিক এইরূপ।

ইউরোপীয় সমাজ-দেহের গলিত কুষ্ঠে বার্ণার্ড শ' এইরূপ নির্ম্মম ভাবে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এইখানে তার সূচনামাত্র পাইতেছি। 'ওয়ারেন্-পত্নীর পেশা'—('Mrs. Warren's Profession') নামক নাটকে তাহা আরও অগ্রসর হইয়াছে। ইংলণ্ডের দোকানে, হোটেলে, কারখানায় স্ত্রীলোক নিযুক্ত থাকে; কিন্তু অনেক সময় ইহাদের বেতন এত কম থাকে যে, অন্য উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন না করিলে চলে না। এই নাটকে বার্ণার্ড শ' দেখাইতে চান যে, "কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে ভদ্রভাবে জীবনযাপন করার একমাত্র পন্থা, তাহার এমন কোন পুরুষের প্রিয় হওয়া যে তাহার প্রিয় করিতে সমর্থ"।—('to be good to some man that can afford to be good to her')—'প্রিয় হওয়া' এই উক্তির মধ্যে যে একটা ধ্বনি আছে তাহা সহজেই বুঝা যায়। ওয়ারেন্-পত্নী ওয়ারেন্ নামক কোন ব্যক্তির সহিত কিংবা অন্য কাহারও সহিত কখনও কোন বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হন নাই। কিন্তু তাঁহার একটী কন্যা আছে। এখন ইনি খুবই ধনী। কিন্তু পূর্ব্বে তিনি এক হোটেলে পরিচারিকা ছিলেন। তখন তাঁহার রূপ ও যৌবন হইতে অন্যের অর্থাৎ হোটেলের অধিকারীর অর্থলাভ হইত। তাঁহার এক ভগ্নীর পরামর্শে পরে তিনি নিজের রূপযৌবন দ্বারা অন্যের অর্থবৃদ্ধি না করিয়া নিজেরই আয় করিতে লাগিলেন। এখন তিনি স্যর জর্জ্জ ক্রফ্‌ট্‌স্ নামক এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত একযোগে ভ্রমণকারীদের সুবিধার জন্য বার্লিন, ভিয়েনা, বুডাপেস্ত, ব্রুসেল্‌স্ প্রভৃতি সহরে কতকগুলি বাড়ী

রাখিয়াছেন। বাড়ী অর্থে শুধু ইট সুরকির সমষ্টিমাত্র নয়। এই সকল বাড়ী হইতে তাঁহার প্রচুর আয় হয়।

ইহার নাম গণিকা-বৃত্তি হইতে পারে; কিন্তু ইহাতে সমাজে সম্মানের হানি হয় না; এবং ইহাতে,—ওয়ারেন্-পত্নীর নিজের কথায়,—'ইউরোপের সমস্ত বাছা বাছা ভদ্রলোকদিগকে পায়ের কাছে পাওয়া যায়।' ওয়ারেন্ পত্নী বলিতে চান, শিক্ষিত ভদ্র-ঘরের মেয়েরা কি করে? তারাও ত একজন পুরুষের হৃদয় দখল করিয়াই সুখে সম্মানে থাকে। কেবল বিবাহ নামক একটা ঘটার ভিতর দিয়া গেলেই কাজটার মূল্যের এমন কি তারতম্য হইতে পারে?

বার্ণার্ড শ' যে সমাজের এ অবস্থা চান, তা নয়। কিন্তু তিনি বলেন, গণিকা-বৃত্তি ত সমাজে কত রকমেরই আছে; সেগুলির তুলনায় এ কিছুই নহে। অথচ এটাকেই লোকে এত নিন্দা করিবে কেন? নাট্যকার, সংবাদ-পত্রের লেখক, উকীল, ডাক্তার, পাদ্রী, সাধারণ বাহবা-ভিখারী রাজনৈতিক বক্তা—ইহারা সকলেই ত পণ্য,—পুরুষ-বেশ্যার দল। পয়সার জন্য ইহারাও ত আত্ম-বিক্রয় করিয়া আসিতেছে। ইহাদের তুলনায় যে স্ত্রীলোক কয়েক ঘণ্টার জন্য নিজের দেহটা বিক্রয় করে, তাহার পাপ ত কিছুই নহে। বার্ণার্ড শ' ভুলেন নাই যে, তিনি নিজেও ইহাদের একজন। তাঁহার মতে, সামাজিক নিয়মের ভিতর থাকিয়াই হউক, কিংবা তাহা ভঙ্গ করিয়াই হউক, কোনও স্ত্রীলোক যে নিজের জীবন-যৌবন অন্যের অধীন করিয়া না দিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবার কোন পথ পায় না, ইহাই সমাজে বেশ্যা-সৃষ্টির অন্যতম কারণ। "সমাজ যদি ব্যক্তির উচ্চ সচ্চরিত্রতায় নিজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে চায় তবে প্রত্যেক ব্যক্তি—প্রত্যেক স্ত্রী কিংবা পুরুষ, যাহাতে নিজের বিশ্বাস, রুচি ও প্রেম বিক্রয় না করিয়া স্বাধীন ভাবে নিজের

পরিশ্রম দ্বারা যথাযুক্ত স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করিতে পারে, সেরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইবে।”

এই কয়েকটী দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝা যাইবে, বার্ণার্ড শ’র, এবং তিনি যাহাদের অন্যতম, সেই সমস্ত নাট্যকারদের নাট্যসাহিত্যের ধারা কিরূপ। সমাজের অন্তঃসার-শূন্য আচারের মূল্যহীনতা নির্দ্দয় ভাবে দেখাইয়া দিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। বসন্তের প্রতিষেধক টীকা দেওয়ার পদ্ধতি, বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্কারের আশায় জীবিত জন্তুর উপর নির্দ্দয় অস্ত্র-প্রয়োগ, ডাক্তারদের ভণ্ডামি, অস্ত্রচিকিৎসার নিষ্ঠুরতা, প্রভৃতির বিরুদ্ধেও তিনি (The Doctor's Dilemma) “চিকিৎসকের উভয়-সঙ্কট” নামক নাটকে ও তাহার মুখবন্ধে অনেক কথা বলিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। বার্ণার্ড শ’র একটা বিশেষত্ব এই যে, তাঁর বইয়ের চেয়ে তার মুখবন্ধ অনেক সময় বড় হইয়া যায়। কারণ, মূল নাটকে যাহা কথোপকথন-চ্ছলে বলা হয়, ভূমিকায় কঠোর গদ্যে বক্তৃতা-চ্ছলে তাহারই ব্যাখ্যা ও পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি-তর্ক দেওয়া হয়। “The Shewing up of Blanco Posnet’—বা “ব্ল্যাঙ্কো পস্‌নেটের গুমর ফাঁক” নামক নাটক ছাপায় ৩৩ পৃষ্ঠা মাত্র স্থান অধিকার করিয়াছে, কিন্তু তাহার ভূমিকা ৭৬ পৃষ্ঠা দীর্ঘ। এই সব ভূমিকায় অনেক অবান্তর কথা থাকে, সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহার একটা সুবিধা এই যে, বার্ণার্ড শ’ সম্বন্ধে যাঁহার যা জানিবার ইচ্ছা তাহা তিনি তাঁর নিজের কথায়ই এগুলিতে পাইবেন।

তদীয় সমাজের যে সব প্রথার বিরুদ্ধে বার্ণার্ড শ’ লেখনী চালনা করিয়াছেন, তাহার কতক পরিচয় আমরা পাইয়াছি। কিন্তু যে প্রশ্ন ইউরোপীয় নবীন সাহিত্যের বিশেষ সমস্যা, যে প্রশ্ন বার্ণার্ড শ’ একাধিক নাটকে নানাভাবে উত্থাপিত করিয়াছে, তাহা স্ত্রীপুরুষের বৈবাহিক

সম্বন্ধ বিষয়ে। ইবসেন্ তাঁহার 'পুতুলের ঘর' নামক নাটকে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, সাধারণতঃ যাহাকে গৃহ বলা হয় তাহা বাস্তবিক এমন নহে যাহাতে প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বের পরিণতির কোন সুবিধা থাকে; ইহা একটী পুতুলের ঘর মাত্র এবং স্ত্রী স্বামীর একটী স্নেহ-পুত্তলিকা মাত্র। যাহাকে সাধারণতঃ স্বামীর ভালবাসা বলা হয়, তাহা ফলে স্ত্রীকে এতই খর্ব্ব করিয়া দেয় যে, ব্যক্তি হিসাবে, সমাজের একটী পৃথক অংশ হিসাবে, তাহার আত্মার পূর্ণ বিকাশ কখনও হইতে পারে না। এমন কি, তিনি যে একটী স্বতন্ত্র আত্মা, তাঁহারও যে ধর্ম্মে ও নীতিতে একটা কর্ত্তব্য থাকিতে পারে, বিবাহিত স্ত্রীর এ কথা শিখিবার সুযোগও ঘটে না। ইবসেনের নাটকটীর স্থান বর্ত্তমান গৃহ এবং কাল বর্ত্তমান সময়। কিন্তু তথাপি তিনি উহাকে কল্পনার সৌন্দর্য্যে, কবিত্বের পরিচ্ছদে এমনই ভাবে মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছেন, এবং ঘটনাবলী এমনই ভাবে রঞ্জিত করিয়াছেন এবং বিষয়টী এমনই কমনীয় ভাবে উত্থাপিত করিয়াছেন যে, তাহাতে তৎক্ষণাৎ কাহারও মনে হয় না যে, এ প্রত্যেক গৃহেরই কথা; এবং সেই জন্য সমাজের প্রতি সম্মানেচ্ছা আহত হইয়া আপাততঃ ইহার প্রতিবাদ করিতে চায় না। ইব্সেনের এই প্রিয়ংবদতা প্রশংসনীয়।

কিন্তু সত্য অসত্য উভয়কেই অপ্রিয় করিয়াও বলা যায়। আবরণহীন সত্যকে তাহার সমস্ত বিভীষিকা, তাহার সমস্ত কঠোরতা, সমস্ত অত্যাচারে রঞ্জিত করিয়া করাল-মূর্ত্তিতে উপস্থিত করিলে প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধা-সম্পন্ন মানব-হৃদয় সহজেই তাহার এ মূর্ত্তিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে অসম্মত হয়। এবং অসত্যকে যখন এরূপ ভীষণ মূর্ত্তিতে উপস্থিত করা হয়, তখন তাহা আরও অপ্রিয় হইয়া উঠে। বিবাহিত নারীর চেয়ে পুরুষের অধিকার বেশী, ইহা

সমাজের একটী অবিচার, ইউরোপের নবীন সাহিত্যে আজ নানা ভাবে এ কথা উঠিয়াছে। শুধু ইউরোপের নয়, আমাদের সাহিত্যেও তাহার স্ফুট প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। রবীন্দ্রনাথের "ঘরে বাইরে" নামক নূতন উপন্যাসে পাই,—"তীর্থের অর্থপিশাচ পাণ্ডারা পূজার জন্য কাড়াকাড়ি করে, কেন না তারা পূজনীয় নয়; পৃথিবীতে যারা কাপুরুষ তারাই স্ত্রীর পূজা দাবী করে থাকে। তাতে পূজারি ও পূজিত দুইয়েরই অপমানের এক শেষ"।—অন্যত্র, "সমস্ত সমাজ যে চারিদিক থেকে আমাদের মেয়েদের মনকে চেপে ছোট করে বাকিয়ে রেখে দিয়েছে। ভাগ্য যে ওদের জীবনটাকে নিয়ে জুয়ো খেলচে,—দান পড়ার উপরই ওদের সমস্ত নির্ভর, নিজের কোন্ অধিকার ওদের আছে?" সত্য হউক, মিথ্যা হউক, কথাটা আজ পৃথিবীর সাহিত্যে উঠিয়াছে। কিন্তু অনেকেই ইহাকে যথা-সম্ভব মার্জ্জিত ও প্রিয় করিয়া বলিতে চেষ্টা করেন। বার্ণাড´ শ' বোধ হয় এ শিষ্টাচারকে ভণ্ডামি মনে করেন, কিংবা হয় ত মনে করেন যে মোলায়েম করিয়া বলিলে এদিকে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে না। তাই "Getting Married" বা 'বিবাহ করা' নামক নাটকে, বিশেষতঃ তার ভূমিকায় এই কথাটী তিনি এমনই নির্দ্দয় ভাবে তুলিয়াছেন যে, অনেকেরই প্রাণে লাগিতে পারে। অবশ্যই এই নাটকে হাস্যরসই প্রধান; কিন্তু যে হাসি ইহাতে রহিয়াছে মনে হয় তাহা অত্যন্ত নিষ্ঠুর হাসি। আর ভূমিকাটীতে তিনি মোটেই হাসাইতে চেষ্টা করেন নাই; তিনি অতি গম্ভীর ভাবেই তাঁহার মত বিবৃত করিয়াছেন; যদি কেহ হাসে, তবে সে তাঁহার মতের অদ্ভুতত্ব দেখিয়া।

ভূমিকার প্রথমই তিনি বলিতেছেন, "অনেক যুবতী আমাকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহারা যে পুরুষের সঙ্গে একত্র বাস করিতে

যান, তাঁকে বিবাহ করা আমার মতে সঙ্গত কি না ; এবং আমি যখন বলি যে, প্রকৃত বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদের কোনরূপে জড়িত হওয়া উচিত নয়, তখন তাঁরা বিস্মিত হন ; কারণ,—ভগবান্ জানেন কেন, লোকে মনে করে, এই বিষয়ে আমার মত সব চেয়ে অগ্রসর। আর তাঁরা জর্জ্জ ঈলিয়টের দৃষ্টান্ত দেখান ; জর্জ্জ ঈলিয়ট্ বিবাহ না করিয়াও লিউয়েসের সঙ্গে একত্র বাস করিয়াছিলেন" ; "পরে ইঁহারা যখন ব্যক্তিগত চেষ্টায় বিবাহের সংস্কার করার ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন, এবং রেজেষ্টরী করিয়াই হউক কিংবা গির্জ্জায় গিয়াই হউক, বিবাহ করিতে সম্মত হন, তখন স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে এরূপ একটা স্পষ্ট জানাজানি থাকে যে, উভয়ই ইচ্ছামত প্রতি ফুল্লকুসুমের রসাস্বাদন করিতে পারিবেন।"* বার্ণার্ড শ'র সমাজের অবস্থা সত্য সত্যই এরূপ কি না জানি না ; কিন্তু তিনি ভূমিকায় যাহা বলিয়াছেন, মূল নাটকে লেস্‌বিয়ার মুখেও তাহার অনুরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। লেস্‌বিয়া কহিতেছেন,—"আমার সন্তান থাকা উচিত। আমি সন্তানের খুব ভাল মা হইতে পারিতাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার সন্তান হইলে দেশের উপকারই হইত, এবং যাহাতে আমি সন্তানের মা হই, সে জন্য দেশ আমাকে কিছু দিলেও পারিত। কিন্তু সমাজ বলে, আমি আমার গৃহে একজন বয়স্থ পুরুষের স্থান না দিয়া সন্তান পাইতে পারি না ; সুতরাং আমিও সমাজকে বলি যে, আমার সন্তানের আশা যেন সে পরিত্যাগ করে। মা হইতে চাই বলিয়াই যে একজন আসিয়া আমাকে আবার পত্নী বলিয়াও দাবী করিবে, সে আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারি না"। ইনিই আবার অন্যত্র কহিতেছেন, "আমি সন্তান

* 'Both parties are to be perfectly free to sip every flower and to change every hour, as their fancy may dictate.'

চাই ; এবং, তাহার জনকের নয়, সন্তানের সেবায় নিজেকে সর্ব্বান্তঃকরণে নিযুক্ত দেখিতে চাই। কিন্তু আইন আমাকে তাহা করিতে দেয় না ; সুতরাং আমি স্থির করিয়াছি, স্বামী এবং সন্তান উভয় ছাড়াই আমার চলিবে।”

বার্ণার্ড শ’ বলেন, ‘স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে উক্ত প্রকার বিবাহ নামক যে একটা সন্ধি-স্থাপন হয়, তাহাতে প্রমাণিত হয় যে পরস্পরের সম্মতি নিয়া উভয়েই এ বন্ধনের দায় এড়াইতে পারে, লোকের তাহা বিশ্বাস।’

কিন্তু বিবাহ না করিয়া স্ত্রী বা পুরুষের সহিত সম্বন্ধ হওয়ার অসুবিধা এত বেশী যে, লোকে বরং বিবাহ-বন্ধনের ছায়ায় থাকিয়া তাহারই বিরুদ্ধ আচরণ করে ; তথাপি বিবাহ না করিয়া কোন স্ত্রী বা পুরুষ উভয়ের মধ্যে কোনরূপ সম্বন্ধ সহজে ঘটাইতে চায় না। টলষ্টয়ের য়্যানা কারেনিন্ তাহা বুঝিয়াছিলেন। ফ্রনস্কীর (Vronsky) প্রেমে মুগ্ধ হইয়া য়্যানা স্বামী ও সন্তানকে ত্যাগ করিয়া গৃহের বাহির হইয়াছিলেন ; ফ্রন্স্কীও প্রাণের সহিত তাঁহাকে ভাল বাসিতেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার স্বামীর সহিত বিবাহ আইন অনুসারে ভঙ্গ না হওয়ায় তিনি ফ্রন্স্কীকে বিবাহ করিতে পারেন নাই, এবং উপপতি-উপপত্নী রূপে থাকার অসুবিধা ও অনিশ্চয়তা তাঁহাকে এতই অধীর করিয়াছিল যে, অন্তিমে আত্মহত্যা করিয়া তাঁহার এই কষ্টের সমাপ্তি করিতে হইয়াছিল। এই জন্যই, বার্ণার্ড শ’ বলেন, ‘যেখানে সম্পত্তি ও সন্তানাদি নিয়া স্ত্রীপুরুষের একত্র বসবাস করিতে ইচ্ছা হয়, সেখানে বিবাহ অনিবার্য্য।”

কিন্তু বিবাহ কি ? আইন অনুসারে রেজেষ্ট্রী করিয়া বিবাহ, গির্জ্জায় ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বিবাহ, রোমান্ ক্যাথলিকদের অচ্ছেদ্য বিবাহ, কুলীনদের অসংখ্য বিবাহ, মুসলমানদের বহু বিবাহ,—বার্ণার্ড শ’

জিজ্ঞাসা করেন, এক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেই ত কত রকম বিবাহ আছে, বিবাহ অর্থে আমরা কোন্‌টীকে বুঝিব? যে যেটীর অনুসরণ করে, সে ত সেটীকেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল মনে করে। তবে সব বিবাহ-মতেই মোটামোটী একটা কথা বোধ হয় স্বীকৃত যে, শুধু স্বামী নয়, পতি পত্নী উভয়েই একে অন্যের দেহটীকে সম্পূর্ণ নিজের সামগ্রী মনে করে, যাহা অন্য কাহারও ব্যবহারে আসিতে পারে না। স্ত্রী বা পুরুষের বহু বিবাহ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তায় একজন মহিলা নাকি বার্ণার্ড শ'কে বলিয়াছিলেন যে, তিনি অন্য স্ত্রীলোককে তাঁর স্বামী ধার দেওয়ার চেয়ে বরং তাঁর দাঁতের বুরুশটী আর একজনকে ধার দিবেন। যেন স্ত্রী এবং স্বামী উভয়েই উভয়ের দাঁতের বুরুসের মত খাস ব্যবহারের একটী সামগ্রীমাত্র।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউরোপের ব্যক্তি-প্রাধান্যবাদীরা (Individualists) মনে করিতেন, বিবাহ নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার, সমাজের ইহাতে কোন হাত থাকা উচিত নয়; এবং পক্ষদ্বয়ের ইচ্ছামত যখন খুসী ইহা ভাঙ্গিতে দেওয়া উচিত। কিন্তু বিবাহ হইতে পরিবারের প্রতিষ্ঠা হয়—সন্তানের উৎপত্তি হয়, সুতরাং সমাজের স্বার্থ ইহাতে জড়িত। সেই জন্য বিবাহে রাষ্ট্র ও সমাজের হাত চিরকালই থাকিবে। তথাপি, বার্ণার্ড শ মনে করেন, পৃথিবী অচ্ছেদ্য বিবাহের যুগ ছাড়াইয়া আসিয়াছে; বর্ত্তমানে সমস্যা এই, কি কি অবস্থায় ইহা ভঙ্গ হইতে দিলে ইহার সম্যক সংস্কার হয়। তিনি কুলীনদের বহু বিবাহের খবর রাখেন, কিন্তু এখানে ভুলিয়া যাইতেছেন যে পৃথিবীতে এখনও, কুলীনেরা যে সমাজের লোক অন্ততঃ সে সমাজে, বিবাহ অচ্ছেদ্য—পুরুষের পক্ষে সর্ব্বদা না হইলেও স্ত্রীর পক্ষে সর্ব্বদাই অচ্ছেদ্য। অবশ্যই তাঁহার এ ত্রুটী অমার্জ্জনীয় নহে। কারণ, তিনি তাঁহার সমাজের কথাই প্রধানতঃ

ভাবিতেছেন। সেখানে বিবাহকে যে লোকে শুধু ভঙ্গুর মনে করে, তা নয়; সেখানে, শ' বলেন, "তাঁহার স্মরণ-কালের মধ্যেই বিবাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এত দ্রুত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে, যদিও এখনও অনেকের ধারণা যে অধিকাংশ লোকই বিবাহকে সুন্দর ও পবিত্র বলিয়া বিশ্বাস করে, তথাপি, যাহারা কখনও কোনও বিষয়ে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করে না এরূপ সাধারণ লোকদের ভিতর ছাড়া, এ প্রকার বিশ্বাসী বাস্তবিক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।"

বিবাহের উপর এই আক্রমণের কারণ কি? বার্ণাড শ' বলেন, কারণ সকলেই জানে, কিন্তু কেহই মুখ ফুটিয়া বলিতে চায় না। কারণ আর কিছুই নহে,—বিবাহ হইতেই জাতির লোকসংখ্যা বৃদ্ধি না পাইয়া বরং হ্রাস পাইতেছে, এবং বিবাহিত জীবনে যেমন অসংযম দেখা যায়, সমাজ যাহাদিগকে অসংযতচরিত্র মনে করে তাহাদের জীবনেও তত নাই।* 'আমি যদি এরূপ জীবন যাপন করিতাম তাহা হইলে এক পক্ষের মধ্যেই আমার লেখায় বিস্ময়কর অবনতি দেখা দিত'। 'বিবাহ হইতে যদি আমাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট মানবের উৎপত্তি না হয়, তাহা হইলে, হয় বিবাহ-প্রথা উঠাইয়া দিতে হইবে, অথবা জাতির লোপ অনিবার্য্য'। বিবাহিত জীবনের এবং গৃহের যে একটা কবি-কল্পনা পাওয়া যায় তাহা মিথ্যা। 'ইংরেজের গৃহ আজ আর সম্মান, ধর্ম্ম ও স্বাস্থ্যের স্থান নহে, ইহা আর সুন্দর ও পবিত্র নহে'। 'Home life as we understand it, is no more natural to us than a cage is natural to a cockatoo.,—'কাকাতুয়ার পক্ষে পিঞ্জর যেমন স্বাভাবিক আমাদের পক্ষে আমাদের গার্হস্থ্য জীবন,

* 'Marriage is now depopulating the country with such alarming rapidity that we are forced to throw aside our modesty &c.'

যে অর্থে আমরা ইহাকে গ্রহণ করি সে অর্থে, তার চেয়ে বেশী স্বাভাবিক নহে। এই কয়েদ, এই অস্বাভাবিকতার ফলে, শ' মনে করেন, ইংলণ্ডের নর-নারীর মনে গৃহ এবং তাহার নিয়মের বিরুদ্ধে একটা প্রবল বিদ্বেষের সৃষ্টি হইয়াছে; এবং সাহিত্যেও তাহার প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। টম্ জোনস্ প্রভৃতিকে বীর মনে করা এখন দস্তুর হইয়া গিয়াছে; নর-হন্ত্রী নারীকে বিবাহ করিবার জন্য লোক পাগল হইয়া যায়।

সমাজের এবং গৃহের এই যে দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা রোধ করিবার জন্য, বার্ণাড্ শ'র মতে (Wanted an Immoral Statesman) প্রচলিত রীতির বিরোধী একজন রাষ্ট্রনায়কের আবশ্যক। বার্ণার্ড শ'র মতে, গৃহীত রীতির বিরুদ্ধ যাহা তাহাই অনীতি। সুতরাং দেশের উদ্ধারের জন্য এমন নায়কের প্রয়োজন যে তথা-কথিত অনীতিকে ভয় করে না। দেশের নেতারা যে সাধারণতঃ বিবাহের সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিতে চান না, তার কারণ, তাঁরা সাধারণের প্রতিবাদকে ভয় করেন। কিন্তু শ' বলেন, এক দিন না একদিন ইহা করিতেই হইবে।

বিবাহ সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে ব্যক্তি-বিশেষের ভোগের কথা না ভাবিয়া সর্ব্বাগ্রে ভাবিতে হইবে, সন্ততির কথা, দেশের লোক-সংখ্যার কথা, উত্তরবংশীয়দের কথা। এ কথা সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত যে, দেশে যাহাতে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য-সম্পন্ন লোক জন্মে,—অকাল বার্দ্ধক্য, অকাল মৃত্যু, রোগ, অঙ্গহীনতা প্রভৃতি যাহাতে দূর হয়, বিবাহ সংস্কারে সর্ব্বাগ্রে তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে, লেস্বিয়ার মুখ দিয়া বার্ণাড শ' যাহা বলাইয়াছেন, তাহাও মনে রাখিতে হইবে; কারণ, তিনি নাকি আলোচনা করিয়া জানিয়াছেন যে, মাতৃত্বের অভিলাষিণী হইলেই যে স্ত্রীলোককে একজন

পুরুষের দাসী হইতে হয়, সমস্ত স্ত্রীলোকই প্রকাশ্যে না হইলেও গোপনে গোপনে ইহার বিরোধী।

স্ত্রী বা পুরুষের বহু-বিবাহের কথাও প্রসঙ্গক্রমে এখানে উঠিবে। বহু-বিবাহের পক্ষে যে কোন যুক্তি আছে, বিংশ শতাব্দীতে খ্রীষ্টান সমাজের মধ্যে এ কথা নূতন। বার্ণার্ড শ' বলেন, এক নারীর বহু পতি কিংবা এক পুরুষের বহু পত্নী গ্রহণ করার মধ্যে নীতির কোন তর্ক নাই; ইহা কোনও এক সমাজে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যার উপর নির্ভর করে। "কোনও এক যুদ্ধের ফলে যদি এ দেশের তিন-চতুর্থাংশ পুরুষ নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে মুসলমানদের মত চারি পত্নী গ্রহণ মঞ্জুর করা লোক-সংখ্যা-পূরণের জন্য অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িবে"। তিনি আরও মনে করেন যে, স্ত্রীলোকদিগকে যে যুদ্ধে যাইয়া হত হইতে দেওয়া হয় না, তার আসল কারণ,—স্ত্রীলোকের সংখ্যা কমিয়া গেলে লোক-সংখ্যা-পূরণ আরও কঠিন হইয়া পড়ে। কারণ, একজন পুরুষ একাধিক স্ত্রীলোকের পতি হইয়া এক সঙ্গে বহু পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা হইতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোক বহু পতি গ্রহণ করিলে তাহার সন্তান আরও কম হয়। সমাজে সাধারণতঃ স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা সমান বলিয়াই এক-পতি এক-পত্নী বিবাহ সম্ভব হইয়াছে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অনেক জায়গায় বহু বিবাহ প্রচলিত আছে। সাধারণতঃ দেখা যায়, স্ত্রীলোকেরা বহু বিবাহের বিরোধী নয়; আমেরিকাতেও মরমন্-পন্থীদের বহু বিবাহে স্ত্রীলোকেরা নাকি অসন্তুষ্ট নয়। তার কারণ, একজন সাধারণ লোকের একমাত্র পত্নী হওয়ার চেয়ে একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষের দশম পত্নী হওয়াও নাকি স্ত্রীলোকেরা শ্রেয়ঃ মনে করে। স্ত্রীলোকেরা স্ত্রীলোকের বহু-বিবাহের বিরোধী; কারণ, তাহাতে শ্রেষ্ঠ রমণীরা অধিক পতি পাইবে, এবং ফলে, অনেক রমণীর ভাগ্যে

পতি না জুটিবার সম্ভাবনা আছে। তেমনই, ঠিক সেই কারণেই পুরুষেরাই পুরুষের বহু-বিবাহের বিরোধী; এবং উভয়ত্রই শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা বা শ্রেষ্ঠ স্ত্রীলোকেরা বড় আপত্তি করে না; আপত্তি হয় অতি সাধারণ ব্যক্তিদের, যাদের অবহেলিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

কিন্তু বর্ত্তমানে সমাজে স্ত্রীপুরুষের সংখ্যা এরূপ যে, প্রত্যেক পুরুষ দুইটী বিবাহ করিতে পারে না; অথচ প্রত্যেকে একটী করিয়া (অবশ্যই বিধবাদের বিবাহও ধরিয়া নেওয়া হইতেছে) বিবাহ করিলে, কতক স্ত্রীলোকের পতি জুটে না, অথচ ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মাতৃত্বের বীজ হয় ত অঙ্কুরিত হইতে না পারিয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছে। সন্তানের লালন-পালনে যে শক্তি নিয়োজিত হইতে পারিত, হাসপাতালে কিংবা গ্রাম্য পাঠশালায়, কিংবা পশু-পক্ষীর পালনে তাহার অপব্যয় হইয়া যাইতেছে। পতিগ্রহণ না করিয়া সন্তানের মা হইতে পারিবে না, এদের সম্বন্ধে সমাজের এ কঠোর নিয়ম কেন? অথচ, যারা মাতৃত্বের সম্পূর্ণ উপযুক্ত নয়, বিবাহ করিতে পায় বলিয়াই তাদের উপর মাতৃত্বের বোঝা আপনা হইতেই চাপিয়া বসে। সস্তা জিনিসের উপযোগিতা কম। যারা সহজেই মা হইতে চায়, তারা কখনও ভাল সন্তানের মা হইতে পারে না। আর, যে কোন সর্ত্তে একজন পুরুষের অধীন হইয়া যে সন্তানের মা হইতে চায় না, সে-ই শ্রেষ্ঠ মা; তাহার সন্তানেরই সব রকমে সুস্থ ও সবল হওয়ার সম্ভাবনা। এই জন্য বার্ণার্ড শ' লেস্‌বিয়ার চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

লেস্‌বিয়া যে মাতৃত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু কাহারও পত্নী হইতে নারাজ,—তাহার কারণ, পতির রুচির সহিত তাঁহার রুচি না মিলিতে পারে; অথচ সব বিষয়েই পতির রুচি অনুসারেই যে তাঁহার রুচি গড়িয়া নিতে হইবে, এরূপ কোন যুক্তি নাই। আমাদের

রবীন্দ্রনাথ 'ঘরে বাইরে'তে নিখিলেশের মুখ দিয়াও ঠিক এই ভাবেরই অবতারণা করিয়াছেন। লেস্‌বিয়াকে যিনি বিবাহ করিতে চান, তিনি অত্যন্ত তামাক-প্রিয় ; অথচ লেস্‌বিয়া তামাকুর গন্ধ একেবারেই সহ্য করিতে পারেন না। বিবাহ করিলে এইরূপে কত শত বিষয়ে তাঁহাকে অন্যের রুচির অধীন হইতে হইবে, বিবাহ না করার পক্ষে, ইহাই তাঁহার যুক্তি। বিবাহ-সংস্কারের পক্ষে ইহা বার্ণার্ড শ'রও যুক্তি।

বিবাহ যে একটা স্বর্গীয় সম্বন্ধ নয়, তাহাতেও যে কলহ, অভিমান, অত্যাচার, ব্যভিচার থাকিতে পারে, ইহা সত্য ; এবং বিবাহ ছাড়াও যে প্রকৃত প্রণয় হইতে পারে, ইহাও সত্য ; এবং ইউরোপীয় সমাজে যুবক-যুবতীর মধ্যে বিবাহ হইবার পূর্ব্বেই যে অনেক সময় যৌন সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া যায়, এবং পরে সামাজিক নিন্দার ভয়ে কিংবা আইনের পীড়নে বিবাহ হয়, ইহাও ঠিক। বার্ণার্ড শ' বলিতে চান, এই প্রকার আইনের পীড়নে বিবাহের সংখ্যা কম নহে, এবং ইহা হইতে নানা অনর্থের উৎপত্তি হয়। বিবাহ ছাড়া স্ত্রীপুরুষের মিলনকে যদি সমাজ পাপ মনে না করিত, তাহা হইলে, এরূপ জোর করিয়া বিবাহ দেওয়ার যে কুফল, তাহা ভোগ করিতে হইত না। এরূপ জবরদস্তি বিবাহে প্রকৃত প্রণয় ও স্থায়ী সুখ হয় না, এবং বিবাহিত ব্যক্তিদের ও উত্তর-বংশীয়দের স্বাস্থ্যের হানি ঘটে।

বার্ণার্ড শ' বলেন, পুরুষ যে বিবাহ-প্রথার সমর্থন করে, তাহার কারণ উহা তাহার ভোগের পন্থা ; নারী বিবাহ-প্রথা সমর্থন করে, কারণ উহা ছাড়া ভদ্রভাবে, নিন্দিত না হইয়া, জীবিকা উপার্জ্জনের তাহার অন্য কোন উপায় নাই। সুতরাং অর্থ এবং অর্থের বিনিময়ে যাহা পাওয়া যায়, তাহারই জন্য বিবাহ-নামক বন্ধনে নারী পুরুষের অধীন হয় ; এবং এই হিসাবে বিবাহিতা নারী ও বেশ্যার মধ্যে এইমাত্র

পার্থক্য যে, একজনের পন্থা সমাজে নিন্দিত নহে, আর এক জনেরটী নিন্দিত।

ইব্‌সেন্ শুধু পত্নীর অধিকারের অল্পতা এবং বিবাহের ফলে তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশের বাধার কথাই প্রথম সমস্যা মনে করিয়াছেন। কিন্তু বার্ণার্ড শ' বর্ত্তমানে প্রচলিত বিবাহের কুপ্রথা যে শুধু পত্নীর নয়—পতিপত্নী উভয়েরই, এবং ফলে গৃহ ও সমাজের, প্রভূত অনিষ্ট করে, এ কথাই নানা ভাবে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে সমাজে ব্যভিচার, বেশ্যা-বৃত্তি, এবং ইহার ফলে বিবিধ প্রকার রোগ—'নেত্রহীনতা, অনুর্ব্বরতা, শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা, অঙ্গহীনতা, উন্মাদ ও অকাল মৃত্যু' প্রভৃতি যত সব অনীপ্সিত জঞ্জাল সঞ্চিত হইতেছে,—তাহার এক মাত্র কারণ, এক দিকে বিবাহ-বন্ধনের ছুশ্ছেদ্যতা অপর দিকে অর্থের জন্য স্ত্রীলোকদের পুরুষাধীনতা। ছুশ্ছেদ্য বিবাহে রোগাক্রান্ত পতি বা পত্নী একে অন্যের ব্যাধি দ্বারা সংক্রামিত হইয়া থাকে; রোগ আবিষ্কৃত হইলেও যে সমাজ বিবাহ ভাঙ্গিয়া দেয় না, তাহাতে উত্তর-বংশীয়দের প্রভূত অনিষ্ট হয়। কারণ, এই বিবাহ হইতে জাত সন্তানও রুগ্ন হইবে; এবং বিবাহের ভঙ্গ না হইলে এইরূপ সন্তানের সংখ্যাও বেশী হইবে! ইউরোপে আজ যে সুপ্রজনন-বিজ্ঞানের (Science of Eugenics) উৎপত্তি হইয়াছে, বার্ণার্ড শ'র এই যুক্তিতে তাহারই আভাস পাই।

বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের সমাজে বহু পুরুষ ও বহু স্ত্রীলোক বিবাহ করিতে পায় না, এবং অনেকে আবার ছুশ্ছেদ্য বিবাহের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ দায়িত্বের ভয়ে করিতে চায়ও না; অথচ অবিবাহিত স্ত্রীলোকের অন্য প্রকার স্বাধীন জীবিকার পথ একরূপ রুদ্ধ। সুতরাং দুর্দ্দম প্রবৃত্তি কিংবা জিজীবিষা ব্যভিচার ও বেশ্যা-বৃত্তির সৃষ্টি করিয়া থাকে। "যথন

প্রত্যেক যুবকই বিবাহ করিতে সমর্থ হইবে, এবং বিবাহ-সংস্কারের ফলে অনভিজ্ঞ যুবক-যুবতীর বিবাহ অপ্রীতিকর হইয়া দাঁড়াইলে, কিংবা কোনও কারণে স্বামী বা স্ত্রীর অবস্থা অপরের অসহনীয় হইয়া দাঁড়াইলে, যখন সহজেই সে বিবাহ ভঙ্গ করা যাইবে, তখন বেশ্যাবৃত্তি ও অবিবাহিতত্ব আপনা হইতেই মরিয়া যাইবে।"

কয়লার খনিতে, কিংবা জাহাজ তৈয়ারীর স্থানে, কিংবা অন্যত্র, যে কাজ করিতে চায় এবং করিতে সমর্থ, তাহার কাজ খুঁজিয়া দেওয়া সমাজের একটী কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকৃত। পত্নীত্ব ও মাতৃত্ব গ্রহণও তেমনই সমাজের উপকারার্থ একটী কাজ; এবং যে তাহা করিতে প্রস্তুত, সমাজের উচিত তাহার কাজ বাহির করিয়া দেওয়া। সুতরাং বার্ণার্ড শ' সমাজকে উপদেশ দেন;—সকলকেই বিবাহ করিবার সুবিধা করিয়া দেও; কিন্তু অর্থের জন্য স্ত্রী বা পুরুষ কেহই যেন অন্যের অধীন না হয়—সুতরাং অর্থের জন্য যেন বিবাহ না করিতে হয়; এবং যাহাতে সহজেই বিবাহ ভাঙ্গা যায় তাহা কর; কেহ বিবাহ ভাঙ্গিতে চাহিলে তাহাকে কখনও জিজ্ঞাসা করিও না, 'কেন'।

বিবাহ সহজে ভাঙ্গিতে না দিলে যে কি ব্যভিচার ও ভণ্ডামির সৃষ্টি হইতে পারে, লিও ও রেজিনাল্ডের ব্যাপারে বার্ণার্ড শ' তাহা দেখাইতে চান। রেজিনাল্ড লিওর স্বামী; কিন্তু লিও স্বামীর চেয়ে বয়সে ছোট এক যুবকের প্রেমে পড়িয়াছেন। রেজিনাল্ড পত্নীকে যোগ্যতর ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করিতে কুণ্ঠিত নন; এবং আছে যে বিবাহ তাহা ভাঙ্গিবার জন্য বাগানের মালীর সম্মুখে প্রকারান্তরে তাহাকে সাক্ষী করিয়া তিনি তাঁহার স্ত্রীকে কপট প্রহার করিলেন, এবং একটী ভাড়া করা স্ত্রীলোকের সহিত ব্যভিচারের ভাণ করিয়া আদালতকে বুঝাইলেন যে, তাঁহার বিবাহ ভঙ্গ হওয়া উচিত। যদি স্ত্রী চাহিবামাত্রই কিংবা স্বামী

অনুমতি দিবা মাত্রই বিবাহ ভঙ্গ হইতে পারিত, তাহা হইলে এই কপটতার প্রয়োজন হইত না।

এই লিওর চরিত্রে বার্ণার্ড শ আর একটী কথা বলিতে চাহিয়াছেন; সেটী বহু-বিবাহের পক্ষের কথা। লিওর বিবাহভঙ্গ মঞ্জুর হইল। কিন্তু তিনি যে তার স্বামীকে ভালবাসেন না, এমন নহে। এখনও তিনি তার স্বাস্থ্যের জন্য চিন্তা করেন; তাঁর জিনিষপত্র গোছাইয়া রাখা হয় কি না, তিনি সময় মত ঔষধ ব্যবহার করেন কি না, ইত্যাদি প্রশ্ন করিতে এখনও ভুলেন না। বরং তিনি বলেন, 'আমি দুজনকেই কেন বিবাহ করিতে পারি না, আমি দুজনকেই ভালবাসি। আমার ইচ্ছা হয়, বহু পুরুষকে বিবাহ করি। রেজিনাল্ডকে আমি সর্ব্বদার জন্য চাই, সিঞ্জনকে কন্‌সার্টে ও থিয়েটারে যাবার সময় এবং সন্ধ্যাবেলা বেড়াবার সময় চাই। এবং বছরে এক আধ বার একজন কঠোর ঋষি-প্রকৃতির স্বামী পাইতে ইচ্ছা হয়; এবং দুষ্টামি করিবার জন্য একটা দুষ্ট, বোকা, ছোকরা স্বামী পাইলে মন্দ হয় না। দুষ্টামি আমার বেশী করিতে ইচ্ছা হয় না; কিন্তু যখন হয়, তখন একজন উপযুক্ত স্বামীর অভাবে ইহা ঘটে না, এই যা দুঃখ।"

একজন আটপৌরে, একজন পোষাকী, একজন রবিবারের জন্য, একজন অন্য কয় দিনের জন্য—ইত্যাদি রং-বেরঙের স্বামী না হইলে লিওর আর চলে না।

বয়সের সঙ্গে, স্বাস্থ্য-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে লোকের রুচির পরিবর্ত্তন হয়। যখন যেমন রুচি, সেরূপ স্বামী বা স্ত্রী গ্রহণ করিবার সুবিধা লোককে দেওয়া উচিত নহে, বার্ণার্ড শ' তাহা কখনও বলেন না। আর এই সুবিধা দিলেই লোকে প্রতিদিন পোষাকের মত স্বামী বা স্ত্রী পরিবর্ত্তন করিবে, এ আশঙ্কাও তিনি করেন না।

বরং এ সুবিধা থাকিলেই স্থায়ী গাঢ় প্রীতির জন্ম সম্ভব, ইহাই তাঁহার মত।

'পুত্রার্থং ক্রিয়তে ভার্য্যা'—সন্তানের উৎপত্তিই সমাজের দ্রষ্টব্য। বিবাহ তাহার উপায় মাত্র। কিন্তু শ' মনে করেন, সমাজ উদ্দেশ্যটী ভুলিয়া গিয়া একমাত্র উপায়ের উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছে। যে বিবাহ হইতে সুসন্তানের উৎপত্তি হয় না, শ' বলিতে চান, নিঃসঙ্কোচে তাহা ভাঙ্গিয়া দেওয়াই সমাজের পক্ষে হিতকর। এবং কয়লার খনি বা অন্যত্র যেমন মজুরেরা সমাজের উপকারার্থ কাজ করে, বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষ দ্বারাও তেমনই সমাজের উপকার হওয়ার কথা। অনিচ্ছায় যারা কাজ করে তাদের নিকট হইতে তেমন ভাল কাজ পাওয়া যায় না; অসন্তুষ্ট-চিত্ত দম্পতীও তেমনই সমাজকে যথোচিত কাজ দেয় না। সমাজের দেখা উচিত, যাহাতে প্রত্যেক দম্পতী সুখী থাকে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাহাকেও কোনও বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখাও যা, ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া কাহারও নিকট হইতে কাজ আদায় করার চেষ্টাও তাই। এইজন্য বিবাহের সৃষ্টি ও ভঙ্গ সহজ-সাধ্য করিয়া দেওয়া উচিত।

সংক্ষেপে—অতি সংক্ষেপে আমরা বিবাহ এবং পতি-পত্নীর অধিকার-অনধিকার সম্বন্ধে বার্ণার্ড শ'র মত ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। একজন বিশপের কন্যার বিবাহের দিনে, বিশপের গৃহে 'বিবাহ করা' নামক নাটকটীর ঘটনা ঘটিতেছে; সেইখানে বিবাহ সম্বন্ধে তর্ক হইতেছে, বিশপ স্বয়ং তাহাতে যোগ দিতেছেন, এবং বার্ণার্ড শ'রই মত ব্যক্ত হইবার সুবিধা দিতেছেন—যে কোন সমাজে ইহা অত্যন্ত বিসদৃশ ব্যাপার। বিশপ স্বয়ং একজন অজ্ঞাত-নামা স্ত্রীলোকের নিকট হইতে প্রেম-পত্র পান, এবং দাঁতের (Dante) বিয়েত্রিসের মত তাহাকে ভাল বাসিতেও প্রস্তুত—এ সব কথা বলিতে তিনি কুণ্ঠিত নন; যাহার বিবাহ

হইবে, বিশপের সেই কন্যা বিবাহ-ভঙ্গ কঠিন জানিয়া বিবাহ করিতে হঠাৎ নারাজ হন; এবং বিশপ স্বয়ং এইরূপ কঠোর দুশ্ছেদ্য বিবাহ-প্রথার বিরোধী;—বার্ণার্ড শ'র এই সব নাট্য-পদ্ধতি যে ইংলণ্ডের শিষ্ট সমাজ ক্ষমা করিতে চায় না, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। অবশ্যই নাটকটীকে হাস্য-রস-প্রধান করিয়া অপরাধের মাত্রা তিনি অনেক কমাইয়াছেন। কিন্তু নাটকে ব্যঙ্গচ্ছলে যাহা বলিয়াছেন, ভূমিকায় তাহাই স্থির মত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

বার্ণার্ড শ' যে নিতান্ত অকথ্য কথা বলিয়াছেন, তা নয়; নিতান্ত অসমীচীন প্রশ্ন তোলাই যে তাঁর অপরাধ, তা নয়। আর তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা যে সম্পূর্ণ নূতন, ইউরোপের অতীত ও বর্ত্তমান চিন্তার সহিত একেবারেই সম্বন্ধ-বিহীন,এরূপও নহে। প্লেটোর দার্শনিক চিন্তায়ও বিবাহ সম্বন্ধে অনুরূপ মতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ইব্‌সেন্, নীট্‌চে প্রভৃতি ইংলণ্ডের বাহিরের সাহিত্যিক ও দার্শনিকের প্রভাব তাঁহার উপর স্পষ্ট। তিনি যে সব সমস্যা তুলিয়াছেন, তাহা ইউরোপের সমগ্র নবীন সাহিত্যের—সমগ্র বিশ্ব-সাহিত্যের বিষয়। তথাপি তিনি অনেকের অপ্রিয়। তাহার কারণ, তিনি গায়ে পড়িয়া নিজেকে নীতি-বিরোধী, ধর্ম্ম-বিরোধী, সমাজ-বিদ্রোহী বলিয়া প্রচার করিতে চান। "চিকিৎসকের উভয়-সঙ্কট" নামক নাটকের নায়ক চিত্রকর লুই'র মুখ দিয়া তিনি বলাইতেছেন, 'আমি তোমাদের চরিত্র-নীতিতে বিশ্বাস করি না; আমি বার্ণার্ড শ'র শিষ্য।" তিনি যদি এ ভাবে গায়ে পড়িয়া, জোর করিয়া, লোকের চিত্তে আঘাত করিতে না চাহিতেন, তাহা হইলে তিনি এত অপ্রিয় হইতেন কিনা সন্দেহ।

তথাপি তাঁহার উদ্দেশ্য যে মহৎ একথা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে। প্রত্যেক স্ত্রী ও পুরুষ স্বাধীন, সজীব সতেজ হইয়া উঠুক;

নীরোগ, সবল, সুস্থ, সুখী লোকে দেশ পূর্ণ হইয়া যাউক; রোগ, শোক, দারিদ্র্য, ব্যভিচার, অধর্ম্ম, অনীতি দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হউক; ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম, নীতির নামে অনীতি, বিচারের নামে অবিচার—প্রভৃতি ভণ্ডামি যে সমাজকে আছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহা দূর হউক;—এমন কে আছে যে ইহা না চায়? বার্ণার্ড শ' নানা ভাবে এই আদর্শ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে চাহিয়াছেন; কৃতকার্য্য হন নাই, এ কথা কেহ বলিতে পারিবে না। তিনি যতই অপ্রিয় হউন না কেন, ইংলণ্ডের এবং কথঞ্চিৎ সমস্ত ইউরোপের সমাজে সত্য সত্যই যে সমস্ত প্রচ্ছন্ন পাপ রহিয়াছে, অতি নির্দ্দয় ভাবে সেগুলির প্রতি লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া তিনি জগতের হিতের চেষ্টাই করিয়াছেন।

অবশ্যই তাঁহার নির্দ্দিষ্ট প্রণালীই এই আদর্শ-সিদ্ধির ঠিক উপায় কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন চলে। বিবাহ-প্রথা উঠাইয়া দেওয়া, কিংবা ইতর জন্তুর সমাজে প্রচলিত অস্থায়ী যৌন সম্বন্ধের মত বিবাহ প্রচলিত করিয়া দেওয়াই যে সমাজের উন্নতির প্রকৃত পন্থা, সহজে আমরা তাহা বিশ্বাস করিতে চাহিব না। কিন্তু যে সমস্যা তিনি তুলিয়াছেন, ইউরোপকে আজ তাহা ভাবিতে হইতেছে, ইংলণ্ডও না ভাবিয়া পরিবে না। এই হিসাবে শ' আমাদেরও স্মরণের যোগ্য। এ সমস্যা আমাদেরও সমস্যা কি না সন্দেহ; কিন্তু তাহার ছায়া এ দেশের সাহিত্যেও পড়িয়াছে; সুতরাং বার্ণার্ড শ'কে আমরা একেবারে বাদ দিয়া পারি না।

অতঃপর অদ্যকার মত বিদায় গ্রহণ করিতে হয়। বার্ণার্ড শ' সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইল না। তিনি সাহিত্যিক—তাঁহার নাট্য-কৌশল, তাঁহার চরিত্র-চিত্রণ প্রভৃতি আমরা বাদ দিয়াছি; তাঁহার সামাজিক গবেষণার বিষয়ও অনেক অকথিত রহিল; তাঁহার অভিনব মতের সম্যক্

সমালোচনাও আমরা করিতে পারি নাই। তাঁহার মানস রাজ্যে কি সব কল্পনা-জীব বিচরণ করে, তাহারই কিঞ্চিন্মাত্র আভাস আমরা পাইতে চেষ্টা করিয়াছি। আজ এই পর্য্যন্ত।

বার্ণাড´ শ (২)।

কিছু দিন পূর্ব্বে আমি বার্ণার্ড শ' সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। প্রবন্ধটী প্রকাশ্যে পঠিত হইয়াছিল এবং যথারীতি প্রকাশিত হইয়াছে।* প্রবন্ধ পাঠান্তে যে সমালোচনার দস্তুর আছে, সেই উপলক্ষ্যে সভাস্থলে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, আমি শুধু বার্ণার্ড শ'র একটা দিকই দেখাইয়াছি;—প্রচলিত নীতির বিরুদ্ধে তিনি যে গুরু অভিযোগ আনিয়াছেন, তাহারই শুধু আলোচনা করিয়াছি, তাঁহার অপরাহত ভাঙ্গিবার চেষ্টারই শুধু বিবরণ দিয়াছি ; কিন্তু এই তীব্র বিরুদ্ধ সমালোচনার মধ্যেও, এই প্রবল ভাঙ্গিবার চেষ্টার ভিতরেও বার্ণাড´ শ'র গড়িবার একটা আকাঙ্ক্ষা আছে; অন্যান্য বহু কবি ও দার্শনিকের ন্যায় বার্ণাড´ শ'রও নূতন আদর্শের অনুযায়ী একটা নূতন, মহত্তর সমাজের সৃষ্টির,—একটা বলবত্তর মানবের সমষ্টি গড়িয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে ;—সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলি নাই। আমার প্রবন্ধের এই সমালোচনার ন্যায্যতা আমি স্বীকার করি। কিন্তু বার্ণার্ড শ' সম্বন্ধে আমার সকল কথা বলা হইল না, এই বলিয়াই আমি উপসংহার করিয়াছিলাম। তখন সময় ও স্থানের অভাবে যাহা অসম্পূর্ণ রাখিতে হইয়াছিল, এবার তাহা সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টা কিছুদূর অগ্রসর করিতে চাই।

প্রতিভা, আশ্বিন ১৩২৩

এই প্রসঙ্গে কাহারও কাহারও মনে যে একটা ভুল ধারণা জন্মিয়াছে, তাহাও অপনোদিত করা সঙ্গত মনে করি। সাহিত্যে, ইতিহাসে, দর্শনে, সর্ব্বদাই আমাদিগকে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন এবং অনেক সময় বিসদৃশ ও অদ্ভুত সব মতের আলোচনা করিতে হয়; কিন্তু একথা কেহ মনে করে না যে, যাহার মতের আলোচনা করা হয়, আলোচক তাহারই মত স্বীকার করেন। তথাপি বার্ণার্ড শ'র সব মতের সহিত আমার মতের ঐক্য আছে, এ ধারণা কিসে কাহারও কাহারও মনে ঢুকিল, বলিতে পারি না। বার্ণার্ড শ' যে সকল বিষয়ে চিন্তা করিয়াছেন, সে বিষয়গুলির সম্বন্ধে আমি কখনও ভাবিয়াছি, একথা বলিলে প্রবঞ্চনা করা হয়। সুতরাং এ সব বিষয়ে আমার নিজের কোন মত আছে কিনা, তাহা আমি নিজেই জানি না; কারণ, না ভাবিয়া কাহারও কোন মত হইতে পারে, এ বিশ্বাস আমার নাই।

আর, যে সমস্ত বিষয়ে আমি কিঞ্চিৎ চিন্তা কখনও করিয়াছি, সে সকল বিষয়েও বার্ণার্ড শ'র মতই আমার মত—একথা আমি কোথাও বলি নাই; কারণ, আমার নিজের মত বলিবার কোন প্রয়োজন বা সুযোগ সেখানে ছিল না। অতঃপর বোধ হয়, ইহা স্বীকৃত হইবে যে, 'অদ্ভুত, 'বিদ্রোহী'—ইত্যাদি বিশেষণ যদি কাহারও প্রাপ্য হয়, তবে সে আমার নয়, বার্ণার্ড শ'র।

প্রশ্ন হইতে পারে, বর্ব্বরোচিত এই সকল মতের অবতারণায় কি লাভ? জীবনের পথে আমরা কোথায় ঠেকিয়াছি? আমাদের সমাজ কি চলিতেছে না? আমার উত্তর, কোন প্রয়োজন আছে কি না জানি না; কিন্তু সাহিত্যের সকল চেষ্টাই স্পষ্ট প্রয়োজনের জন্য হয়, তাহা বলিতে পারি না। জানিলে কি লাভ হইবে, তাই ঠিক করিয়া যদি মানুষ জ্ঞানের অনুসরণ করিত, তাহা হইলে এত স্কুল কলেজ, এত পুস্তকালয়,

এত বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন আবশ্যকতা থাকিত, তাহা ত বোধ হয় না। খ্রীষ্ট জন্মিবার পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে এথেন্সে কে কি বলিয়াছিল, কিংবা খ্রীষ্ট জন্মিবার ১০৬৬ বৎসর পরে হেষ্টিংস্ নামক স্থানের লড়াইয়ে কারা কেন জিতিয়াছিল,—এ সব খবর জানিলে সস্তায় চাউল কিনা যায়, এমন ত নহে ; আর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের জর্ম্মেণ সাহিত্যের বিশিষ্টতা কি—সে খবরে কাহারও ব্যবসার সুবিধা হয়, এমতও নয়। তথাপি মানুষ এ সকলের তত্ত্ব রাখে এবং রাখিবে। এ সকলের আলোচনায় যাহা লাভ হয়, তার চেয়ে বেশী লাভ বার্ণার্ড শ'র আলোচনায় আমরা কেন আশা করি, তাহা জানি না।

বার্ণার্ড শ'র মত তাঁহার নিজের দেশেও গৃহীত হয় নাই ; কোনও দিন কোথাও হইবে কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ করা চলে, যদিও ভবিষ্যৎ এতই অনিশ্চিত যে জোর করিয়া কিছু বলা যায় না। তথাপি, এ সকলের আলোচনা নিষিদ্ধ হইলে ইউরোপের ইদানীন্তন সাহিত্যের বিশেষ কিছু বলিবার থাকিত কি না সন্দেহ। বার্ণার্ড শ'র সর্ব্ব প্রধান সমস্যা বিবাহ ; এই বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা আজ ইউরোপের সাহিত্যে এত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, ইংলণ্ডেরই অন্যতম নাট্যকার, সম্মানিত স্যর আর্থার পিনেরোর নাটকেও তাহার স্পষ্ট প্রতিধ্বনি রহিয়াছে। অবশ্যই, সকলের সমাধান কখনও এক হইবে না ; কিন্তু প্রশ্ন যে উঠিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

শাস্ত্রে শ্রদ্ধাবান্ কেহ কেহ বলেন, এ সকলের চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গিয়াছে ; ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের সনাতন নিষ্পত্তির উপরে বাক্য প্রয়োগ করিতে যাওয়া অর্ব্বাচীনতার লক্ষণ। হইতে পারে ; কিন্তু এই প্রবল তুফানের ধাক্কা যে নিজেদের ঘরের কোণেও লাগিতেছে। কোন্‌টা অর্ব্বাচীনতার লক্ষণ,—ইহা সামলাইতে চেষ্টা করা, না, ইহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা ?

ইউরোপের হয় ত মানসিক স্বাস্থ্য বড় ভাল নয়। এমন সব প্রশ্ন সে দেশের সাহিত্যে আজ উঠিতেছে, এমন সব চিত্র তথায় আজ অঙ্কিত হইতেছে, যাহা পূর্ব্বে কখনও কাব্য-কলার বিষয় বলিয়া গৃহীত হয় নাই। শুধু ইংলণ্ডে নয়, ফ্রান্স, জার্ম্মেণী, নরওয়ে, রুশিয়া, সর্ব্বত্রই—য়্যানাতোল ফ্রান্স, স্যুডারমান, ইব্‌সেন্‌, টলষ্টয় প্রভৃতি অনেকেই ত প্রচলিত রীতিনীতিব বিরুদ্ধে একটু আধটু ইঙ্গিত করিয়াছেন। কেহ বা কৌতুকচ্ছলে, কেহ বা উপদেশ-চ্ছলে, কেহ বা বিদ্রোহীর পরিপূর্ণ বিদ্বেষ-বুদ্ধি লইয়া শরাসনে জ্যারোপণ করিয়াছেন, এবং কাব্যের তূণীর হইতে বিশেষণ-শরজালে সমাজকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। আমরা এ সকলের একেবারেই কোন খবর না রাখিয়া পারি কি?

আর, সব বিষয়েই যদি চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া থাকিত, তাহা হইলে সাহিত্য এত দিন কি নিয়া বাঁচিয়া আছে? মানুষের সেই চিরন্তন সুখদুঃখ—তাহার সেই সনাতন আকাঙ্ক্ষা, আবেগ, সেই আশা, নৈরাশ্য—এ সকল ত হোমার বাল্মীকিতে প্রচুর প্রকাশ লাভ করিয়াছে! মানুষের সাহিত্য-চেষ্টা তথাপি সেখানেই শেষ হয় নাই কেন? গেটে-সেক্সপীয়র, কালিদাস-ভবভূতির পরে যদি মানুষের আর কিছু বলিবার ও ভাবিবার না থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবীর রঙ্গ-মঞ্চের ভূমিতে এত দিন আলুর চাষ হইত; কাণ্ট-হেগেল বা কণাদ-গোতমের পরে যদি মানুষের আর কিছু জিজ্ঞাস্য না থাকিত, তাহা হইলে আর অয়কেন-বার্গসোঁর কথা আমাদিগকে শুনিতে হইত না। এত সব চেষ্টার পরে যদি মানুষের আর কিছু ভাবিবার ও করিবার না থাকিত তাহা হইলে এত দিন মানুষের ইতিহাসের শেষ অধ্যায় লিখিত হইয়া যাইত এবং মানবের জীবনে শেষ দাঁড়ি পড়িত। কিন্তু ভবিষ্যতে যত দূরই আমরা দৃষ্টিপাত করি না কেন, এই চরম সীমার সাক্ষাৎ ত কোথাও পাওয়া যায় না।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, বার্ণার্ড শ’ প্রভৃতির সমাজ ও নীতি সম্বন্ধে, বিশেষতঃ বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক ব্যাপার সম্বন্ধে যে সব বিকট মত, তাহার আলোচনায় অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্টের সম্ভাবনা নাই। স্বীকার করি, সে সব মত কার্য্যে পরিণত করিলে আপাততঃ নিশ্চয়ই অনেক বিভ্রাট ঘটিবে এবং হয় ত বা অন্তিমেও ঘোরতর অনিষ্ট হইতে পারে; কিন্তু তাহা জানিলেই যে মানুষের সমাজ ভাঙ্গিয়া যাইবে, এমন ত মনে হয় না। যদিই এমন ভঙ্গুর কোন সমাজ থাকে, তবে সে সমাজে বাস্তবিক কোন বন্ধন আছে কি? পশুপক্ষীর সমাজে জীবন-ব্যাপী বিবাহ বন্ধন নাই, একথা কে না জানে? তাহাতে ত মানুষের সমাজ টপকাইয়া পড়ে নাই। ইউরোপীয় সমাজে, মুসলমান সমাজে বিধবাদের বিবাহ হয়, একথা হিন্দু সমাজের সকল বিধবাই এখন জানেন; কিন্তু কই, পুনর্বিবাহের জন্য বিধবারা ত এখন পর্য্যন্ত কোন সমিতি গঠন করেন নাই। ইউরোপীয় রমণী অবরোধ-প্রথার অধীন নয়, একথাও আমরা অনেক কাল জানিতেছি; এবং এই অবরোধের বিরুদ্ধে আন্দোলনও ত হইয়াছে; কিন্তু ফল হইয়াছে কি? যাহা অন্যত্র কার্য্যে দেখিয়াও আমাদের সমাজ গ্রহণ করে নাই, সেরূপ কোনও একটা বিষয়ে একটু তথাকথিত অগ্রসর মত জানিতে পারিলেই অগ্নি-সন্নিকর্ষে মাখনের মত আমাদের সমাজ গলিতে আরম্ভ করিবে, এ ভয়ের কোন হেতু আছে কি?

হয় ত চারিদিকে শত শত ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়া আমরা একটু চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছি, সহজেই ভীত হইয়া পড়ি; কিন্তু তথাপি বার্ণার্ড শ’র দুই একটী উক্তির আলোচনায়ই আমাদের সমাজে নূতন দুর্দ্ধর্ষ বিপ্লবের আবির্ভাব হইবে, এ আশঙ্কার কোন কারণ নাই। বরং অন্যান্য আলোচনার ন্যায় এ আলোচনায়ও লাভ আছে; যাহা খাঁটি সত্য, তাহাকে নিকটে পাওয়া যাইবে। সকল

সমাজেরই কর্ত্তব্য, ব্যক্তির চিন্তা ও রসনাকে সংযত না করিয়া তাহার ক্রিয়া সংযত করা। যে যাহা খুসী ভাবুক এবং নির্ভীক চিত্তে তাহা প্রকাশ করুক, তাহাতে সমাজের কোন অনিষ্ট হইবে না; বরং নির্ভীক আলোচনার সুফল সমাজ পাইবে। কিন্তু কেহ হঠাৎ নূতন কোন নীতি অবলম্বন করিতে চাহিলে, নূতন পদ্ধতিতে দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ করিতে চাহিলে, সমাজ বাধা দিতে পারে। কেহ যদি বলে যে, দেশের ভূমিতে কাহারও ব্যক্তিগত অধিকার থাকা উচিত নয়, আর অমনই যদি কোন সমাজ ধর-পাকড় করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সে সমাজের স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু এই মত অনুসরণ করিয়া কেহ যদি জমিদারের জমীদারী লুট করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে সমাজের কি করা কর্ত্তব্য, তাহা আমরা জানি। সুতরাং বার্ণার্ড শ'র মত কেহ কার্য্যে অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিলে আমরা সতর্ক হইব; শুধু আলোচনায় কোন ভয়ের কারণ নাই। অবশ্যই, আলোচনার ফলে যদি সকলেই কিংবা বেশীর ভাগ লোকই স্বীকার করে যে, ইহা অত্যন্ত সমীচীন মত এবং কার্য্যে অনুসৃত হওয়া আবশ্যক, তাহা হইলে আর উপায় নাই। কিন্তু আমাদের ভরসা করা উচিত যে, সমাজের আচার অত সহজে ভাঙ্গে না। তা যদি হইত, তবে যীশুকে ক্রুশে মরিতে হইত না মহম্মদকে মদিনায় পলাইতে হইত না, এবং ইউরোপের এত সব লোককে ধর্ম্মমতের জন্য আগুণে পুড়িয়া মরিতে হইত না। সুতরাং সমাজের আচার সম্বন্ধে একটা নূতন দিক হইতে একটু আলোচনা করিতে আমরা সাহস করিতে পারি।

সমাজ ব্যক্তির সমষ্টি। কিন্তু যাহারা একত্রিত হইয়া সমষ্টির সৃষ্টি করে, তাহাদের গণনা একাধিক প্রকারে হইতে পারে। বাঁশের

ঝাড়কে কেহ কঞ্চির সমষ্টি মনে করে না; ইহা বাঁশেরই সমষ্টি, যদিও কঞ্চির সংখ্যা বাঁশের সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী। এখানে এক একটী বাঁশ যেন কঞ্চি-পরিবারের পিতা; তাহাকে আশ্রয় করিয়া যেন কঞ্চি-সমূহ একটী ক্ষুদ্রতর সমষ্টির সৃষ্টি করিয়াছে। মানুষের সমাজকেও তেমনই এক সময়ে ব্যক্তির সমষ্টি মনে না করিয়া পরিবারের সমষ্টি মনে করা হইত; বাঁশকে আশ্রয় করিয়া তার কঞ্চিগুলি যেমন একটী ক্ষুদ্র সমষ্টি সৃষ্টি করে, তেমনই পরিবারের পিতাকে আশ্রয় করিয়া একাধিক ব্যক্তি যে একটী ক্ষুদ্র সমষ্টির সৃষ্টি করে, সমাজকে ব্যস্ত ভাবে দেখিবার সময় সেই ক্ষুদ্র সমষ্টিকেই এক ধরা হইত। রোমের প্রাচীন আইনে আমরা এই প্রকার গণনার সাক্ষাৎ পাই। পরিবারকে 'সাম্রাজ্যের ভিতরে সাম্রাজ্য' (*Imperium in Imperio*) মনে করিয়া 'পরিবারের পিতাকে' (*pater familias*) রোমক আইন পরিবারের অন্য সকলের উপর দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা করিয়া দিয়াছিল। আমরা—যাহারা গোত্র-প্রবরের হিসাব এখনও হারাই নাই—আমরা জানি পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তি কেমন সমবায় সম্বন্ধে সম্বদ্ধ।

কিন্তু সমাজ সম্বন্ধে আধুনিক গবেষণায়, ইংলণ্ডে বিশেষতঃ, সমাজকে পরিবারের সমষ্টি মনে না করিয়া ব্যক্তির সমষ্টি মনে করাই রীতি। রুশো এবং হবস্ প্রভৃতি দার্শনিক সমাজ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার মূলেও এই ধারণা দেখিতে পাই যে, সমাজ ব্যক্তির সমষ্টি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, পরিবারের সমষ্টি হইতে নয়। ইহা হইতে মনে হয়, যেন পরিবারের সৃষ্টি আগে না হইয়া সমাজের সৃষ্টিই আগে হইয়াছে; এবং সমাজ সৃষ্ট হইয়া যেমন বিশ্ব-বিদ্যালয়, এসিয়াটিক সোসাইটী, প্রভৃতির উৎপাদন করিয়াছে, তেমনই কোনও এক অতীত যুগে পরিবারেরও উৎপাদন করিয়াছিল। ইহার জন্য হয় ত সমাজকে

বিশেষ বেগও পাইতে হয় নাই; একদা সংযুক্ত স্ত্রীপুরুষকে আমরণ কিম্বা দীর্ঘকাল সম্বদ্ধ থাকিতে এবং সন্তান-পালনে পরস্পরের সহায়তা করিতে আদেশ করিয়া অতি সহজেই সমাজ পরিবারের উৎপাদন করিতে পারিয়াছিল। এইরূপে পরিবার উৎপাদনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, ব্যক্তির সৃষ্টি, তাহার লালন-পালন, ও তাহার শিক্ষার সুব্যবস্থা করা।

এই দুইটী মতের কোন্‌টী সমীচীন এবং ইতিহাসের দিক্ হইতে কোন্‌টী সত্য, সে বিচার এখানে অসম্ভব। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, সমাজ সম্বন্ধে ইদানীন্তন ধারণার মধ্যে ব্যক্তির প্রাধান্যই বেশী, তথাপি পরিবার এবং পিতার আধিপত্য একেবারে বিস্মৃত হয় নাই। এখনও ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত পুত্রকে পিতার ইচ্ছার অধীন রাখিবার জন্য সমাজের আইনে বিধান রহিয়াছে। ইহার কারণ স্পষ্ট। মানব শিশু এমন অশক্ত অবস্থায় এ পৃথিবীতে আসে যে, পিতা মাতার যত্ন না হইলে সে কখনও সমাজের অংশ, ব্যক্তিরূপে পরিণতি লাভ করিতে পারে না। এবং পরিণত না হওয়া পর্য্যন্ত সমাজ তাহাকে আপনার স্বতন্ত্র অংশ বলিয়াও স্বীকার করিতে পারে না।

পরিবার সম্বন্ধে এই কয়টী কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, নইলে বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনায় ভুল হইতে পারে। সমাজের চক্ষে বিবাহের প্রয়োজন ব্যক্তির উৎপাদন; এবং বিবাহ-বন্ধনের স্থায়িত্ব ও পরিবারের সত্তা সমাজ যে স্বীকার করে তাহার কারণ, ইহা দ্বারা ব্যক্তির লালন ও শিক্ষার সুব্যবস্থা হয়। উপন্যাসে হইতে পারে, কিন্তু জীবনের নাটকে বিবাহ শেষ অঙ্ক নয়, একটী বিষ্কম্ভক মাত্র; এবং ইহার পরেই জীবনের বাস্তবিক প্রধান ঘটনাগুলির আবির্ভাব হয়। 'পুত্রার্থং ক্রিয়তে ভার্য্যা'—এই এক কথায় সমাজ সমস্ত নাটক উপন্যাসের সারাংশ

সঙ্কলন করিয়াছে এবং বিবাহ সম্বন্ধে নিজের চূড়ান্ত মত প্রকাশ করিয়াছে।

বিবাহ স্ত্রীপুরুষের মিলনের একটী বিশিষ্ট প্রকার। 'একটী বিশিষ্ট প্রকার' বলিতেছি এই জন্য যে, ইতরপ্রাণীর মধ্যে এবং অতি নিম্নস্তরের মানুষের মধ্যেও 'বিবাহ' বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহার অস্তিত্ব নাই, অথচ সেখানেও স্ত্রীপুরুষের মিলন হয়। এবং শুধু বিবাহে নয়, স্ত্রীপুরুষের সর্ব্বপ্রকার মিলন হইতেই ব্যক্তির উৎপত্তিই প্রকৃতির অভীপ্সিত।

কিন্তু বিবাহ নামক যে সামাজিক প্রথার সহিত আমরা পরিচিত এবং যাহা হইতে, শুধু ব্যক্তির নয়, পরিবারেরও সৃষ্টি হয়, তাহার আরও একটা ফল আছে। প্রকৃতির অভীপ্সিত উদ্দেশ্যের সিদ্ধির জন্য বিবাহ না হইলেও চলে; কিন্তু বিবাহ দ্বারা এই উদ্দেশ্য ত সিদ্ধ হয়ই, তা ছাড়া, মানুষের চিত্তেরও উন্নতি হয়। বিবাহিত জীবনে যে একটা পবিত্রতা, যে স্নেহপ্রেম, যে সহানুভূতি ও পরস্পরের হিত-চিকীর্ষার উৎপত্তি হয়, তাহার মূল্যও কম নয়। বিবাহ—এবং তাহার ফল পরিবার, এই সকল উচ্চ চিত্তবৃত্তির উৎপাদনে ও পোষণে সহায়তা করে বলিয়াই সকল দেশের শাস্ত্রই বিবাহকে এত পবিত্র মনে করে। নরনারীর যে বিশিষ্ট প্রকারের মিলন বিবাহে পর্য্যবসিত হয়, তাহার ফলে কেমন সব চিত্তবৃত্তির উন্মেষ ও মার্জ্জনা সম্ভব, মানবের সমগ্র সাহিত্য-কলা তার সাক্ষী। কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে—এই বিবাহকে কেন্দ্র করিয়া মনুষ্যের কত মহীয়সী চিন্তা, কত গরীয়সী চিত্ত-বৃত্তিই না প্রকাশ লাভ করিয়াছে! শুধু প্রকৃতির উদ্দেশ্যের সিদ্ধির জন্য বিবাহই একমাত্র পন্থা নয়; শুধু পরিবার প্রতিষ্ঠাই বিবাহের একমাত্র লক্ষ্য নয়; মানুষের চিত্তকে সংযত ও পবিত্র করা,

তাহার বিবিধ মূল্যবান্ ভাবের স্ফুরণে সহায়তা করাও বিবাহের অন্যতম লক্ষ্য, এবং বোধ হয় প্রধান লক্ষ্য।

কিন্তু ইউরোপে আজ বিবাহ নিয়া যে আলোচনা হইতেছে, তাহাতে এই প্রধান লক্ষ্যটাই প্রায়ই চাপা পড়িয়া যায়। বার্ণার্ড শ'র আলোচনায় এই ত্রুটী অত্যন্ত স্পষ্ট। ইঁহারা যে উদ্দেশ্যে বিবাহের সংস্কার চাহিতেছেন তাহা আর কিছু নয়,—সুস্থ ও সবল ব্যক্তির সৃষ্টি, সুস্থ ও সবল পরিবারের প্রতিষ্ঠা, এবং সমাজের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ও সবলতার পুনরানয়ন। 'পুনরানয়ন'—কেন না, ইঁহাদের কাহারও কাহারও মতে এক সময়ে মানুষের এই স্বাস্থ্য ও সবলতা ছিল, কিংবা মানুষ তাহা পাইবার পথে যাইতেছিল; এমন সময় সমাজের বিধি সে পথের কণ্টক হইয়া পড়িয়াছিল।

এই যে আদর্শ সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার দার্শনিক পিতা নীট্চে। কিন্তু নীট্চেরও দুই সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে প্লেটোও এইরূপ আদর্শের কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার মত যদি কেহ কাব্যে উপস্থাপিত করিতেন, তাহা হইলে না জানি লোকে কি বলিত! বার্ণার্ড শ' ত তবু বিবাহের কথঞ্চিৎ স্থায়িত্ব অনিচ্ছা করেন না। কিন্তু প্লেটোর আদর্শ-রাষ্ট্রে বিবাহ নামক ব্যাপারের কোনরূপ গন্ধও থাকিবে না। সেখানে শুধু স্ত্রীলোক ও পুরুষ এবং অবশ্য সন্তানও থাকিবে; কিন্তু কোনও নারী কোনও ব্যক্তিবিশেষের স্ত্রী নয়, কোনও পুরুষ কোনও নারী বিশেষের স্বামী নয়, এবং কোনও শিশু কোনও দম্পতীবিশেষের নিজস্ব নয়; সকলই শুধু রাষ্ট্রের। রাষ্ট্রই নরনারীর মিলন ঘটাইয়া দিবে এবং উৎপন্ন সন্তানের পালন ও শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিবে। গোশালায় বৃষ ও ধেনুর মধ্যে যে সম্বন্ধ থাকে, তাহার চেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এই রাষ্ট্রে নর-নারীর মধ্যে থাকিবে না।

(প্লেটোর প্রসঙ্গে মহাভারতের ঔদ্দালকি শ্বেতকেতুর উপাখ্যান মনে করা যাইতে পারে।—"পক্কান্নমিব রাজেন্দ্র! সর্ব্বসাধারণাঃ স্ত্রিয়ঃ।")

প্লেটোর এই দার্শনিক স্বপ্নের যে উদ্দেশ্য, নীট্‌চের দর্শন ও বার্ণার্ড শ'র কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। সুতরাং শ' যে এক 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি' বাক্যের অবতারণা করিয়াছেন, তা নয়। তাঁর চিন্তারও পিতা পিতামহ রহিয়াছে—একটা পরম্পরায় তাহা তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। তিনি এক জায়গায় বলিয়াছেন ;—"যে সকল লেখকের মতের সহিত আমার মতের সাদৃশ্য আছে, তন্মধ্যে বুনিয়ান, ব্লেক্, হোগার্থ এবং টার্ণার্ (ইংলণ্ডের প্রাচীন লেখকদের মধ্যে পৃথক ভাবে এবং সর্ব্বোপরি ইঁহারা) এবং গেটে, শেলী, শোপেন্‌হর্, ওয়াগ্নার্, ইবসেন্, মরিস্, টল্‌ষ্টয়, এবং নীট্‌চে ; এই সকল লেখকদের সমাজ সম্বন্ধে যে একটা বিশিষ্ট অনুভূতি ছিল তাহা আমার মতের সদৃশ।" বুনিয়ান্ ও নীট্‌চের মধ্যে আপাত-দৃষ্টিতে অনেক প্রভেদ দেখা গেলেও, বার্ণার্ড শ' বলেন, এ উভয়ের সিদ্ধান্ত পৃথক্ নয়, শুধু প্রকাশের ধরণই ভিন্ন। বুনিয়ান্ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের ভাষায় যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, নীট্‌চে তাহাই ডারুইন্ ও শোপেন্‌হরের পরবর্ত্তী যুগের ক্রমবিকাশ শাস্ত্রের ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন।

মনে হয়, বার্ণার্ড শ' অত্যন্ত প্রকাণ্ড দাবী করিতেছেন। তিনি যাঁহাদের সহিত সাদৃশ্য দাবী করিতেছেন তাঁহারা সকলেই ইউরোপের সাহিত্যে শিষ্ট ও সম্মানিত শিল্পী। কিন্তু তাঁহাদেরও পরস্পরের মধ্যে প্রচুর প্রভেদ রহিয়াছে ; এবং বুনিয়ান্ বা গেটের মত লেখকের সহিত তাঁহার সাদৃশ্য কোথায়, স্পষ্ট করিয়া তিনি তাহা দেখান নাই। অবশ্যই সাদৃশ্য যে খুঁজিয়া নেওয়া না যায় তা নয় ; এবং এই দাবী যে তিনি করিতেছেন, তাহাতেই প্রমাণিত হয়, তিনি সম্পূর্ণ অভিনব

মতের অবতারণা করিতেছেন, এ বিশ্বাস তাঁর নাই; তবে, তাঁর প্রকাশের ভঙ্গিটা অত্যন্ত স্বতন্ত্র এবং তাঁহার ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক।

বুনিয়ান গেটের সহিত বার্ণার্ড শ'র সাদৃশ্য তত স্পষ্ট না হইলেও প্লেটো এবং বিশেষ ভাবে নীট্চের সহিত তাঁহার সাদৃশ্য আমরা মানিয়া লইতে বাধ্য। দার্শনিক ও নাট্যকারের মধ্যে এই যে সাদৃশ্য, তাহা ভাষার সাদৃশ্য নয়, প্রকাশ-ভঙ্গির সাম্য নয়,—ইহা আদর্শের ঐক্য। এবং এই আদর্শটা যে কি তাহাও সংক্ষেপে আমরা পাইয়াছি। কিন্তু ইহা লাভ করিবার উপায় কি?

প্লেটো একটা উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, নীট্চেও করিয়াছেন, বার্ণার্ড শ' ও করিয়াছেন। একটা নূতন কিছু গড়িতে হইলে, ভাঙ্গিতেও হয় প্রচুর; এবং এই ভাঙ্গার কথা এত জোরে বলেন বলিয়াই বার্ণার্ড শ' আমাদের রুচিতে এত আঘাত করেন। সমাজকে নূতন করিতে হইলে, তাহার দুইটী প্রধান বিধানেরই পরিবর্ত্তন করিতে হইবে:— সমাজে ব্যক্তির উৎপত্তির বিধান অর্থাৎ বিবাহ, এবং সমাজের স্থিতির বিধান অর্থাৎ সমাজের ধন-বিভাগের বিধান। আমরা দেখিতে পাই, তাঁহার প্রায় সকল গ্রন্থেই বার্ণার্ড শ' এই দুইটীরই কথা উত্থাপন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে প্রচলিত বিবাহ-প্রথার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে; এবং যে ধন-বিভাগের বিধান অনুসারে একজন টাকা খরচ করিবার উপায় পায় না, আর একজন টাকার অভাবে না খাইয়া মরে, তাহারও পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। এই দুই প্রণালীই আমাদের পূর্ব্ব প্রবন্ধে অনালোচিত, তাঁহার অন্যতম প্রধান-গ্রন্থ এবং কাহারও কাহারও মতে সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ, 'মানব ও অতি-মানব' (Man And Superman) নামক নাটকে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থে অর্থ-বিভাগের কথাটা তত স্পষ্ট না হইলেও উঠিয়াছে, এবং প্রধানতঃ শ্রেষ্ঠ-মানব কি তাহাই

তিনি বলিতে চাহিয়াছেন। কিসে সমাজে এইরূপ শ্রেষ্ঠ মানুষের প্রাচুর্য্য হইতে পারে, তাহার বিষয়েও কিছু যে বলিতে চান নাই এমন নয়, কিন্তু ততদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন কিনা সন্দেহ।

নাটক খানার গল্পাংশ এই। মিঃ ট্যানার্ নামক এক যুবক 'বিদ্রোহীর হস্ত-পুস্তিকা এবং পকেট-বন্ধু'—(Revolutionists' Hand-book and Pocket-companion) নামক একখানা গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থখানার ভিতরে কি আছে, তাহা রঙ্গমঞ্চে কোথাও না আসিলেও সমস্ত গ্রন্থ খানা নাটক-খানার সহিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই বইয়ে বার্ণার্ড শ'র ই নিজের মত ব্যক্ত হইয়াছে; সুতরাং দুই একটী উক্তি উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক নয়:—"বিদ্রোহী বলি তাকেই, যে সমাজের বর্ত্তমান বিধান সব পরিত্যাগ করিয়া একটা নূতন স্থিতি-বিধানের পরীক্ষা করিতে চায়।" "সেই শ্রেষ্ঠ মানব নারীর গর্ভে পুরুষের ঔরসেই জন্ম গ্রহণ করিবে।" সমাজের উচ্চ নীচের মধ্যে বিবাহের যে বাধা আছে, তাহা দূর করিতে হইবে; সকল পুরুষকেই শুধু ভবিষ্যৎ পিতা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে; এবং এই জন্য সর্ব্বপ্রকার সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন, সুতরাং ধনের উপর ব্যক্তিগত অধিকার উঠাইয়া দিতে হইবে, ইত্যাদি। ৬০ পৃষ্ঠার অধিক দীর্ঘ একখানা পুস্তিকা। এই পুস্তিকার গ্রন্থকার মিঃ ট্যানার যে একটা উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও একটু অনুধাবনের যোগ্য। ইনি এম, আই, আর, সি (M. I. R. C) অর্থাৎ 'অলস ধনী শ্রেণীর একজন' (Member of the Idle Rich Class). বলা অনাবশ্যক, ইহাঁর চরিত্রে বার্ণার্ড শ' নিজের আদর্শ ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন এবং ইহাঁরই কথায় এবং কার্য্যে সেই আদর্শ লাভের প্রণালী নির্দ্দেশও করিতে চাহিয়াছেন।

ইনি, বর্ত্তমানে প্রচলিত বিবাহ-বিধানের বিরোধী, সুতরাং বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক। বিবাহ একটা ফাঁদ, একটা কয়েদ; যে ইহাতে পড়ে, তথা-কথিত স্নেহ-ভালবাসার দৌরাত্ম্যে সে অভিভূত হইয়া পড়ে; সুতরাং তাহার শারীরিক ও মানসিক সর্ব্ববিধ উন্নতির পথে বাধা পড়িয়া যায়। তাঁহার এই প্রকার মত সত্ত্বেও অজ্ঞাতসারে তাঁহার চারিদিকে এই ফাঁদ ঘনাইয়া আসিতেছিল।

তাঁহার এক বন্ধু-কন্যার, তাঁহার এক বাল্য-সঙ্গিনীর পিতৃবিয়োগ ঘটিয়াছে। মৃত বন্ধুর উইল মতে অন্য এক ব্যক্তির সহযোগে তিনি এই কন্যার অভিভাবক নিযুক্ত হইয়াছেন। এই দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম মিঃ র‍্যাম্‌সডেন। ইনি ট্যানারের বিদ্রোহিতার একান্ত বিরোধী, সুতরাং ট্যানারের সহিত একযোগে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইবেন, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। কাজেই সেই বালিকা য়্যানিকে জিজ্ঞাসা করা হইল, ট্যানার ও র‍্যাম্‌স্‌ডেনের মধ্যে সে কাহাকে অভিভাবক স্বরূপ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। সেয়ানা বালিকার মৃত পিতার ইচ্ছার প্রতি সম্মানেচ্ছা জাগিয়া উঠিল। র‍্যাম্‌স্‌ডেনকে সে 'ঠাকুরদা' ডাকিত; এই ঠাকুরদার প্রতি ভালবাসায়ও তার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। সুতরাং র‍্যাম্‌স্‌ডেন আর এড়াইতে পারিলেন না; ট্যানারকে সহযোগী রূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।

এই য়্যানির প্রেমে আর একজন 'পাগল-পারা' হইয়া আছেন; তাঁহার নাম অক্‌টেভিয়াস্‌। ইনি একটু কাব্যামোদী লোক; ভাবের বন্যায় ইঁহার হৃদয় ভরপুর। প্রেমের, এবং প্রেমের পরিণাম বিবাহের সুখ-স্বপ্নে তাঁহার কবি-হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া আছে। রমণী-সুলভ কোমলতায় তাঁর চরিত্র পূর্ণ। সকলেই তাঁকে একটু অনুকম্পা-মিশ্রিত স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকে। য়্যানিকে পাইবেন কিনা এই সন্দেহে

তাঁর হৃদয় দোলায়মান; য়্যানি একটু হাসিয়া কথা কইলে বসোরার গোলাপগন্ধে তাঁর প্রেমিক হৃদয় মাতোয়ারা হইয়া যায়; য়্যানি অন্যের প্রতি একটু বেশী নৈকট্য দেখাইলে তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে। ইনি ট্যানারের কাছে স্বীকার পাইলেন যে, য়্যানিকে নায়িকা-রূপে কল্পনা করিয়া একটা প্রকাণ্ড কাব্য লিখিবার সাধ তাঁর আছে। ট্যানার তার স্বভাবসিদ্ধ রকমে উত্তর করিল, 'সাবধান, য়্যানি তোমাকে গিলিয়া ফেলিবে।' তার পর অনেক রকমে বুঝাইবার চেষ্টা হইল; রমণীর প্রেমে পড়া আর নিজের বিনাশ ইচ্ছা করা একই। কিন্তু অক্‌টেভিয়াসের কবিহৃদয় তাহাতে প্রবুদ্ধ হইল না।

ট্যানার তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, রমণীর প্রেম মাকড়সার জাল। মাকড়সা যেমন মক্ষিকাকে বলিয়াছিল 'আমার বৈঠকখানায় একটু এস না!'—রমণীও তেমনই আকার ইঙ্গিতে, হাসির হিল্লোলে, কায়ার লাবণ্য-ছটায়, অপাঙ্গের নিপুণ চাহনিতে পুরুষকে বলে 'ওগো, আমার প্রেমে একটু পড় না!' এবং মক্ষিকাকে আহ্বান করায় মাকড়সার যেমন একটা গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল, হাবে ভাবে পুরুষকে অভিনন্দন করায়ও রমণীর তেমনই একটা উদ্দেশ্য আছে। রমণী চায় সন্তান, সে চায় নিজের মাতৃত্বকে ফুটাইয়া তুলিতে; তাই ত পুরুষের আহ্বান। সুতরাং রমণীর প্রেমে পড়া অর্থ পরের কাজে নিজকে ব্যয়িত করা। "পুরুষ ছাড়া যদি রমণীর চলিত, এবং পুরুষ যদি রমণীর সন্তানের জন্য খাদ্য সংগ্রহ না করিয়া বরং সংগৃহীত খাদ্য খাইয়া ফেলিত, তাহা হইলে মাকড়সা এবং মৌমাছিরা যেমন তাহাদের সন্তানের পিতাকে সংহার করে, রমণীরাও তেমনই আমাদিগকে শেষ করিয়া ফেলিত।" ট্যানারের মতে নারীর চরম পরিণতি মাতৃত্বে; মাতৃত্বেই নারীত্বের আরম্ভ এবং মাতৃত্বেই তার অবসান।

এবং পুরুষকে যে নারী গ্রাহ্য করে, তাহার কারণ সে এই মাতৃত্ব-বিকাশের সহায়।

কিন্তু এত সব দার্শনিক ব্যাখ্যায়ও কবি অক্টেভিয়াসের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইল না। ট্যানারের অনিচ্ছা নয় যে, য়্যানি ও অক্টেভিয়াসের বিবাহ হয়। কিন্তু এই যে সকল প্রকার স্নেহ-ভালবাসারূপ দৌর্ব্বল্যের অতীত, দেহে ও মনে সুস্থ ও সবল ট্যানার—ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া জননী হইবার আকাঙ্ক্ষা য়্যানির হৃদয়ে জাগিয়া উঠিতেছিল। য়্যানির মা অক্টেভিয়াসকে স্নেহ করেন, কিন্তু জামাই চান ট্যানারকে। এই ঘটনা-চক্রে শেষে এই দাঁড়াইল যে ট্যানারের সকল দর্শন আকাশে উড়িয়া গেল, য়্যানির প্রেমে তিনি বন্দী হইলেন। এবং এই কয়েদের প্রথম সোপান যে আলিঙ্গনটী হইয়াছিল তাহাতে য়্যানি মূৰ্চ্ছিত হইয়াছিলেন, কেন না ট্যানারের বাহুর শক্তি অসাধারণ।

এইখানেই নাটকের মূল ঘটনার শেষ। কিন্তু তাহার মধ্যে আরও দুইটী বিশেষ ঘটনা আছে, যাহা দ্বারা বার্ণার্ড শ' নিজের মতটা বিশেষ ভাবে ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। প্রথম ঘটনাটী অক্টেভিয়াসের ভগ্নীর গোপনে বিবাহ, আর দ্বিতীয়টী স্পেইনে ডাকাতের হাতে পড়িয়া ট্যানার প্রভৃতির একরাত্রি নিদ্রা এবং সেই নিদ্রায় একটি অদ্ভুত স্বপ্ন।

অক্টেভিয়াসের ভগ্নী ভায়ওলেট্ গোপনে একজন ধনী মার্কিন যুবকের পাণিগ্রহণ করিয়াছেন এবং দোহদ-লক্ষণ দেহে লইয়া র‍্যাম্‌স্‌ডেনের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সকলে মনে করিলেন, ইনি বিবাহ না করিয়াই গুর্ব্বিণী হইয়াছেন; সুতরাং এই অবস্থায় লোকে যা করিয়া থাকে তাই করিতে ইচ্ছা করিলেন; শ্রীমতী ভাওলেট্‌কে কিছুদিনের জন্য স্থানান্তরে পাঠাইতে চাহিলেন। কিন্তু ভাওলেট নারাজ। অন্য সকলে রাগিয়া আগুণ, কিন্তু ট্যানার তাহার পক্ষে

দাড়াইলেন এবং সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, সকলেরই এই নারীর সাহসের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত; কারণ, ইনি পৃথিবীতে আর একটী জীবের আমদানীর জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াছেন। এবং ভায়ওলেটকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, 'আপনি আইন অনুসারে বিবাহ করেন নাই, ইহাতে কিছু আসে যায় না; নারীর পক্ষে শক্তি ও সাহসের মত আর গুণ নাই, এবং মাতৃত্বই নারীত্বের প্রশস্ত প্রারম্ভ।" বলা বাহুল্য, ইহা বার্ণার্ড শ'র মতেরই পুনরুক্তি।

ভায়ওলেট যে বিবাহ গোপন করিয়াছেন, তাহার মূলেও রহস্য আছে। তাঁহার স্বামীর পিতা একজন প্রকাণ্ড ধনী এবং পয়সা যত রকম সামাজিক সম্মান ক্রয় করিতে পারে, তাহার ষোল আনা তিনি পাইতে ইচ্ছুক। তাঁহার ইচ্ছা, কোন দুঃস্থ 'লর্ড' বংশে তাঁহার ছেলেকে বিবাহ করাইবেন। কিন্তু ছেলে প্রেমের ফাঁদে পড়িয়া ভায়ওলেটের পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। পাছে পিতা রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করেন, তাই ভায়ওলেটেরই পরামর্শে আপাততঃ এই গোপন। ইংরেজের সমাজের প্রতি বার্ণার্ড শ'র আর একটী কটাক্ষপাত।

দ্বিতীয় ঘটনাটীর মধ্যে অনেক কলাকৌশল রহিয়াছে। কিন্তু কলাকৌশলের আলোচনা পূর্ব্বেও কোথাও করি নাই, এখানেও করিব না। ঘটনাটী এই;—ট্যানার প্রভৃতি মোটর গাড়ীতে দূর-ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, স্থান স্পেনের সিয়েরা নেভাডা পর্ব্বত। সেখানে এক ডাকাতের হাতে তাঁহারা বন্দী হইয়াছেন। ডাকাতের সর্দ্দার ট্যানারের সম্মুখীন হইয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, "আমার পরিচয় নিতে আজ্ঞা হউক; আমার নাম মেণ্ডাজোয়া, সিয়েরা কোম্পানীর অধিপতি। আমি ডাকাত, ধনীদিগের লুণ্ঠন করিয়াই আমি জীবিকা অর্জ্জন করি।" ট্যানার অমনই ক্ষিপ্রতার সহিত উত্তর করিলেন, 'আমি একজন

ভদ্রলোক, আমার জীবিকা দরিদ্রদের লুণ্ঠন।” তারপর অবশ্যই ঠিক হইল—প্রচুর টাকা দিয়া ট্যানার এবং তাঁহার সঙ্গীরা মুক্ত হইবেন। কিন্তু আপাততঃ সেখানেই রাত্রি যাপন করিতে হইবে।

সকলে নিদ্রিত হইলেন। তার পর রঙ্গমঞ্চে যাহা আসিল তাহা একটী স্বপ্ন। এবং যে সকল ব্যক্তির কথোপকথন তাহাতে রহিয়াছে তন্মধ্যে ইউরোপীয় সাহিত্যের সেই পুরাতন চরিত্র ডন্ জুয়ানও রহিয়াছেন। ইঁহাদের কথোপকথনের ভিতর বার্ণার্ড শ' স্বর্গ-মর্ত্ত্যের চিত্র আনিয়াছেন। ডন্ জুয়ান্ কহিতেছেন, “সম্মান, কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, ন্যায় প্রভৃতি সকল ধর্ম্মেরই আবাসভূমি নরক”; “ভদ্র-মহিলারা যেখানে থাকেন সেখানেই নরক।” ইত্যাদি। আর একজন কহিতেছেন, ‘আমি ছিলাম ভণ্ড, সুতরাং স্বর্গে যাওয়া আমার উপযুক্তই হইয়াছে।’ সয়তানের মুখে পাই, ইচ্ছা করিলেই নরক হইতে স্বর্গে যাওয়া যায়, তাহাতে কোন বাধা নাই! একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘তবে সকলেই স্বর্গে যায় না কেন’? সয়তান উত্তর করিল, ‘স্বর্গ এমন বিশ্রী জায়গা, আমোদ-প্রমোদের একান্ত অভাব।”

এই সকলের ভিতর বার্ণার্ড শ' গৃহীত ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধে ইঙ্গিতে যাহা বলিয়াছেন, তাহার আলোচনা এখানে করিতে চাই না। তাঁহার আসল বক্তব্য, অতি-মানবের উৎপত্তি; সে সম্বন্ধে তিনি ডন্ জুয়ানের মুখ দিয়া বলাইতেছেন;—“এত দীর্ঘ কালের ধর্ম্মবিশ্বাস, ললিত-কলা, বিজ্ঞান—শেষে মানুষের এই এক প্রার্থনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে—আমাকে একটী সুস্থ জন্তু করিয়া দাও।” সয়তানের মুখে পাই,—

“একটী ব্যূঢ়োরস্ক, বৃষস্কন্ধ বপু শতাধিক গ্রহণী-রোগগ্রস্ত, অপান-বায়ুদিগ্ধ, দার্শনিকের মস্তিষ্কের চেয়ে বেশী মূল্যবান্।”

এ ত সেই অতি-মানবের আদর্শ। কিন্তু ইহাকে কোথায় পাওয়া যাইবে? সয়তান বলিয়াছে, তাহার এখনও জন্ম হয় নাই। একটী রমণী কহিলেন, 'তার জন্ম হয় নাই? হায়, তবে আমারও ত কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই!' সমস্ত বিশ্বের দিকে চাহিয়া রমণী কহিলেন, "A Father—a Father to the Superman!—সেই শ্রেষ্ঠ মানবের একজন পিতা—একজন পিতা চাই!" এই খানেই স্বপ্ন শেষ হইল।

কিন্তু আমাদের প্রশ্নের উত্তর হইল কি? ট্যানারের চরিত্রে, ডন্ জুয়ানের চরিত্রে, নানা ভাবে বার্ণার্ড শ' শ্রেষ্ঠ মানবের আদর্শ আঁকিয়াছেন; কিন্তু তাহা পাওয়ার উপায় দেখাইয়াছেন যাহা, তাহা কি কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব? বিবাহের সংস্কার, সমাজ হইতে অভাব দূরীকরণ এবং সর্ব্ববিধ সামাজিক, আর্থিক, নৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা,—এই ত তাঁর উপায়। কিন্তু মোগলসরাই হইয়া কাশী যাইতে হয় বলিলেই কাশীর পথ দেখাইয়া দেওয়া হইল না। 'বিবাহের সংস্কার কর' বলিলেই এই আদর্শ লাভেরও পন্থানির্দ্দেশ হইল না। এই সংস্কারের পথে পদে পদে ভাবিবার আছে, তাহা বার্ণার্ড শ' দেখান নাই। সুতরাং আমরা বলিতে বাধ্য, বার্ণার্ড শ'র গঠন অত্যন্ত অসম্পূর্ণ রহিয়াছে।

তবে তিনি, নিজে স্বীকার না পাইলেও, কবি। কবির প্রধান কার্য্য আদর্শের অঙ্কন। তাহা লাভের উপায় ভাবিবেন সামাজিক ও দার্শনিক।

শিল্পের কারামুক্তি

ইউরোপের মধ্য যুগে যখন ধর্ম্মের বন্ধন হইতে সাহিত্য ও ললিতকলা একবার মুক্তির আস্বাদ পাইয়াছিল, তখন ইটালির নগরে নগরে একটা নূতন আনন্দ, একটা নূতন প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হইয়াছিল। ম্যাকলে একটা আখ্যায়িকার উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, কোনও এক ব্যক্তি দীর্ঘকাল শৃঙ্খলিতচরণে জীবন যাপন করিয়া হঠাৎ যখন মুক্তিলাভ করিয়াছিল তখন, তাহার চরণের ভার অন্তর্হিত হওয়ায়, পা ফেলিতে গিয়া সে পড়িয়া যাইত; এবং অপনোদিত চরণশৃঙ্খল ফিরিয়া পাইবার জন্য সে সত্য সত্যই আবার আবেদন করিয়াছিল। কিন্তু মধ্যযুগের ইউরোপীয় শিল্পকলা হঠাৎ স্বাধীনতা লাভ করিয়াও তেমন কোন বিপদে পড়ে নাই; বুকের চাপ অন্তর্হিত হইলেও তাহার শ্বাস ফেলিতে কোনই কষ্ট হয় নাই; সে সত্যসত্যই তীব্র বেগে তুমুল আনন্দে তাণ্ডবনৃত্যে আপনার গতির লীলা দেখাইয়া জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছিল। এমনই সময়ে ইটালিতে বোকেসিও প্রভৃতির আবির্ভাব ঘটিয়াছিল।

মধ্যযুগের ইউরোপীয় ধর্ম্মের বিরুদ্ধে এই একটা গুরুতর অভিযোগ রহিয়াছে যে, উহা মানুষকে তাহার ন্যায্য আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। মানুষের যে বাঁচিবার অধিকার আছে এবং এই পৃথিবীতেই বাঁচিবার অধিকার আছে, তাহা যেন ধর্ম্ম তখন স্বীকার করিতে চায় নাই। যে পৃথিবীতে যীশু ক্রুসে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন, যে পৃথিবীর লোকে যীশুকে হত্যা করিয়াছিল, সেই পাপময় পৃথিবীর পাপাসক্ত মানুষও যে বাস্তবিকই মানুষ এবং তারও জীবনে যে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিতে পারে, এই সাধারণ সত্যটা মধ্যযুগের ধর্ম্মোন্মত্ত জগৎ মানিতে চায় নাই। কিন্তু এমনই ভাবে নিষ্পেষিত হইয়া মৃত্যুকে বরণ

করিতে মানুষও রাজী হয় নাই। শুধু এই তথাকথিত পাপের পৃথিবী হইতে সরিয়া যাইবার চেষ্টায় মানুষ জীবন ধারণ করিতে চাহে নাই। তাহার সকল আকাঙ্ক্ষায়, সকল পিপাসায়, সকল চেষ্টায় জলাঞ্জলি দিয়া এক পরোক্ষ জগতে বাসের অধিকার লাভ করিবার জন্যই সে সত্য সত্যই ব্যাকুল হইয়া উঠে নাই। কিছু দিন অবশ্যই ধর্ম্ম তাহার আশার বাণীতে মানুষকে মুগ্ধ করিয়াছিল, কিছু দিন ধর্ম্মের উদ্দীপনা অবশ্যই মানুষকে পাইয়া বসিয়াছিল; কিন্তু সে বেশী দিন নয়। গ্রীক সাহিত্যের রত্নের মালা যখন তাহার সম্মুখে ছড়াইয়া পড়িল, তখন মানুষ আবার এই সত্যটাই উপলব্ধি করিল যে, তাহার এ জগতের এবং এ জীবনের ব্যাপার নিয়াও হাসিবার কাঁদিবার অধিকার আছে; সে যদি প্রাণে ব্যথা পায়, তবে তাহার ভাষায় তাহা প্রকাশ করিতে পারে; জগতের সৌন্দর্য্য যদি তাহার প্রাণে আনন্দের লহর তুলিয়া যায়, তবে সাহিত্যের মুকুরে তাহা প্রতিবিম্বিত হইতে পারে; এবং তাহার প্রেম, তাহার আকাঙ্ক্ষা, তাহার সুখ দুঃখ—তাহার ঐহিক জীবনের সর্ব্বস্ব, এমন একটী বিরাট হেয় বস্তু নয়, যার হানোপায় খুঁজিতেই—যার বিনাশ এবং বিলয় আনয়ন করিবার জন্যই তাহাকে প্রাণপণ করিতে হইবে।

সে দিন গভীর ছায়ায় ঘেরা জগতের মধ্য আকাশে যে আনন্দের রশ্মি দেখা দিয়াছিল, তাহা শিল্প ও সাহিত্যের কারামুক্তির অরুণোদয় রূপে লোকের নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল। সে আনন্দের ঐক্যতানে শুধু বোকেসিওর মত রসিক লোকই যোগ দান করিয়াছিল এমন নয়; ঈরেস্‌মাস্ (Erasmus) এর মত প্রবীণ পণ্ডিত ব্যক্তিরাও তখন হাসিতে ও হাসাইতে লজ্জা বোধ করেন নাই। সুতরাং শিকল-কাটা টিয়াও উড়িতে পারিয়াছিল; শৃঙ্খল মুক্ত মানুষ হাল্কা পায়ে ছুটিতে গিয়া একেবারে পড়িয়া যায় নাই।

শুধু শিল্প নয়, দর্শন ও বিজ্ঞানও এত দিন ধর্ম্মের আরছায়ায় বাড়িবার সুযোগ পায় নাই। গীর্জ্জাঘরের মোহান্তেরা যেটাকে বাইবেলের প্রচারিত সত্যের বিরোধী মনে করিতেন, সেটাকেই তাঁহারা পিষিয়া মারিতে যত্ন করিতেন। শুধু তাই নয়, বাইবেল কি বলে, সেটা লোকে তাঁহাদের মুখেই শুনিতে বাধ্য ছিল। কাহারও এ অধিকার ছিল না যে, নিজের স্বাধীন বুদ্ধি অনুসারে বাইবেলটী পড়িবে এবং তাহার অর্থ উদ্‌ঘাটন করিবে। নিজের ভাষায় এ অমূল্য গ্রন্থ পড়িবার অধিকারও কাহারও ছিল না। একটা মৃত ভাষায় ইহার সকল সম্পদ্ সমাহিত ছিল; সেখান হইতে পাদ্রীরা তাঁহাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে কিছু কিছু সাধারণকে দান করিতেন এবং এর বেশী পাইবার অধিকার কাহারও ছিল না।

তাহার ফলে, পৃথিবী ঘুরে কি সূর্য্য ঘুরে, এই সোজা কথাটাও মানুষ পাদ্রীদের ব্যাখ্যানুযায়ী বাইবেলের মতের সঙ্গে না মিলাইয়া বলিতে পারিত না। দুর্দ্দৈবের বশবর্ত্তী হইয়া গ্যালিলিও যে দিন বলিয়া বসিলেন যে, পৃথিবীটাই সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, সে দিন গীর্জ্জাঘরের মোহান্তেরা দেখিলেন এ উক্তি বাইবেলে কোথাও নাই, সুতরাং সাধারণে উহা প্রচারিত হইলে ধর্ম্মের হানি হইবে। সেদিন ধর্ম্ম তাহার কল্পিত নিজস্ব রক্ষা করিবার জন্যে মানুষকে পিষিয়া মারিতে কুণ্ঠিত হইল না; গ্যালিলিও প্রাণ দিয়া সত্যের বিনিময়ে গীর্জ্জার ধর্ম্ম রক্ষা করিলেন।

এমনি করিয়া বিজ্ঞানই যে শুধু তখন ধর্ম্মের ফাটকে আটক পড়িয়াছিল, তাহা নয়। দর্শনেরও তখন চোখ মেলিবার স্বাধীনতা ছিল না। তাহাকেও ধর্ম্মের অনুজ্ঞা অনুসরণ করিয়া ধর্ম্মেরই অনুশাসনের ব্যাখ্যা নিয়া ব্যস্ত থাকিতে হইত। ওমর নামক যে মহাপুরুষ আলেকজান্ড্রিয়ার

বিশাল পুস্তকালয় পুড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন, তাঁহার নাকি যুক্তি ছিল এই যে, কোরাণে যাহা আছে তাহাই যদি সে সকল পুস্তকের বক্তব্য বিষয় হয়, তবে সেগুলি পুনরুক্তি মাত্র, সুতরাং অনাবশ্যক; আর কোরাণে যাহা নাই, তেমন কথাই যদি সে সব পুস্তক বলিতে সাহস করিয়া থাকে, তবে উহারা ধর্ম্মের বিরোধী, সুতরাং ভস্মীভূত হওয়াই তাহাদের একমাত্র বিহিত গতি। মধ্যযুগের ইউরোপের ধর্ম্মও তেমনি দর্শনকে বলিয়াছিল, যদি ধর্ম্মের বিরুদ্ধ কথা কও, তবে শ্বাস ফেলিতে দিব না; কিন্তু ধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছিল যে, শুধু ধর্ম্মের ব্যক্ত মতের সঙ্গে মিল রাখিয়া কথা বলিতে গেলে, কথা বেশী দিন বলা চলিবে না— স্বল্পকাল মধ্যেই পুনরুক্তি ভিন্ন আর কিছুই থাকিবে না। কাজেই, বিশাল চাপের নীচে পড়িয়া দর্শন তাহার বুকের পঞ্জর পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল; অতি কষ্টে যে শ্বাস ফেলিতেছিল; কোন নূতন তত্ত্ব, নূতন আবিষ্কার ত তাহার ছিলই না; পুরাতন এবং সনাতন সত্যকেও সে সম্পূর্ণরূপে দেখিবার অবসর এবং স্বাধীনতা পায় নাই।

এমনি করিয়া মানুষের ষোল আনা জীবনের চারিদিকে চাপিয়া বসিয়াছিল যে ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মের চাপ যখন কমিয়া গেল, তখন মানুষ হাপ ছাড়িয়া একবার স্বস্তি বোধ করিয়াছিল। একটা মুক্ত, স্বাধীন হাওয়ায় তার প্রাণ মন ভরিয়া গিয়াছিল; পৃথিবীটাকে তখন সে একবার নূতন করিয়া দেখিয়াছিল; জীবনটা একবার নূতন করিয়া অনুভব করিয়াছিল; এবং সত্য আবার নূতন আলোকে তাহার নিকট উদ্ভাসিত হইয়াছিল। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এই নবীন হাওয়ার নূতন স্পন্দন মানুষ অনুভব করিয়াছিল, এবং সে দিন একটা অব্যক্ত পরিপূর্ণতার দিকে মানুষের চিত্ত আকুল হইয়া

শিল্প ও সাধনার এই কারামুক্তির দিনে স্বাধীনতার মুক্ত বায়ু সকলের চেয়ে তুমুল বেগে বহিয়াছিল বোধ হয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে। শিশু যখন প্রথম কথা কহিতে শিখে, তখন সে সময়ে অসময়ে, কারণে অকারণে অনেক কথাই কহিয়া যায়—সেটাই তাহার একটা খেলা হইয়া দাঁড়ায়। বোবা যদি হঠাৎ বাক্‌শক্তি ফিরিয়া পায়, তাহা হইলে সেও অল্পভাষী দার্শনিকের মত না হইয়া বাচালতার দিকেই ঝুঁকিয়া পড়ে। তেমনি, হঠাৎ কারামুক্ত শিল্পও সেদিন ইউরোপে ঠিক ভদ্র ও সমীচীন সীমার মধ্যে সব সময় থাকিতে পারে নাই। হাসি ঠাট্টা এবং রসিকতার নূতন অধিকার লাভ করিয়া সেটাকে সংযমের সীমার মধ্যে সব সময় রাখিতে পারে নাই। সংযম ও স্বাধীনতার সমন্বয় করা মানুষের জীবনের একটী প্রধানতম সমস্যা এবং ইহাই তাহার সকল চেষ্টার চরম আদর্শ। কিন্তু এই দুইটীর একটী আর একটিকে এমনই ভাবে সর্ব্বদাই ডিঙ্গাইয়া যাইতে চাহে যে, স্বাধীনতা সংযমের শাসন না মানাটাকেই একটা বড় বাহাদুরী মনে করে; আর, সংযমের নিয়ম-কানুনও স্বাধীনতাকে দুই হাতে পিষিয়া মারিতে চায়। তাই নিয়মের বাঁধন একবার ছিঁড়িয়া মানুষ আর কোন নিয়মই সহজে মানিতে চায় না; আর নিয়মও একবার মানুষকে হাতে পাইলে আর কোন স্বাধীনতাই তাহাকে দিতে চায় না। মানুষের দীর্ঘ ইতিহাসে এ দুয়ের এক বিরাট নাগরদোলা খেলা চলিয়াছে;—কখনও সংযম উপরে, কখনও বা স্বাধীনতা;—কিন্তু উভয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃত পক্ষে মানুষের বাঞ্ছনীয় অবস্থা! যখনই এই সাম্যাবস্থা ব্যাহত হইয়া একটীর প্রাধান্য হইয়া যায়, তখনই বুঝিতে হইবে, নাগরদোলায় ঝুঁকি লাগিয়াছে; অচিরেই অপরটী প্রধান হইয়া উঠিবে এবং আবার সাম্যাবস্থা ফিরিয়া পাইতে সময় লাগিবে।

স্বাধীনতা যখন সংযমের শাসন অতিক্রম করিয়া যায়, তখন উহা স্বেচ্ছাচারে পরিণত হয়। কারামুক্ত শিল্পের বিশেষতঃ সাহিত্যের, ইতিহাস প্রায় সর্ব্বদাই এটাই প্রমাণিত করিয়া দিতেছে। মধ্যযুগের পর ইউরোপের স্বাধীন সাহিত্যেও তাহার যথেষ্ট দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। আজকের দিনে বোকেসিও তাঁর গল্প লিখিলে, সেটা লোকে কি ভাবে নিত, বলা কঠিন নয়।

ইংলণ্ডের ইতিহাসেও এই সত্যের এক পুনরাভিনয় দৃষ্ট হয়। প্রথম চার্লসকে রাজ্যচ্যুত করিবার সময় ইংলণ্ডেও একটা ধর্ম্মোন্মাদ দেখা দিয়াছিল। সে যুগের পিউরিটানরা ধর্ম্মটাকে এত বড় করিয়া তুলিয়াছিল, যে যন্ত্রসহযোগে গান করাটাও অনেক সময় পাপাচরণ বলিয়া প্রতিভাত হইত। কিন্তু কিছুদিন পর শূন্য সিংহাসনে আবার যখন রাজা প্রতিষ্ঠিত হইলেন তখন সাহিত্যে একটা নূতন আনন্দের স্রোত বহিয়াছিল। সেই যুগের কনগ্রীভ (Congreve), ওয়াইকার্লি (Wycherley) প্রভৃতি যে হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহাতে সংযমের বাঁধন ছিন্ন হইয়াছিল। মানুষের হাসিবার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া মানুষ তখন একেবারে ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করিতেও লজ্জা বোধ করিত না।

কিন্তু বাংলার সাহিত্যে অধুনা যে অনেকে দুর্নীতির অবতারণ করিতেছেন বলিয়া শুনিতে পাই, সেটা কিসের বিরুদ্ধে অভিযান? বাংলাদেশে সাহিত্যের কারাবাস কখনও হইয়াছিল বলিয়া ত মনে হয় না। যেদেশে ভারতচন্দ্র রাজার প্রকাশ্য সভায় 'অন্নদামঙ্গল' দিনের পর দিন ধরিয়া গাহিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন, সেদেশে সাহিত্য কখনও কুলাঙ্গনার মত অবরোধে আটক পড়িয়াছিল কি? যে দেশে জয়দেবের বিহারবর্ণনা—শ্লথ-মেখলার আনুবীক্ষণিক বিশ্লেষণ, শয্যারচনার

পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা, "জাগরঃ কৃশতারতিঃ" প্রভৃতির বিস্তৃত ব্যাখ্যা, ধর্ম্মশাস্ত্রের গ্রন্থ,—সে দেশে এমন দিন কি কখনও ছিল, যখন সাহিত্য বন্দীর মত মুখ ফুটিতে পাইত না? যেদেশে পরকীয়া প্রীতি অনেকের নিকটই ভগবৎ-প্রীতির আদর্শ, সে দেশের Congreve, Wycherleyরা ত আকস্মিক স্বাধীনতার অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব মদিরায় মত্ত হইবার কথা নয়! যে দেশে কবি-ওয়ালার গান ভদ্রসমাজে অগ্রাহ্য ছিল না, সে দেশের সাহিত্য ত আজ হঠাৎ স্বাধীনতা লাভ করে নাই! তবে কেন এই তথাকথিত দুর্নীতির আজ এই আবির্ভাব আমরা দেখিতেছি? তবে কেন 'পতিতার সিদ্ধি', 'অভিনেত্রীর একরাত্রি', বিধবার নূতন প্রেম, পত্নী বিনিময়, স্বামী-বদল প্রভৃতি আমাদের সাহিত্যের আজ 'চোখের বালি' হইয়া দাঁড়াইয়াছে? তবে কেন আজ, প্রেমিকার শয্যারচনা, শয়ন-গৃহের লণ্ঠনের আলো, বিছানায় পাশ-বালিশের অবস্থান, শয়িতার পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন প্রভৃতি আমাদের এত করিয়া বর্ণনীয় বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে? তবে কেন আজ আমাদের নায়িকারা পরিণীতা স্ত্রী হইয়াও Flaubertএর Madame Bovaryর মত যার সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় হয়, তাহারই পিছু ধরিয়া ঘরের বাহির হইয়া যাইতেছেন? তবে কেন আজ উপন্যাসের সুন্দরীরা মাতৃ-সম্বোধন অবহেলা করিয়াও যুবকদের সঙ্গে প্রেম করিবার জন্য ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছেন না?

মালিনী-মাসী এ দেশের সাহিত্যেরই সৃষ্টি; সিদ্ধিখোর ভোলানাথের চতুর্দ্দশী পত্নী বাঙ্গালার গৌরীই হইয়াছিলেন; "পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিতভবদুপযানম্" এদেশেরই পরকীয়াপ্রণয়ী নায়কের বিশেষণ। সুতরাং আজ যদি সাহিত্যের গৃহে নায়িকারা 'ননদিনী বাঘিনীর' চোখে ধূলি দিয়া গৃহের আয়ান-ঘোষকে ফাঁকি দিয়া বাহিরের কানুকে লইয়া

মাতিয়াই পড়েন, তবে সেটা আমাদের এত চোখেই বা ঠেকিবে কেন? বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ প্রতিবেশী রজকিনীর প্রেমে যদি বিহ্বল হইয়াই যান, তবে আমাদের সমালোচকেরা এত চোখ রাঙাইবেনই বা কেন? বারাঙ্গনারা যে দেশে নাগরিকদের হোলি-খেলার সঙ্গিনী হইতে পারিত; সে দেশের সাহিত্যে আজ যদি কোন পতিতা অনন্যসাধারণ প্রেম দেখাইয়া প্রেমের পূজায় সিদ্ধিলাভই করিয়া ফেলে, তা হইলে আমরা এত চটিতে চাই কেন? যে দেশের অভিনয়ে নটীকে 'আর্য্যে' বলিয়া সম্বোধন করা হইত, সে দেশের নবীন সাহিত্যে কোন অভিনেত্রী যদি সত্যসত্যই মানুষ হইয়া থাকে, তবে তাতেই বা আমাদের এত আপত্তি থাকিবে কেন? ও জিনিসটা কি আমরা পাইয়া আসি নাই?

কথায় কথায় আমরা সীতা-সাবিত্রীর উদাহরণ শুনিতে পাই। কিন্তু এই বিপুল দেশের বিরাট সাহিত্যে সীতাই বা কয় জন, আর উর্ব্বশীই বা কয় জন? সাবিত্রীর দেশেই কি যমের সঙ্গে বুঝা-পড়া ছাড়িয়া দিয়া বালির স্ত্রী তারা দেবরকে বিবাহ করেন নাই? সীতা যদি ঘরে ঘরেই থাকিতেন, প্রত্যেক স্ত্রীই যদি সাবিত্রী হইতেন, তাহা হইলে লোকের চোখে এদের চরিত্রটা কি এত বড়ই দেখাইত? সীতার শাশুড়ী কৈকেয়ীও ত এদেশের ঘরের বউ! আর, এক বংশের না হইলেও শূর্পণখাও ত এদেশেরই স্ত্রীলোক। সত্যিকার স্ত্রীপুরুষ প্রত্যেকেরই প্রেম যদি অনন্যসাধারণ না হয়, তাহা হইলে ত আমরা দেশ ছাড়িয়া যাইতে চাই না; সাহিত্যের স্ত্রীপুরুষেরও যদি তেমনই সকলেরই প্রেম অনন্যসাধারণ না হয়, তবে যে সাহিত্যটাকে বর্জ্জন করিতে হইবে, এমনও কোন যুক্তি নাই। কাজেই সাহিত্যে ব্যভিচারের বর্ণনায় সমালোচকেরা যতটা নাসিকা কুঞ্চিত করেন, ততটা করা একটু বাড়াবাড়ি। হঠাৎ স্বাধীনতা লাভ করিয়াই যে আমাদের

সাহিত্যিকেরা এরূপ করিতেছেন, তা নয়। বাস্তব জগতে যখন জিনিষটা রহিয়াছে, তখন সাহিত্যে তাহার ছায়া কোন না কোনদিন পড়িবেই; তা ছাড়া, পরম্পরা বিচার করিতে গেলে কি মনে হইবে না, যে, ঐ জিনিসটা আমরা কতকটা পূর্ব্বাচার্য্যদিগের নিকট পাইয়া আসিয়াছি?

তবে, আমরা আদৌ নাসিকা কুঞ্চিত করি কেন? মনে হয়, ইহার গুটী কয়েক কারণ রহিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বাংলাদেশে যতগুলি যুগপরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখা গিয়াছে, তার মধ্যে ধর্ম্মের আলোচনাটাই বোধ হয় প্রধান। সাহিত্যে একটা নূতন ধারা অবশ্যই তখন আবির্ভূত হয়; কিন্তু সকলের চেয়ে লোকের দৃষ্টি বেশী আকর্ষণ করিয়াছিল, পাশ্চাত্য ধর্ম্ম ও সভ্যতার সহিত সংঘর্ষে উদ্ভূত নূতন ধর্ম্মভাব। এই ধর্ম্মভাব ক্রমশঃ আকার-পরিগ্রহ করিয়া একদিকে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করে; অপরদিকে, সাধারণভাব সমাজের ভিতর নৈতিক জীবনের কতকটা উন্নতিও আনয়ন করে, ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সতীদাহ নিবারণ, গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া, এবং আইনের চক্ষে বিধবা-বিবাহের অনুমোদন, প্রভৃতি হইতেই বুঝা যায় যে, লোকের তীব্রদৃষ্টি তখন সামাজিক ও ধর্ম্মের উন্নতির দিকে নিবদ্ধ হইয়াছিল। যদিও ইংরেজী সভ্যতার অনুকরণে অনেক কু-প্রথাও সেই সময় সমাজে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তথাপি ইহাও ঠিক যে, দেশী কুপ্রথার প্রতি লোকের ক্রমশঃ একটা বিদ্বেষও উৎপন্ন হইয়া গিয়াছিল। বিলাতী অনুকরণে মদ্যপানটা চোখে ঠেকিত না বটে,* কিন্তু বিধবার নির্জ্জলা একাদশী গায়ে লাগিত। এইভাবে একটা নূতন নৈতিক আদর্শ আমাদের সমাজের সম্মুখে ক্রমশঃ উপস্থিত হইতে লাগিল। সাহিত্যে

ইহা প্রকাশ পাইতে বোধ হয় একটু বেশী সময় লাগিয়াছিল ; কিন্তু ক্রমশঃ অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছিল যে, যে দেশে বাই-খেমটা এখনও লোপ পায় নাই, সেই দেশেই বারবনিতা-সংসৃষ্ট রঙ্গালয়ে প্রবেশ করাটাই লোকে পাপ মনে করিতে লাগিল। সকলেই অবশ্য করে নাই, কিন্তু অনেকেই করিত ; এমন কি, পনর বৎসর আগেও একবার কোনও এক রঙ্গালয়ে বিদ্যাসাগরের স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল বলিয়া এবং তাহাতে একজন প্রবীণ ব্রাহ্ম সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মসমাজের অনেকেই তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন।

এইরূপে পবিত্রতার একটা নূতন আদর্শ সমাজে ও সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। ফলে, নাট্যসাহিত্য শিষ্ট সমাজ হইতে একরূপ সরিয়াই দাঁড়াইল ; সাহিত্যের অন্য শাখায়ও যথাসম্ভব মার্জ্জিত রুচির পরিচয় দেওয়াই নিয়ম হইয়া দাঁড়াইল। এ আদর্শ কখনও সর্ব্বব্যাপী হইতে পারে না—হয়ও নাই ; কিন্তু সমাজে ইহা যথেষ্ট আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। এখনও অতি সহজেই যে আমরা দুর্নীতির গন্ধ পাই এবং তাতেই একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়ি, তাহা হইতেই প্রমাণ হয়, পবিত্রতার আদর্শটা আমাদের কত উগ্র ; আর, আবশ্যক অনাবশ্যক যে কোন স্থলেই যে আমাদের লেখকেরা অশ্লীলতার অবতারণা করিবার সুযোগ খুঁজেন, সেটাও এই উগ্র আদর্শের বিরুদ্ধে প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহ ভিন্ন আর কিছুই নয়।

একদিকে সাহিত্যে নীতির কথাটা যে এত বড় হইয়া উঠিয়াছে, এবং অপরদিকে তাহারই বিরুদ্ধে যে এক অব্যাহত এবং অপরিক্ষীণ অভিযান চলিয়াছে, পবিত্রতার এই নূতন আদর্শটাই বোধ হয় তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ। সকলে ইহা তখনও গ্রহণ করে নাই, এখনও করে নাই ; অথচ, ইহা একেবারে লুপ্তও হয় নাই ; জেন্দাবেস্তা যেমন

বলেন যে, আলোক ও আঁধারের কলহ হইতেই এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে, তেমনি আমাদেরও বলিতে ইচ্ছা হয় যে, এই পরস্পর-বিরোধী দুইটী আদর্শের সংঘর্ষই আমাদের সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থার অন্যতম কারণ। এবং যে আদর্শের বিরুদ্ধে এই দুর্নীতি আবির্ভূত হইয়াছে, সে আদর্শ যতদিন বর্ত্তমান থাকিবে, যতদিন আমরা খেউর-গানে আবার একেবারে মজিয়া না যাইব, সে পর্য্যন্ত এই দুর্নীতি দেখিলে নাসিকা কুঞ্চিত না করিয়া আমরা পারিব না।

বাংলা সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা আনয়নের পক্ষে আরও দুইটী কারণ সহায়ক হইয়াছে বলিয়া মনে হয়; এক, সাধারণভাবে পাশ্চাত্যের অনুকরণ, আর বিশেষভাবে পাশ্চাত্যের অনুকরণে নারীর মুক্তি। নারী যে আজ সাহিত্যের এতটা দখল করিয়া বসিয়াছেন—লেখিকা হিসাবে নয়, পরিণীতা কিংবা অপরিণীতা, পতিতা কিংবা অপতিতা নায়িকা হিসাবে,—তার কারণ, পাশ্চাত্যের অনুকরণে বুঝিয়াই হউক কিংবা না বুঝিয়াই হউক, আমরা নারীর একটা বিশিষ্ট মুক্তির ব্যবস্থা করিয়াছি। আইনে আদালতে তার সকলটা এখনও মঞ্জুর না হইলেও সাহিত্যে আমরা নারীকে ষোল আনা অধিকারই দিতে প্রস্তুত।

তার ফলে, নারীর প্রেমের বহুধা অভিব্যক্তি আমরা কল্পনা করিতে পারি, যথা মুমূর্ষু স্বামীর শয্যাপার্শ্বে শরচ্চন্দ্রের 'করুণাময়ীর' নূতন প্রেম অভিনয়; এবং সর্ব্বাবস্থায়ই নারী যে প্রেমের রাণী, এই কথাটাও আমরা ভাবিতে পারি, যথা শরচ্চন্দ্রেরই দাসী 'সাবিত্রী'। আর, মুক্তা নারী ঘরের কোণ ছাড়িয়া রাজনৈতিক বৈঠকেও আধিপত্য করিতে পারেন, এবং নূতন অবকাশ পাইলে, নূতনভাবে মনের মিল অনুভব করিলে নূতন করিয়া প্রেমেও পড়িতে পারেন, যথা নরেশচন্দ্রের 'গোপা'। নারীর জন্য বিপুল বিশ্ব উন্মুক্ত করিয়া দিয়া আমরা

দেখিতে পাইতেছি যে, তাহার প্রেম কাঁসর-ঘণ্টা এবং ঢোল-শানাইয়ের বাদ্যের সঙ্গেই কেবল জন্মগ্রহণ করে না; বরং সেখানে আদৌ জন্মগ্রহণ না করিয়া রঙ্গমঞ্চের দাওয়ায় কিংবা চা-য়ের পার্টিতে কিংবা উদ্যান-ভ্রমণে কিংবা আরও কত রকমে উহা আবির্ভূত হইতে পারে; যথা রবীন্দ্রনাথের 'নষ্ট-নীড়,' 'চোখের বালি' প্রভৃতি এবং নরেশচন্দ্রের 'শুভা' ইত্যাদি।

বিবাহ-বন্ধনের বাইরেও যে স্ত্রীপুরুষের প্রেম জন্মিতে পারে, একথাটা কে না জানে? কিন্তু যে যুগের মানুষ পেশাদারী রঙ্গালয় কোথায় জানিয়াও অন্যকে সে সংবাদ দিতেও ঘৃণা বোধ করিত এবং পাপ মনে করিত, সেই যুগের উগ্র পবিত্রতা অতিক্রম করিয়া আমরা হঠাৎ ইউরোপের নিকট হইতে নূতন করিয়া যেন এই চির-পুরাতন কথাটা জানিয়াছি। আজ যদি আমাদের সাহিত্য সংযমের সীমা অতিক্রম করিয়া থাকে, তবে ইহাও তাহার একটা কারণ।

আরও একটী কারণে ইহা ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়; সেটি, ইউরোপের সাহিত্য হইতে সোজাসুজি ভাব ও আদর্শ গ্রহণ করা। কোনও আধুনিক লেখকই ইহা স্বীকার পাইবেন না যে, তিনি বার্ণার্ড'শ কিংবা স্যুডারমান্ প্রভৃতির নিকট হইতে কিছু ধার লইয়াছেন; জ্ঞাতসারে অনেকেই হয় ত তাহা করেন না; কিন্তু অনিচ্ছায়ও করেন না, এমন লোকও কম। গৃহীত নীতিশাস্ত্রের নিয়ম কানুনের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ ইউরোপের চিন্তায় ও সাহিত্যে আজ বাতাসের সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; পুরাতন আচার, অনুষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠান,—যথা স্ব-স্বামিত্ব, পতিপত্নী সম্বন্ধ প্রভৃতিকে আবার নূতন করিয়া যুক্তির আদালতে যাচাই করিয়া দেখিবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। প্রশ্ন উঠিয়াছে, এতকাল লোকে এই সব মানিয়াছে বলিয়া আমরাও কেন মানিব?

পুরাতন যাহা আছে, সবই কেন থাকিবে? নূতন কিছু কেন হইবে না? অন্ততঃ চেষ্টা করিয়া দেখিতে দোষ কি? এমনই একটী ভাব আজ ইউরোপের সাহিত্যে অত্যন্ত প্রবল। বর্ত্তমান সভ্যতার জ্বালা, ইহার কলকারখানায় মানুষের দুঃখ দৈন্য এবং অশান্তি হইতে হয় ত এই ভাবের উৎপত্তি হইয়াছে। যে জন্যই হউক, মানুষ একটা 'নূতন কিছুর' জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে।

প্রতীচীর নিকট হইতে আমরাও কতকটা এই ভাব লাভ করিয়াছি। প্রতীচীর আধিপত্য সর্ব্বদা আমরা অনুভব করি বলিয়া তাহার অনুভূতি মাত্রই কতকটা আমাদের আদর্শস্থানীয়; যেন, আমাদেরও সেটা না হইলেই নয়! প্রতীচীর সভ্যতার যে জ্বালা, যে তীব্র বেদনা, যে গভীর অনুতাপ, তাহাও আমরা অনুভব না করিতে পারিলে জীবনে ধিক্কার আসে। সেই জন্যে, আমাদের মনেও প্রতীচীর সমস্যা আজ অত্যন্ত বড় হইয়া উপস্থিত হইয়াছে। বিশেষতঃ তাহার সাহিত্যের আসল-মেকী সকল ঐশ্বর্য্যই আজ আমরা আপন করিয়া নিতে চাইতেছি। ইহাই আমাদের মনের অত্যন্ত স্বাভাবিক গতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে; সুতরাং না জানিয়াও অনেক সময় আমরা পশ্চিমের অনুকরণে অনেক নূতন জিনিস সাহিত্যে আমদানী করিতেছি।

একটা 'নূতন কিছুর' আকাঙ্ক্ষা প্রবল ভাবে আজ আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের কথায় "কাণগুলা সব ছাঁটা" 'নাকগুলা সব কাটা' এবং 'গাড়ীঘোড়া ছেড়ে শেষে বাইসিকেলে চড়াটাই" আমাদের নূতনত্ব লাভের একমাত্র প্রয়াস নয়; অন্য বহু প্রকারেও আমরা এখন নূতনকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের আজকের সাহিত্যে যদি কোন দুর্নীতির আবির্ভাব হইয়া থাকে, তবে, ইহাও তাহার একটী কারণ।

নয় বৎসরে পিতা কন্যাকে 'গৌরীদান' করিবেন, আর অমনি কন্যা স্বামীর প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িবে, আর তের-তে পা দিতেই ছেলে আসিয়া 'মা' বলিয়া তাহাকে আহ্বান করিতেই সে পাকা গিন্নী হইয়া পড়িবে, এই যে সনাতন ধর্ম্মের চিরন্তন রীতি, তাহাতে ত আর উপন্যাস হয় না। সুতরাং আমরা নূতন কিছু চাই। আমরা কল্পনা করি, ষোড়শী যুবতী স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া নিজের 'ব্যর্থ-জীবনের বোঝা' আর বইতে না পারিয়া মধ্যরাত্রে একেবারে গৃহ ছাড়িয়া পলায়ন করেন; এবং সেই রাত্রেই রঙ্গালয়ে ভূমিকা গ্রহণ করিয়া একেবারে পাকা অভিনেত্রী হইয়া পড়েন; এবং পরে, কখনও বা বড়লোকের বাগানবাড়ীতে কখনও বা দার্জ্জিলিঙের প্রমোদ-কাননে কখনও বা অন্য কোথাও সময় যাপন করিয়া অবশেষে শিলং কিংবা সিমলার শৈল-বিহারে হাঁসপাতাল স্থাপন করিয়া মুমূর্ষু কাহারও অধরে চুম্বনের ছাপ বসাইয়া দিয়া জীবন সার্থক করেন। শুধু পরিণেতার চরণে প্রেম নিবেদনের মধ্যে নূতন কিছু নাই; ইহাতে পৃথিবী যেমন চলিবার চলিয়াছে; কোন উন্নতি তাহাতে হয় নাই; সুখের পরিমাণ তাহাতে বাড়ে নাই! সুতরাং এখন একবার আবিষ্কারের চেষ্টায় দোষ কি? জীবনটা চিরকাল একটা বাঁধা গৎ-ই থাকিয়া যাইবে, এমন কি কথা?

এ শুধু আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত কারামুক্তির ফল নয়; কারায় রুদ্ধ এ দেশের সাহিত্য কখনই বোধ হয় তেমনভাবে ছিল না। কিন্তু পুরাতন আজ আমাদের কাছে নিতান্তই পুরাতন ঠেকিতেছে; এবং তাহাকে সনাতন মনে করিতেও আজ আর আমাদের ভরসা হইতেছে না; সুতরাং সাহিত্য আজ আমাদের নূতনকে পাইবার ব্যগ্র চেষ্টার মুকুর হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সাহিত্যের শালীনতা

কিছুকাল পূর্ব্বে এদেশে 'সুরুচি' ও 'কুরুচির' একটা তুমুল লড়াই হইয়াছিল। বাহির হইতে আসিয়াছিল, না ভিতর হইতেই ভাসিয়া উঠিয়াছিল ঠিক বলা কঠিন,—কিন্তু একটা প্রবল সুরুচি তখন এদেশে দর্শন দিয়াছিল! এই নবাগত কিংবা নবোন্মেষিত সুরুচি প্রাচীন রুচিকে বলিত 'কুরুচি'। রাগ করিয়া এই তথাকথিত কুরুচি আবার নবীন সুরুচিকে বলিত 'রুচিবিকার'। এই ভাবে উভয়ের বিরোধটা এমন জমিয়া উঠিয়াছিল যে, তখনকার ক্ষণিক, সাময়িক ও সনাতন সাহিত্যের অর্থাৎ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র, মাসিক পত্রিকা এবং গ্রন্থের আসর এই উপলক্ষ্যে বেশ গরম লইয়া উঠিয়াছিল। সুরুচি জপিত নীতি, ধর্ম্ম আর 'প্রেম'; কুরুচি বলিত মদ্যপান, বিধবা-বিবাহ, আর চোখে চশমা। কোন্‌টা কার দোষ, আর কোন্‌টা কার গুণ,—মধ্যস্থ না থাকায় ইহার মীমাংসা কিছুই হয় নাই। সুরুচি কুরুচির দোষ দেখাইত ধর্ম্মের নামে এবং প্রেমের নামে, আর নীতির দোহাই দিয়া; কুরুচি জবাব দিত চশমা-নাকে, 'আজি-মা'র বিবাহ দিতে উদ্যত, নবীন যুবক রূপে সুরুচির চিত্র আঁকিয়া। সুরুচি যে বড় বড় কথা কপ্‌চাইত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; আর, কুরুচি যে কেবলই নক্সা আঁকিত এবং তাহাকেই সুরুচির 'শুদ্ধে তু দর্পণতলে সুলভাবকাশা' ছায়া বলিয়া উপস্থিত করিত, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। সুরুচির পাণ্ডাদের নাম করিব না,—করিতে পারি কি না তাহাও ঠিক বলিতে পারি না; কুরুচির পাণ্ডাদের মধ্যে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমৃতলাল বসুই প্রধান!

সুরুচিকে ভ্যাঙ্‌চাইয়া কুরুচি বলিত 'ওগো, আমি রাস্তায় বাহির হইব না; রাস্তার দৃশ্য সব কুরুচিপূর্ণ—গরু বাছুর কুকুর ভেড়া, সব

ন্যাংটা’। নিতান্তই বাহির হইতে হইলে চোখে অন্ততঃ চশমারূপী খোলস্ চাই-ই চাই। আর সমাজ হইতে কুরুচি দূর করিতে হইলে যে সব সংস্কার প্রয়োজন, তাহার মধ্যে বিধবা আজিমার (পিতামহীর) বিবাহ এবং তাঁহার ইলিশ মাছ খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল সর্ব্বাগ্রে দরকার। এই প্রকার নানা উপায়ে কুরুচি দেখাইতে চাহিত যে, সুরুচির রুচিবিকার উপস্থিত হইয়াছে; তাহার প্রেম কাম-গন্ধ বিবর্জ্জিত নহে; তাহার ভগিনী ‘মডেল ভগিনী’—স্বামীকে ‘ইডিয়ট’ বলিতে জানে এবং অন্যের উপগৃহিণী হইতে পারে। উত্তরে সুরুচি ধর্ম্মের দোহাই, নীতির দোহাই আর সদাচারের দোহাই দিত; কেবল ঈশ্বর কৃপার উপর নির্ভর করিত; একাদশীর দিনে বিধবার নিদারুণ কষ্টের কথা বলিত; ব্রহ্মচর্য্যের অত্যাচারের কথা বলিত; স্ত্রীলোকের প্রজনন শক্তির অপব্যয় ও তজ্জন্য সমাজের ঘোরতর হানির কথা স্মরণ করাইয়া দিত; আর, কুরুচির মতে, গোপনে মদ্যপান করিত এবং উইল্‌সন্ হোটেলের মক্কেলী করিত।

ঝগড়াটা শেষ হইয়াছে, একথা কি করিয়া বলি? এখনও যে উভয় পক্ষের কালী কলমের নক্‌সা ও ব্যঙ্গচিত্রের ছড়াছড়ি দেখিতে পাইতেছি! আর ঝগড়াটার শেষ হইতেই হইবে এমনও কোন নিয়ম নাই। সহরে—অর্থাৎ যেখানে কাহারও সঙ্গে কাহারও তেমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় নাই, সেখানে—বসিয়া আমরা পাড়াগাঁয়ের দলাদলির যে সব ভীষণ চিত্র আঁকি, পাড়াগাঁয়ের লোকেরা সত্য সত্যই সে সবকে তত ভীষণ মনে করে না। একজন নেশাখোর তিরস্কৃত হইয়া বলিয়াছিল ‘কেন মিছা বক ভাই! সত্য সত্যই কি আমি নেশার দাস? কিছু করবার নাই বলিয়া একটু নেশা করি মাত্র’! পাড়াগাঁয়ের লোকেও তেমনই কিছু করিবার পায় না বলিয়াই যা একটু এ উহার সমালোচনা করে, এবং দল পাকায়। সেটার মধ্যে বাস্তবিকই কোন ভীষণ বর্ব্বরতা প্রচ্ছন্ন

রহিয়াছে কি না, কোন বিষের বীজ, কোন জীবনধ্বংসকারী হলাহল তাহাতে রহিয়াছে কিনা,—কোনও কমিটীর অনুসন্ধানে তাহা স্থিরীকৃত হয় নাই। জীবনের অভাব থাকিলে তর্ক হয় না; আর হস্তাহস্তি ও কেশাকেশি না করিয়া বিতণ্ডা করিলে তাহাকে বর্ব্বরতা বলা চলে না। তাহা হইলে সহরের লোকই বা কি নিয়া বাঁচিত, আর মানুষের ইতিহাসই বা কি লিখিত! সুতরাং সুরুচি-কুরুচির কলহটা শেষ হইয়া যায় নাই বলিয়া মুখ ভার করিবার কোন হেতু নাই। কারণ, ঐ ত জীবন! একটু কথা কহিতে পারিব না, একটু রসিকতা করিতে পারিব না, একটু হাসি ঠাট্টা করিতে পারিব না, অর্থাৎ মিথ্যাই হউক আর সত্যই হউক, কাহারও একটু দোষ দেখাইয়া একটু রগড় করিতে পারিব না—তবে বাঁচিব কি নিয়া? তবে, চৌমাথা ছাড়িয়া এক পথে খুব বেশী দূর চলিয়া গেলে ফিরিয়া আসিয়া আর এক পথ ধরিতে কষ্ট হয়, তাই এই পথে খুব বেশী দূর যাইব না, এই পর্য্যন্ত। সুতরাং ঝগড়াটা জীবিত থাকুক, তাহাতে আনন্দের এবং জীবনের স্পন্দন আছে।

এই যে সুরুচি কুরুচির লড়াই তাহা প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল সমাজ ও ধর্ম্ম নিয়া; সাহিত্যে অর্থাৎ লিখিত এবং মুদ্রিত ভাষায় তাহা প্রকাশ লাভ করিলেও তখন ইহা সাহিত্যকেই বিষয় করিয়া উৎপন্ন হয় নাই। কিন্তু 'ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ'—তাই, কলহটীও কৃশা গিরিনদীর মত আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ পদ্মা-মেঘনার পরিসর লাভ করিয়া বারিধিতে পরিণত হইবার উপক্রম করিয়াছে। এখন সুরুচি কুরুচি সমাজ নিয়া বড় কোন্দল করে না; কারণ, সে বিষয়ে যাহারা মুখর অর্থাৎ যাহাদের মনোভাব প্রকাশ করিবার উপযোগী ভাষা আছে, তাহাদের মধ্যে মোটামুটী একটা মীমাংসা দাঁড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। ধর্ম্ম নিয়াও আমরা এখন তত ব্যস্ত নই; কারণ, যাহারা গুহায় নিহিত ধর্ম্মতত্ত্বকে টানিয়া

দিবালোকে বাহির করিতে চায়, তাহারা এখন মোটামুটি স্বীকার পায় যে, আলোক দেখিলেই ঐ জিনিষটা সঙ্কুচিত হইয়া যাইবে; এবং যাহারা উহার কোষাধ্যক্ষ তাহারা শুদ্ধ সঙ্কীর্ণ হইয়া যাইবে; অর্থাৎ দাঁড়াইবে এই যে, 'নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্'। সুতরাং পরস্পরকে কলহে পরাস্ত করিয়া সঙ্গী করিবার চেষ্টা না করিয়া সকলেই এখন যার তার পথ দেখিতে সম্মত।

শ্রীমতী আনিকে সভাপতি করিবার জন্য কলহ কিংবা ইত্যাকার যে যে সকল কলহ রাজনীতির ক্ষেত্রে দেখা দেয়, সে সকল প্রায়ই অতিথি অর্থাৎ বেশী দিন থাকে না। আর, চাকরকে গালি দিবার সময় যেমন অনেক নির্জীব বাঙ্গালীও বীরদর্পে হিন্দীভাষা আওড়াইয়া যান, তেমনই এ সকল রাষ্ট্রীয় মহোৎসবের চেঁচামেচি বাঙ্গালার চেয়ে ইংরেজীতেই জমে ভাল।

এখন যে 'সব্‌সে মজাদার' কাজিয়া নিয়া আমরা মজিয়া আছি, তাহার এক অংশের বিষয় সাহিত্যের ভাষা, আর এক অংশ সাহিত্যের চরিত্র নিয়া। রামায়ণে পাই, অন্ধমুনির পুত্রকে যখন দশরথের শব্দভেদী বাণ সংহার করিয়াছিল, মুনি তখন দশরথকে বলিয়াছিলেন, 'রাজা, তোমার সঙ্গে আমার ত স্ত্রী নিয়া কিংবা জমী নিয়া কোনই কলহ নাই, তবে তুমি আমার ছেলেকে মারিলে কেন'? বোধ হয়, তখনকার দিনে স্ত্রী ও ক্ষেত্রই ছিল মারাত্মক কলহের কারণ। কোন্ ভাষায় লিখিব সে বিষয়ে ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্র যদিও ব্যবস্থা দিয়াছে, সুতরাং বিধিভঙ্গের দৃষ্টান্ত যদিও প্রাচীনকালেও ঘটিয়া থাকিবে, তথাপি তাহার কোন ইতিবৃত্ত আমাদের জানা নাই। সুতরাং এই বিষয় নিয়া কলহ একটা নূতন জিনিস—সম্পূর্ণ বর্ত্তমান সভ্যতার আমদানী।

কিন্তু এ কলহটাও ভাল করিয়া জমিতে পারে নাই। কারণ, আমি যে ফরাসী ভাষায় না লিখিয়া বাংলায় লিখিতেছি, সে জন্য আমার বিদ্যার পরিসর খুব বুঝা গেলেও গালি খাইবার মত কোন অপরাধ আমি করি নাই। আর এ বিবাদেরও শেষ কথা রুচি ;—কাহারও যদি ক্ষীরমোহনের চেয়ে রসগোল্লা ভাল লাগে, তবে সে ময়রার নিকট রসগোল্লাই ফরমাইস করিবে ; এবং নিতান্ত বেকুব না হইলে ময়রা তাহাকে কখনও বলিবে না যে, 'মশায়, ক্ষীরমোহন নিন, এ অতি চমৎকার জিনিস'। ভাষার কথাটাও প্রায় তেমনই ; যাহার কলমে যে ভাষা উঠে ভাল, সে সেই ভাষায়ই লিখিবে ; কেহ উপদেশ দিতে গেলে সে ন্যায়মত বলিতে পারে, 'মহাশয়, আমার কাছে উহাই লাগে ভাল' ;—এবং এর পরে আর প্রত্যুক্তি নাই।

সুতরাং ভাষার অর্থাৎ আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতে গেলে, ভাষার ক্রিয়াপদের রূপ নিয়া যে কলহ, তাহা হাড়ে মাংসে ঝগড়া নহে। ইহার চেয়ে গভীরতর কলহ হইতেছে সাহিত্যের শালীনতা নিয়া—অসৎ সাহিত্য ও সৎ সাহিত্য নিয়া। 'কাব্যশাস্ত্রবিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাম্'—খুব ঠিক কথা ; কারণ, ধীমান্ই হই, আর একেবারে ধী-হীনই হই, কাব্য কিংবা অন্ততঃ কবিগান না হইলে জীবনটা একেবারে শুক্না কাঠের মত ঝনঝনা হইয়া পড়ে। কিন্তু শাস্ত্রকার—অবশ্যই পূর্ব্বোক্ত বিধানের আবিষ্কর্ত্তা নহেন, আর একজন—বলিয়াছেন 'কাব্যালাপাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ' ; সুতরাং টীকাকার মল্লিনাথের মতে দুই প্রকার কাব্য রহিয়াছে —সৎ এবং অসৎ ; অসৎকে পরিত্যাগ করিয়া সৎ কাব্য গ্রহণ করিবে— 'হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ' ! ইহাই হইল শিষ্টদের মীমাংসা।

এখনও আমরা এই মত মানি। সুতরাং প্রশ্ন হইল, অসৎ কাব্য কি ? উত্তর, যাহা অশ্লীল, যাহা ধর্ম্ম ও নীতির গ্লানিকর। অশ্লীল কথা

গ্রন্থে লিখিবে না, এবং যে গ্রন্থে অশ্লীল কথা থাকে তাহা পাঠ করিবে না —লেখক এবং পাঠক উভয়ের প্রতিই অশ্লীলতা বর্জ্জনের বিধি রহিয়াছে। পরবর্ত্তী সময়ে আমরা যতই দোষ ধরি না কেন, বিধি মাত্রেই ব্যক্তি ও সমাজের হিতের জন্য কল্পিত হয়, একথা বোধ হয় সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে। সুতরাং অশ্লীলতাবর্জ্জনের বিধিটাও আমাদের উপকারার্থেই সৃষ্ট হইয়াছিল, ইহা আমরা কিছুতেই অস্বীকার করিব না। কিন্তু তথাপি একটা কথা।

মদ যে বিক্রয় করে সে শতকরা নিরনব্বই স্থলেই মাতাল নয়; তথাপি মদ খাওয়ার নিষেধের সে নিশ্চয়ই বিরোধী। কারণ স্পষ্ট। তেমনই অশ্লীল বই যে লেখে, সে ব্যক্তি যে খুবই অসচ্চরিত্র তাহা নয়; তথাপি অশ্লীলতা বর্জ্জনের বিধি সে সহজে মাথা পাতিয়া লইতে চায় না। ইহার‌ও কারণ স্পষ্ট। অশ্লীল ব্যাপার মানুষের জীবনে রহিয়াছে; এবং প্রকাশ্যে না হইলেও তাহার প্রতি প্রগাঢ় লোভও মানুষের রহিয়াছে। সুতরাং মানুষের জীবনটার যদি কতক অংশ আমরা ছাঁটিয়া ফেলিতে না পারি, তবে সাহিত্য হইতে অশ্লীলতা দূর করাও কঠিন। মদ্য পান নিবারণের যিনি প্রধান উদ্যোক্তা এবং সভায় যিনি প্রথম বক্তা, তাঁহাকেও ঠিক সেই বক্তৃতার ক্লান্তি দূর করিবার জন্যই একটু 'টনিক' বা রসায়ন খাইতে দেখা যায়। অশ্লীলতার‌ও তেমনই যিনি বিরোধী তিনিও গল্পচ্ছলে দুই একটা অশ্লীল উপাখ্যান যে না বলেন এমন নয়; কারণ সেটা মন্দ রসিকতা নয়। গল্পে এইরূপ রসিকতা দ্বারা যদি পাঁচ জনকে খুসী করা যায়, তবে সেই জিনিসই ছাপাইয়া পাঁচ হাজার ব্যক্তিকে হাসাইবার লোভ কয় জন সংবরণ করিতে পারে? এই কারণেই অশ্লীলতা বাঁচিয়া আছে। মানুষের জীবন হইতে যাহা যাইবার নয়, সাহিত্য হইতেও তাহা নড়িতে চায় না; কারণ সাহিত্য ত মানবজীবনের দর্পণ।

অশ্লীলতা সাহিত্যে কেমন শিখড় প্রবেশ করাইয়া দিয়া রহিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া কঠিন নয়। ছোট বেলা শুনিতাম সংস্কৃত সাহিত্য বড়ই ঐ দোষে দোষী। সংস্কৃতে আবার ক্যলিদাসের চেয়ে বেশী প্রসিদ্ধ লেখক আর কে? সুতরাং কালিদাসের লেখায় উহা নিশ্চয়ই রহিয়াছে। যথা, 'অবিদিতসুখদুঃখং নিগুর্ণং বস্তু কিঞ্চিৎ, জড়মতিরিহ কশ্চিৎ মোক্ষ ইত্যাচচক্ষে। মম. তু মতমনঙ্গস্মেরতারুণ্যঘূর্ণন্মদকল-মদিরাক্ষী-নীবি-মোক্ষো হি মোক্ষঃ'। ইহার চেয়েও কিঞ্চিৎ বেশী মাত্রায়—'কথমেতৎ কুচদ্বন্দ্বং পতিতং তব সুন্দরি। পশ্চাধঃ (বাকী টুকু আর লিখিব না)।' ইত্যাদি। 'শৃঙ্গার-তিলক' ও 'শৃঙ্গার-রসাষ্টক' কালিদাসের লেখা কি না, শপথ করিয়া বলিবার উপায় নাই। কিন্তু কালিদাসের নামের সঙ্গে ইহা এমনই জড়িত যে, তিনি না লিখিলেও তাঁহার ভূতে নিশ্চয়ই ইহা লিখিয়াছে। আর, কালিদাসের বাড়ী যদি নবদ্বীপে হয়, তবে ত মোটেই সন্দেহের হেতু নাই। কারণ, 'ধূলটে'র দেশে কি না হয়! রূপবর্ণনায়ও তিনি 'কাঞ্চীগুণস্থানমনিন্দিতায়াঃ' আর "তন্বী নবরোমরাজিঃ" প্রভৃতি লইয়া যে সকল রসিকতা করিয়াছেন, তাহা ঠিক ধর্ম্মমন্দিরের উপসনার ভাষা নহে।

কিন্তু বেচারা কালিদাসকে খালি দোষ দিলে চলিবে কেন? শুক্ল যজুর্ব্বেদ ত অপৌরুষেয়; কারণ, উহা ত বেদ, সুতরাং ব্রহ্মার মুখ হইতে নিঃসৃত। অনুবাদ না করিয়াও ব্রহ্মার মুখের একটা মন্ত্র তুলিয়া দেই—এরূপ সাহস আমার হইতেছে না। অশ্বমেধ যজ্ঞে মহিষী যে সব মন্ত্র পড়িবেন, মনে হয় অশ্লীল-সাহিত্য তাহাতে চরম সোপান আরোহণ করিয়াছে। চার্ব্বাক বেদকে যে যে কারণে আক্রমণ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে একটী এই ছিল যে, 'জর্ফরী তুর্ফরীত্যাদি পণ্ডিতানাং বচঃ স্মৃতং'; সায়ন তাহার উত্তর দিয়াছেন, "তুমি ব্যাকরণ জান না, নিরুক্ত

জান না, 'জফ'রী' শব্দের অর্থ তুমি কি বুঝিবে? আর তুমি বুঝিলে না বলিয়াই উহা নিরর্থক হইয়া গেল?"— তা ত নয়ই। কিন্তু চার্ব্বাক অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রক্রিয়া সকল আক্রমণ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'অশ্বস্যাত্র হি শিশ্নস্তু পত্নীগ্রাহ্যং প্রকীর্ত্তিতং'।—সে কথার, সে সব মন্ত্রের শ্লীলতার সম্বন্ধে সায়ন কি বলেন? কিছুই না। সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রও সব সময় শালীনতার নিয়ম মানিয়া চলে নাই।

গ্রীকদের এক জন দেবতা ছিলেন বেক্‌থস্ (Bacchus)। তাঁহার উপাসনায়ও অশ্বমেধেরই পুনরাবৃত্তি হইত।

অধুনিক স্মার্ত্ত পণ্ডিত বলিবেন, এ সব মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ আমরা বুঝি না। কিন্তু ভাষ্যকার ও টীকাকারেরাই যে অর্থ করিয়াছেন তাহাও শালীন সাহিত্যের বাহিরে !

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ছাড়া, বাংলার ভারত চন্দ্র, হিন্দী "হোড়ি" গান প্রভৃতিও অশ্লীল রসিকতারই নিদর্শন।

কিন্তু ভারতের লোকই কেবল অশ্লীলতা দোষে দোষী নয়। বোকেসিও ত প্রসিদ্ধ। বাইরণও তথৈব। ফিল্ডিং, লরেন্স ষ্টার্ণ প্রভৃতিও একই শ্রেণীর। স্বয়ং মিণ্টনও অন্ততঃ এক জায়গায়। আর ফরাসী জননীর অন্যতম সুসন্তান 'ভল্‌তেয়ার' তাঁহার ছোট গল্পে কিছুই বলিতে কসুর করেন নাই। ইদানীন্তন ফরাসীনন্দন য়্যানাতোল্ ফ্রান্স আর কিছু না হইলেও নিশ্চয়ই ফরাসী। সুতরাং বাকীটুকু উহ্য রাখিলেও চলে। আর জার্ম্মেনী এত বিষয়ে উন্নতি দেখাইয়াছে—কেবল এই এক দিকেই দেখাইবে না, তাহাও কি কখনও হইতে পারে? সুতরাং স্যুডারম্যানের নাম করা যাইতে পারে। আর কত নাম করিব?

প্রাচী ও প্রতীচী দুইটি বিপরীত দিক্। রসিকতায়ও উভয়ের পার্থক্য লক্ষিত হয়। কালিদাস পুরুষ মানুষ—স্ত্রীলোকের দেহ উপলক্ষ্য করিয়া

রসিকতা করিয়াছেন; কিন্তু বোকেসিওর অনেক স্ত্রীলোকও যাহা বলিয়াছেন, এক যজুর্ব্বেদের অশ্বমেধ যজ্ঞের রাজমহিষীর পঠিতব্য মন্ত্রের বাহিরে তাহার দোসর মিলে কি না সন্দেহ। স্যাডারম্যানেরও দুই একজন যুবতী, যথা, 'সেরা গান' (ইংরেজী নাম 'Song of Songs') নামক বইয়ের যুবতীদ্বয়—নিজেদেরই রম্ভাসদৃশ উরুযুগলের বর্ণনায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলে বলিতে পারে না। 'কমলের দুঃখ' ইহার কাছে কিছুই নয়।

আর কত দৃষ্টান্ত চাই? কথাটা সুতরাং অপ্রতিপন্ন নহে যে, অশ্লীলতা বা কুরুচি জিনিসটা সব সময় ধর্ম্মের প্রক্রিয়ার বেশে না হইলেও রসিকতা বেশে থাকিয়া থাকিয়া সাহিত্যে মাথা জাগাইতেছে। এ অবস্থায় আমরা কি করিব? সহ্য করা ছাড়া আর ত কোন উপায় দেখি না।

আর একটা কথা একটু দুঃসাহসের সহিত বলিতে হইতেছে। আমরা একটু বেশী পরিমাণে শ্লীলতা-বাদী হইয়া পড়ি নাই ত? অর্থাৎ শালীনতা রক্ষা আমাদের একটা 'নেশা' হইয়া যায় নাই ত? সুরুচি যেমন চোখে চশমা দিয়া বাহির হইত, পাছে ন্যাংটা কুকুর চোখে পড়ে, আমাদেরও সে রোগ জন্মে নাই ত? আমরা রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে'কেও অশ্লীল বলি; কেন না, উহাতে পর পুরুষের সহিত প্রণয়ের ইঙ্গিত রহিয়াছে। আর কিছুই নাই; কেবল ঐ টুকুই উহাকে কাহারও কাহারও চক্ষে অশ্লীল প্রতিপন্ন করিয়াছে। অথচ বৈষ্ণব ধর্ম্মসাহিত্য, যেমন চৈতন্যচরিতামৃত, বলে, 'পরকীয়া না হইলে নয় রসের সঞ্চার'। একটা হজম করিতে পারি, আর একটা এমন হলাহল কেন?

প্রকৃত পক্ষে আমরা বড়ই গোলযোগে পড়িয়াছি। একেবারে রসিকতা ছাড়া জীবনটা ঠিক জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধের মত সত্য এবং সভ্য

হইলেও প্রাণহীন। অথচ কোন জিনিসেরই বাড়াবাড়ি ভাল নয়। মুস্কিল হইয়াছে সীমা লইয়া—কোথায় রেখা টানিব তাই লইয়া। বেদ ত ধর্ম্মগ্রন্থ, অপৌরুষেয়। আর কালিদাস ভারতচন্দ্র প্রভৃতি বুড়ামানুষ; তাঁদের লেখা ছাটিয়া কাটিয়া লইবার ইচ্ছা কোন সম্পাদকেরই হয় না। কিন্তু নব্য লেখকদের বেলায় আমরা একটু বেশী কঠোর।

এইখানে দুইটা দলের সৃষ্টি হইয়াছে। একদল বলিবেন 'প্রাচীন বাদ দেও; অধুনা এ সব একেবারেই চলিবে না'। আর এক দল বলেন, 'আগের মত এত না চলুক, একেবারেই চলিবে না কেন? আর ইউরোপ ত এখনও একটুকুও কমায় নাই'। এই কলহের মীমাংসা করিবে কে?

একটা কথা মনে পড়িল। জার্ম্মান পণ্ডিত এবং ঐতিহাসিক ট্রীট্‌চস্কে এক জায়গায় বলিয়াছেন যে, যে জাতি মদ না খায় তাহার পক্ষে সভ্য হওয়া কঠিন, এমন কি অসম্ভব। ট্রীট্‌চস্কে ঐতিহাসিক; তিনি জানেন গ্রীসে খুব মদ চলিত; মিশরেও সংযমসমিতি (Temperance Association) ছিল না; আর ভারতবর্ষে ত সোমরস না হইলে পূজাই হ'ত না।

এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া বর্ত্তমানে কেহ কেহ বলিতে চান (নীট্‌চে তার মধ্যে একজন) যে, মানুষের ভিতর যে একটা পশু আছে সেটাকে একেবারে গলা টিপিয়া মারা কিছু নয়; নীতির চাপে উহাকে একেবারে ফাঁপর করিয়া তুলা কিছু নয়। বরং উহাকে বাঁচিয়া থাকিতে দেওয়াই মানুষের পক্ষে শ্রেয়ঃ। কারণ, এখনও পশুর সঙ্গে এবং পশু-প্রকৃতি মানুষের সঙ্গে মানুষকে যুঝিতে হয়; এখনও লড়াইয়ে যোগ্যতর অর্থাৎ অধিকতর শক্তিশালীরই জয় হয়; সুতরাং পশুর শক্তি এবং প্রবৃত্তিকে বাঁচাইয়া রাখা দরকার। পৃথিবীর সকল লোকই জগাই

মাধাই নয়, হরিনাম শুনিয়াই সকলেই কলসীর কানা ছুড়িতে ক্ষান্ত হইবে না। সুতরাং একেবারে পিষিয়া না মারিয়া বরং শক্তি ও প্রবৃত্তিকে অদম্য করিয়া দেওয়া ভাল।

খুবই সমীচীন না হইলেও যুক্তিটা একেবারে অসমীচীন নহে। এবং এই সাধারণ নিয়মের ফলে এই হইবে যে, জীবনে আমাদের যে সব ব্যাপার ঘটে তাহা লইয়া একটু আধটু রসিকতা করা খুবই অন্যায় মনে করা যাইতে পারিবে না। মদের দোকানের কাছে গেলেই লোকে মাতাল হইয়া যায় না, এবং একটু রসিকতা করিলেই লোকে অসচ্চরিত্র হইয়া যায় না। তবে, আজ কাল আমরা ইস্তিরি করা ধুতি পড়ি, সুতরাং রসিকতাও একটু মার্জ্জিত ভাষায় করা উচিত। এর বেশী কোন সাধারণ নিয়ম করা সম্ভব নয়। কোন বিশিষ্ট গ্রন্থ বা গ্রন্থকারের কথা উঠিলে তাহার বিচার স্বতন্ত্র ভাবে করিতে হইবে।

সমস্যাপূরণ

এখন যেমন ছেলেদের মধ্যে হেঁয়ালি ও ধাঁধাঁর প্রচলন আছে এবং তার উত্তর দেওয়া যেমন একটা নির্দ্দোষ ন্যূনাধিক সাহিত্যিক আমোদ, সাবেক কালেও তেমনই পণ্ডিতদের মধ্যে সমস্যা পূরণ একটী সাহিত্যিক আমোদ বলিয়া পরিগণিত ছিল। একজন কবিতার একটী বা দুইটী, কখনও বা আধটী মাত্র চরণ আবৃত্তি করিতেন, আর একজন তৎক্ষণাৎ বাকীটুকু যোগাইয়া একটী সরস-ভাব-ব্যঞ্জক পূর্ণ কবিতা রচনা করিয়া ফেলিতেন। যিনি যত শীঘ্র এবং সহজে,

যত সরস কবিতা যোগাইতে পারিতেন, তাঁর তত বাহাদুরী ছিল। 'বালে কথং রোদিষি?' একজন হয়ত এই টুকু মাত্র বলিলেন; কে, কাহাকে, কিরূপ স্থলে এই প্রশ্ন করিতে পারে, ইহাই সমস্যা; আর একজন হয়ত শ্লোকটী পূরণ করিয়া একটী গভীর পরিপূর্ণ ভাব প্রকাশ করিয়া সমস্যাটী পূরণ করিলেন, 'এই নিবিড় অরণ্যে, গভীর নিশীথ সময়ে এই বিপদ-সঙ্কুল স্থানে, উন্মাদিনীর মত, হে বালিকে, তুমি কাহার জন্য, কেন রোদন করিতেছ?' ইহার নাম ছিল সমস্যা পূরণ।

জানি না, প্রাচীন সমস্যা-পূরক কবিদের কেহ জীবিত আছেন কিনা। জানি না, জীবিত থাকিলে তাঁরা বাংলা-সাহিত্যের আসরে নামিতে প্রস্তুত আছেন কিনা। কিন্তু সম্প্রতি কতকগুলি সমস্যা বাংলার মস্তিষ্ককে আলোড়িত করিতেছে; সুতরাং সমস্যা-পূরকের দরকার হইয়া পড়িয়াছে। কে যে এই সকলের পূরণ করিয়া দিবে, ইহাও একটী প্রধানতম সমস্যা। আঁধার ঘরে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে কোন্ দিকে দরজা রহিয়াছে ঠিক করিতে না পারিয়া দেয়ালে মাথা ঠুকিতে হয়; অকস্মাৎ এই সকল সমস্যায় বিব্রত, আলোড়িত বঙ্গ-মস্তিষ্কও তেমনই কোন্‌দিক হইতে যে উত্তরের ঊষা-কিরণ আসিবে ঠিক করিতে না পারিয়া কখনও বা উত্তরে, কখনও বা পশ্চিমে, কখনও বা নরওয়ের দিকে, কখনও বা ইংলণ্ডের দিকে দৃক্‌পাত করিতেছে। কেহ কেহ আবার প্রাচীন সমস্যা-পূরক কবিদের ওয়ারিশ আধুনিক বঙ্গ কবিদেরই নিকট এই উত্তরের প্রত্যাশা করিতেছেন।

আমাদের কিন্তু মনে হয়, বাংলা দেশের প্রাণ হইতে এই প্রশ্নগুলি উঠিতেছে কি না, তাহাই সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য, তাহাই সর্ব্ব প্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমস্যা। মানুষের কারিগরিতে তৈয়ারি উষ্ণ-গৃহে অসময়ে

এবং অস্থানে উদ্ভিদ্ উৎপাদনের মত, এই সমস্ত প্রশ্ন যে অস্থানে ও অকালে কাহারও কাহারও মস্তিষ্ক চিড়িয়া মাথা জাগাইতেছে না, তাহাই সকলের আগে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। আমাদের নিজেদেরও সমস্যা আছে; নরওয়ের প্রশ্ন বিচার করার অবকাশ আমাদের এখনও হয় নাই। কতকগুলি প্রশ্ন যে কেহ কেহ জাগাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা যে এ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক, বাংলার প্রাণ হইতে যে তাহাদের উৎপত্তি হইতেছে, কোন অস্বাভাবিক হিম সেচনে মেরু প্রদেশের এই উদ্ভিদ্ গুলিকে উষ্ণ বাংলার মস্তিষ্কে যে উৎপাদিত করা হইতেছে না, তাহার বিচার হইয়াছে কি? এ প্রশ্নের উত্তর বাংলা দেশই দিতে পারে; ইহার জন্য ইবসেন্ কিংবা বার্নার্ড শ'র সাক্ষ্য অনাবশ্যক।

ভিড়ে না মিশিয়া একটু দূর হইতে দেখিলে মনে হয় বাংলার মনটাকে একটা কুয়াসায় ঘিরিয়া ফেলিয়াছে; ক্ষীণ রশ্মিপাত হইতে না হইতেই ইহার ভিতরে দ্রব্যমাত্রেই এক বিকট মূর্ত্তিধারণ করিয়া ফেলে। একবার রব উঠিল, বাঙ্গালী চিত্রাঙ্কনে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ; ছবি না আঁকাই বাঙ্গালীর উন্নতির যা প্রধান বাধা; সুতরাং ছবি আঁকা চাই। ভাল কথা; চিত্রাঙ্কন ললিত-কলার অঙ্গ, তাহার চর্চ্চায় ললিত-কলার শ্রীবৃদ্ধি হইবে, সে ত আশার কথা। কিন্তু পাণ্ডারা ঠিক করিলেন, আলেখ্য দেবীর মন্দিরে ভারতীয়-পদ্ধতিতে প্রবেশ করিব, এবং অন্যকেও এ ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে প্রবেশ করিতে দেখিলে সমাজ-চ্যুত করিব। তাহাই হইল; ফলে, ভারতীয় চিত্রবিদ্যা নামক জীবের জন্ম হইল। অনেকে তাহার উপাসক হইয়াছেন; রাজশক্তি তাহাকে স্বায়ত্তশাসন দিয়াছেন ও খেতাবে সম্মানিত করিয়াছেন। 'সে ধর্ম্মটার ঈশ্বর হচ্ছে ভূত না পরব্রহ্ম,' তাহাই এখনও অনেকের বোধগম্য হয় নাই; তাঁদের বুদ্ধির দোষ, সন্দেহ

নাই। ভারতীয়-চিত্র-বিদ্যা কুয়াসার ভিতরে যে সমস্ত দ্বৈপায়ন প্রসব করিতেছেন, বিশালবুদ্ধিরা যে কালে সে গুলিকে চিত্র-বিদ্যার শ্রেষ্ঠ সন্তান বলিয়া জগতের সম্মুখে প্রতিপন্ন করিয়া দিবেন, তাহাই দেখিবার জন্য আমরা বাঁচিয়া আছি। সে দিন আসিতে বিলম্ব নাই; এরই মধ্যে ইউরোপের কেহ কেহ ইহাদের নূতনত্বের প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি তত দূর অগ্রসর না হওয়া পর্য্যন্ত, দর্শনের সূত্রের মত টীকা করিয়া ইহাদের অর্থ বলিয়া দিতে হইবে। তথাপি, মানুষ আঁকিতে কেন ঈগল পক্ষী আঁকিতে হয়, কুয়াসার ভিতর অস্পষ্ট নারীমুর্ত্তির অর্থ সতীত্বের না হইয়া মাতৃত্বের আলেখ্য কেন, সর্পাঙ্গুলি ও কম্বু নাসিকা কেন সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠ ছবি;—এ যারা না বুঝিবে তারা তাদের সময় পার করিয়া জন্মিয়াছে। সুতবাং ভারতীয় চিত্র-বিদ্যা বাংলার একটী শ্রেষ্ঠ-সম্পত্তি।

পণ্ডিতদের বড় বড় কথার অর্থ সব সময় বুঝা যায় না। নূতন পদ্ধতিতে অঙ্কিত চিত্রগুলির অনেকটারই সরলতা সাধারণের নিকট অস্ফুট। তবে, সুখের বিষয় এই যে ইহাদের সকলেই এক একটা প্রশংসাপত্র নিয়া লোক চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হয়; একজন না একজন আগে হইতেই বলিয়া দেন, 'এ খুব ভাল ছবি, ইহাতে এই এই ভাব অতি চমৎকাররূপে প্রকাশিত হইতেছে।' তা না বলিয়া দিলে লোকে যে কি অর্থে ছবিটি গ্রহণ করিত, বলা কঠিন।

আরব্য উপন্যাসের ধীবর মাছ ধরিতে গিয়া এক বদ্ধমুখ কলসী ধরিয়া ছিল। ঔৎসুক্য-প্রণোদিত হইয়া যেই সে কলসীর মুখ খুলিল, অমনি চারিদিক পুঞ্জীভূত ধূমে ঘিরিয়া ফেলিল, এবং ক্রমে সেই ধূম হইতে এক বিশাল-কায় দৈত্য আবির্ভূত হইয়া ধীবরের তালুজিহ্বা সংলগ্ন করিয়া দিল। বাংলার মনটাকে যে ধূয়ায় ঘিরিয়া

রাখিয়াছে, তার মধ্যে যৌবনে যে কাব্যের উন্মেষ হয়, তাহার কিরণপাত হইতে না হইতেই অদ্ভুত সব কবিতা-দৈত্যের আবির্ভাব হয়; তাই দেখিয়া জন সাধারণের মুখ শুকাইয়া যাইতেছে এবং বুদ্ধির জড়তা-প্রাপ্তি ঘটিতেছে। আমরা যে সব কবিতার অর্থ বুঝি না তার জন্য কবিরা মোটেই দুঃখিত নন; ইংরেজ কবি মিল্টন তাঁর সময়ে বিশেষ আদর পান নাই; আমাদের কবিরাও আশায় আছেন ভবিষ্যতে সোণার অক্ষরে তাঁদের নাম বাংলার গৃহে গৃহে বিরাজ করিবে। কুয়াসার দ্বিতীয় লক্ষণ।

কলা-বিদ্যার দোহাই দিয়া বাংলা সাহিত্যে এক নূতন পদ্ধতির আমদানী করা হইতেছে, কেহ কেহ খুব তেজের সহিত তার সাফাই গাহিতেছেন। বেশ্যা গৃহের নিখুঁত বর্ণনা দিতে পারায়ও একটা ক্ষমতা ও একটা চতুরতার দরকার; সকলে কিছু তা পারে না। ইহাতে যে কলাকৌশল নাই, তাহা কে বলে? কিন্তু সব রকম চাতুরীই ভদ্র সমাজে চলে কি? সমাজের নিম্নস্তরের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি সাহিত্যে স্থান পাইতে পারে না, এমন নয়; ইউরোপে অনেকেই সাহিত্যে ইহাদিগকে তুলিয়া নিয়াছেন; কিন্তু তাঁদের একটা স্পষ্ট নৈতিক উদ্দেশ্য রহিয়াছে। যাদের তা নাই, তারা নিন্দিত। আর, ইউরোপের দোহাই সব সময়, সব বিষয়ে সম্ভব নয়। সে দেশে রঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পাণিগ্রহণের জন্য অনেক সময় পদস্থ ব্যক্তিরাও লালায়িত হয়েন—তাতে তাঁদের নিন্দা হয় না। এদেশে তা চলিবে কি? নজীর উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে উভয় দেশের সামাজিক অসমতার কথাটা মনে রাখিতে হয়। মানুষের হৃদয়ে যে পশু বিরাজ করে, তার পরিপূর্ণ তমোমূর্ত্তি যদি নিন্দা ও ঘৃণার জন্য সাহিত্যে উপস্থিত করা হয়, তা হইলে একটা সদুদ্দেশ্য সাধিত

হয়; তা না করিয়া যদি তাকে বিবিধ বর্ণে চিত্রিত করিয়া, নানা অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া একটী প্রশংসনীয়, একটী উপাস্য চিত্র রূপে অবতীর্ণ করা হয়, তাহা হইলেই ত আমাদের সঙ্গে কলহের সৃষ্টি হইবে। উভয়টীতেই কলা-কৌশল থাকিতে পারে; কিন্তু উভয়ের ফল এক নয়। 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী';—অন্তিমে বেশ্যা-লোক প্রাপ্তিকেই আমরা জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া ধরিয়া নেই নাই; কলা-কৌশলের দোহাই দিয়া বেশ্যা চিত্রকে সাহিত্যের উপাস্য দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিতেও তাই আমরা নারাজ।

কেহ কেহ আছেন, সাহিত্যসেবা তাঁহাদের নিষ্কাম লীলা, ক্রীড়া, আনন্দ—এ ছাড়া সাহিত্যে আর কিছু আশা করা বৃথা। পতিতাদের নিবিড় ভাব, অপাঙ্গ দৃষ্টি, বক্র-হাসি—এ সব ভাবিয়া, এ সবের চিত্র আঁকিয়া কারও যদি আনন্দ হয়, তবে সাহিত্যে তার স্থান হইবে না কেন? তাদের 'লোলাপাঙ্গে যদি ন রমসে লোচনৈ র্বঞ্চিতোঽসি'; আনন্দ হিসাবে ইহাতে দোষ কি? কাব্য ও সাহিত্য একটা ক্রীড়া, একটা লীলা,—আনন্দ ছাড়া তার আর কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে? ঠিক; শিশু এবং পশু উভয়েই এই কথা বলিতে পারে; কিন্তু পূর্ণবয়স্ক মানুষের কাজে কোন উদ্দেশ্য নাই—একথাটা নূতন না হইলেও সকলে বুঝিবে না।

ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসে যে সব খুনখরাবীর বর্ণনা থাকে তাতে কি কোন রসের অনুভূতি হয় না, তাতে কি কোন কলা-কৌশল নাই? কিন্তু ডাকাত বা খুনীর সাহসকে যদি কেহ শৌর্য্যের উৎকর্ষ বলিয়া উপস্থিত করেন, তাহা হইলে সকলে তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন কি?

মানুষের মনে মূল্য নিরূপণের একটা মাপ-কাঠি আছে। কাব্যেই হউক, আর বাস্তব জীবনেই হউক, মানুষের ক্রিয়ার বিচার করিবার সময়

এই কান্তি অনুসারে মূল্যনিরূপণ না করিয়া উপায় নাই। রুচি, আনন্দ বা বিমর্ষ, ভাল লাগা বা ভাল না লাগা—ইহাদেরও একটা নৈতিক মূল্য আছে। সব আনন্দের সমান মূল্য নয়; বেশ্যা-চিত্রের আনন্দ আর দেবী-চিত্রের আনন্দ এক জিনিস নয়। এই কথাটা ভুলিয়া গিয়া কেবল বর্ণনা চাতুর্য্য, কেবল অঙ্কন কৌশলকেই যে আমরা বড় করিয়া দেখিতেছি, তার কারণ ইউরোপের কলা-শিল্পের এক বিকট মূর্ত্তি কুয়াসায় আচ্ছন্ন আমাদের মনকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছ। গণিতবিদ্ যখন মিণ্টনের কাব্য শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "ইহাতে কি প্রমাণ করিতেছে", তখন তাঁর সাহিত্য-রস আস্বাদনের একান্ত অক্ষমতাই প্রকাশ পাইয়াছিল। সাহিত্য কিছু প্রমাণ করে না, ত্রিভুজের যে কোন দুই বাহু যে তৃতীয় বাহু হইতে বৃহত্তর—এই সত্য নিয়া কোন কবিতা হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া সাহিত্য যে কেবলই অবাস্তব জিনিসের বিহার-ভূমি এমনও নয়। ইহাতেও সত্য আছে; সেটা অনুভূতির সত্য, আদর্শের সত্য। এবং এই সত্য আছে বলিয়াই তার মূল্যের বিচার হইয়া থাকে,—তার ভাল মন্দ আছে। সাহিত্যের সত্য মাত্র আনন্দ নয়;—কারণ আনন্দ মাত্রেরই এক মূল্য নয়। ভাল আনন্দ যে সাহিত্য দেয়, তাহাকে ভাল সাহিত্য বলিব, এবং তার বিপরীতটীকে মন্দ বলিতে ক্ষুণ্ণ হইবার কোন কারণ নাই।

সাহিত্য যদি কোন অনিচ্ছাকৃত অঙ্গবিক্ষেপের মত হইত, তাহা হইলে তার ভাল-মন্দের কোন বিচার সম্ভব হইত না। সাহিত্য যদি কেবল অনিচ্ছা-দৃষ্ট স্বপ্ন হইত, তাহা হইলে কেবল আনন্দ বা তার অভাব দিয়াই তার মূল্য নিরূপণ করা যাইত। কিন্তু মানুষ ইচ্ছা করিয়া সাহিত্যে আনন্দ-সৃষ্টি করিতে চায়, সুতরাং তার একটা নৈতিক ভাল-মন্দ আছে। কোন একটা রস ফুটাইয়া তুলিতে পারিলেই যে লেখাটীকে ভাল বলিব,

এমন কোন নিয়ম নাই ; সে রসের অনুভূতির মূল্য সম্বন্ধে প্রচ্ছন্ন হইলেও ইঙ্গিত থাকা দরকার। পিশাচ-প্রবৃত্তিকে খুব ভাল করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে পারিলে কলাকৌশলের পরিচয় দেওয়া হয় ; কিন্তু সেটাকে এমনই ভাবে ফুটাইতে হইবে যে মানুষের তার প্রতি আসক্তি না জন্মিয়া ঘৃণারই উদ্রেক হয়। তা যদি না হয়, তবে তাকে মন্দ না বলিব কেন ? লেখক যদি আসিয়া বলেন, 'এই ভাবে অঙ্কনেতেই আমার আনন্দ হয়' তাহা হইলে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি 'আপনার আনন্দের রকম আপনার চরিত্রকেই প্রকাশ করিতেছে।'

কৌশল দেখ, নীতি দেখিও না,—এই বলিয়া যাঁরা আমাদের মুখ বন্ধ করিতে চান, তাঁরা অসম্ভব উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছেন। সাপের ল্যাজ ধরিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘনে কৌশল আছে, কিন্তু এ ইচ্ছাকৃত কর্ম্ম, ইহার উদ্দেশ্য অনুসারে মূল্য হইবে। এই কথাটা আমরা কিছুতেই ভুলিতে চাই না। কবি বলিবেন, 'উদ্দেশ্য আবার কি ? তোমাকে আনন্দ দিতে চাই, এবং আমারও তাতে আনন্দ হয়।' আমরা বলিব, 'আনন্দের জাতিভেদ আছে, আপনি কি প্রকার আনন্দ দেন, তাই জানিয়া আপনাকে বিশেষণ দিব।' ইহাতে যদি কেহ আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন, তবে বলিব 'কুয়াসার ভিতর আপনারা এ কি দেখিতেছেন !'

কিন্তু এই কুয়াসায় আচ্ছন্ন বাংলার মনে সবচেয়ে বিপুলকায় যে দৈত্যের আবির্ভাব হইয়াছে, সেটা কতকগুলি সমস্যার সমষ্টি। আমরা যে বিবাহ করিয়া সংসার-বাস করি, এটা একটা প্রবীণ সমস্যা। প্রকৃতিতে কোথাও স্থায়ী বিবাহ-বন্ধন নাই। মুসলমান আইনে 'মু'তা-বিবাহ নামক একপ্রকার অস্থায়ী দিন কয়েকের জন্য বিবাহের ন্যায্যত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। পশুপক্ষীর ভিতর এর চেয়ে বড় কোনপ্রকার বিবাহ দেখা যায় না ; তাদের মিলন শুধু দিন কয়েকের জন্য। কিন্তু স্থায়ী বিবাহ

মানুষের সমাজের বিশেষত্ব; মানুষই ইহার সৃষ্টি করিয়াছে। রুশো বলিতেন "ভগবান্ সব জিনিসই সুন্দর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন; মানুষ তাহাতে হাত দিয়াই যত অনিষ্টের উৎপাদন করিয়াছে।" বিবাহ-বন্ধনের সৃষ্টি করিয়া মানুষ যে কি অনিষ্টের জনক হইয়াছে, মানুষ যে এখনও তাহা বুঝিতে পারিতেছে না, ইহাই আশ্চর্য্য। গৃহ আমাদের "পুতুলের ঘর,' স্ত্রী আমাদের পুতুল। স্ত্রীও যে মানুষ, তারও যে একটা আত্মা আছে, তারও যে একটা ব্যক্তিত্ব আছে, একথাটা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। প্রাচীতে এটা বিশেষভাবে সত্য। এবং প্রাচ্য দেশে জন্মিয়াছিল বলিয়াই খ্রীষ্টান ধর্ম্মেরও প্রথম অভ্যুদয়ের সময় স্ত্রী ও পশুকে এক শ্রেণীতে ফেলা হইয়াছিল; বিশ্বাস ছিল, এ উভয়েরই আত্মা নাই; হিন্দুশাস্ত্রে স্ত্রী-শূদ্র এক শ্রেণীর জীব :—আত্মা আছে বটে, কিন্তু বেদপাঠে কিংবা প্রণব উচ্চারণে কোন অধিকার নাই। পাতিব্রত্যের যে ধারণাটা হিন্দু-সাহিত্য এত করিয়া ফেনাইয়া তুলিয়াছে, তাতে স্ত্রী যে একটা ব্যক্তি, তার যে একটা পৃথক্ সত্তা আছে, তার যে কর্ম্মের অধিকার ও দায়িত্ব আছে, সে যে ধর্ম্মাধর্ম্ম করণে সমর্থ, তারও যে আত্মার উৎকর্ষ-অপকর্ষ হইতে পারে,—একথাটাকে একেবারে ভুলিয়া গিয়া উপদেশ করা হইয়াছে, 'পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাম্,'। পতির জীবনে তার অস্তিত্বের ষোল আনা একেবারে ডুবাইয়া দেওয়াই স্ত্রীর একমাত্র ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইল। পতি গুণী হউক, নির্গুণ হউক, পণ্ডিত হউক বা মূর্খ হউক, অধার্ম্মিক হউক কিংবা ধার্ম্মিক হউক, গরু হউক কিংবা মানুষ হউক, কায়মনোবাক্যে তাহাতে নিজেকে একেবারে হারাইয়া ফেলাই স্ত্রীর কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইল।

এই বন্ধন সৃষ্টিতে পুরুষের সতর আনা কর্তৃত্ব ছিল। সে তাহার নিজের দিকটা সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়াছে। তাহার বেলায় এইরূপ কোন

বাধাবাঁধি নিয়ম নাই ; সে খুঁজিয়া নিয়া পছন্দ মত সঙ্গিনী গ্রহণ করিবে, কিংবা গৃহীত সঙ্গিনী অপছন্দ হইলে অন্য সঙ্গিনী গ্রহণ করিতে পারিবে ; সে কখনও নিজেকে হারাইবে না। সে পুরুষ, সে কর্ত্তা, তার ধর্ম্মাধর্ম্ম পৃথক্, তার উন্নতি অবনতি আলাদা,—জীবনপথে খেলার সামগ্রীর মত যে স্ত্রীকে গ্রহণ করিয়াছে, সে স্ত্রীতে তার আত্মা সর্ব্বস্ব দান করিতে পারে না।

পাশ্চাত্য সমাজে পুরুষের অধিকার অনেক খর্ব্বীকৃত হইলেও, সেখানেও পুরুষই পরিবারের কর্ত্তা,—স্ত্রী তাহার অধীন। স্ত্রীকে সে ভালবাসিতে পারে, আয়না গয়না দিয়া সাজাইতে পারে, তাহাকে রাস্তায় বেড়াইবার স্বাধীনতা দিতে পারে, বাজার সওদা করিবার অধিকার দিতে পারে ;—কিন্তু তথাপি সে তাকে পুতুলের বেশী কিছু মনে করে না। সুন্দর হিসাবে, আমোদের সামগ্রী হিসাবে, স্ত্রীকে সে কতই না আদর করে ; কিন্তু সব সময় বলা কঠিন সে স্ত্রীর দেহটাকে ভালবাসে, না, তার আত্মাকে ভালবাসে। স্ত্রীরও যে প্রাণ আছে—স্ত্রীরও যে বুদ্ধি আছে, সেও যে নীতি ধর্ম্মের অধিকারী, এ কথা মনে রাখিয়া পুরুষ স্ত্রীর আত্মার সম্মান করে কিনা সন্দেহ। পরিবারের যে বন্ধন তাতে স্ত্রীর বুদ্ধিবৃত্তির, তার নীতি ও ধর্ম্মের উন্নতির সম্পূর্ণ সুবিধা কুত্রাপিও দেওয়া হয় না। রান্না-বান্না, গৃহস্থীর কাজ কর্ম্ম দেখা—সেবা, নারীর ত ঐ ধর্ম্ম। কিন্তু নারী যে মানুষ, নিজের পাপপুণ্যের জন্য যে সে দায়ী, সে যে শুধু ভোগের সামগ্রী নয়,—একথাটা কেহ মনে করে না। পুরুষও যদি নিজেকে স্ত্রীর অস্তিত্বে একেবারে ডুবাইয়া দিত, তা হইলেও না হয় বুঝিতাম পুরুষ নিঃস্বার্থভাবে কাজ করিয়াছে। কিন্তু "ঘরে-বাইরে" ত সমান অধিকার নয়। এটা কি অন্যায় নয়?

দার্শনিক-ভাবে এই কথার আলোচনা পূর্ব্বেও হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ইংরেজ দার্শনিক মিল্ স্ত্রীর দাসীত্বের বিরুদ্ধে অত্যন্ত তেজের সহিত

মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। "একজন সামান্য ক্রীত-দাসী প্রভুর যে লালসা চরিতার্থ করিতে বাধ্য নয়, পরিণীতা স্ত্রীর সহস্র অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই ভোগের সামগ্রী না হইয়া উপায় নাই—বিবাহে স্ত্রীকে এতই খর্ব্ব করিয়া ফেলে।" মিল্ এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। পুরুষ এবং স্ত্রী, উভয়ই ঘরে-বাইরে সর্ব্বত্র সমান অধিকার পাইবার উপযুক্ত; পূর্ণবিকশিত বুদ্ধিশক্তি নিয়া চারিদিক ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া যখন উভয়ে উভয়ের মনের ঐক্য অনুভব করিবে, তখনই বাস্তবিক বিবাহ হইতে পারে; তা না হইলে, স্ত্রীনাম দিয়া ঘরে বাঁদী রক্ষা করা হইতে পারে মাত্র।

দার্শনিক বিচারে তেমন অনর্থের উৎপত্তি হইতে পারে না। সেখানে যুক্তিতর্কের কথা, বিচারের কথা, জ্ঞানের কথা;—সকলে তাতে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। কিন্তু কাব্যের উন্মাদক আলোকে, রঙ্গীন বেশে যখন ঐ প্রশ্নের উত্থাপন করা হয়, তখন সকলেই টক্ করিয়া তাহা ধরিতে পারে। মিলের এই দার্শনিক বিচারের কোন প্রতিধ্বনি বাংলা-সাহিত্যে উঠিয়াছে বলিয়া জানি না। ঐ বই খানা পড়িয়া কেহ কোন সাময়িক প্রবন্ধ রচনা করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু মিল্ যেমন তাঁর যুক্তিগুলিকে একটা স্থায়ী আকার দিয়া পৃথিবীতে রাখিয়া গিয়াছেন, তেমন চেষ্টা কেহ এদেশে করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। কিন্তু নরওয়ের নাট্যকার হেন্‌রিক ইব্‌সেন্ এই প্রশ্নকে নাট্যাকারে প্রকাশ করিবার পর দেখিতেছি অনেকের তাহা অনুকরণ করিবার জন্য হস্ত-কণ্ডুয়ন উপস্থিত হইয়াছে।

হেন্‌রিক্ ইব্‌সেনের নায়িকা নোরা অতি সুখের সংসার পাতিয়াছিলেন। স্বামী তাঁহাকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসেন তিনটী ছেলে মেয়ের তিনি মা; সন্তানদের কলহাস্যে তাঁর গৃহ মুখরিত।

তিনিও স্বামীকে অত্যন্ত ভালবাসেন। সাময়িক অর্থাভাবের পর আজ তাঁহার সংসার সচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে। আজ তাঁহার স্বামীর নিকট কত জন চাকরীর জন্য লালায়িত। ক'জনের ভাগ্যে এরূপ সুখ ও সম্মান ঘটে? কিন্তু পূর্ব্বে যখন তাঁদের তেমন অর্থের সংস্থান ছিল না, তখন একবার তাঁর স্বামী মরণাপন্ন কাতর হইয়াছিলেন; পিতাও তাঁহার তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। কোন দিকে সাহায্যের সম্ভাবনা না দেখিয়া, তিনি স্বামীকে না জানাইয়া, পিতাকে না জানাইয়া, স্বামীর জীবন রক্ষার জন্য বাপের নাম জাল করিয়া এক ব্যক্তির নিকট টাকা ধার করিয়াছিলেন। স্বামী ভাল হইয়া উঠিলেও তিনি কখনও স্বামীর নিকট একথা প্রকাশ করেন নাই। পিতা সেই কাতরেই মারা যান। সুতরাং তাঁহার এই জালের বিষয় আর কেহ জানিতে পারে নাই। কিন্তু যে ব্যক্তির নিকট হইতে ধার করিয়াছিলেন, সে অনুসন্ধানে তার সন্ধান পাইয়াছে। সেই ব্যক্তি আজ চাকরী রক্ষার জন্য নোরার স্বামীর নিকট উপস্থিত। স্বামী চরিত্র-হীনতার জন্য কিছুতেই তাহাকে রাখিতে সম্মত নন। অগত্যা ঐ ব্যক্তি নোরাকে সুপারিশ ধরিল। নোরা বুঝিলেন তাঁর স্বামীর কর্ত্তব্যজ্ঞান স্ত্রীর প্রতি ভালবাসার চেয়ে বড়,—নোরার অনুরোধ উপেক্ষিত হইল। লোকটা অতঃপর নোরাকে শাসাইয়া বলিল, 'যেরূপেই হউক, আমার চাকরী রক্ষা করিয়া দিতে হইবে, নচেৎ আপনি যে জাল করিয়াছেন তাহা প্রকাশ করিয়া দিব।' নোরার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। বাধ্য হইয়া স্বামীর নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে হইল। স্বামী তাঁহাকে অত্যন্ত তিরস্কার করিলেন। নোরা ভাবিলেন স্বামীকে ভালবাসি,—তাঁর প্রাণ রক্ষার জন্য এই কাজ করিলাম, তথাপি স্বামীও ইহা নিন্দনীয় মনে করেন।' পিতামাতার ভরণ পোষণের জন্য রত্নাকর ডাকাতি করিত; সেও

জানিয়াছিল তাঁরা তার পাপের ভাগী নন, এবং ডাকাতি যে পাপ তাঁরাও তা মনে করিতেন। নোরারও আজ এই জ্ঞান লাভ হইল। তিনি বুঝিলেন, 'আমি এতকাল স্বামীর স্নেহের পুত্তলী হইয়াই রহিয়াছি; ভাল মন্দের ফল সম্পূর্ণ আমাকে ভোগ করিতে হইবে, অথচ এই ভাল মন্দ বিচারেরই ক্ষমতা আমার জন্মে নাই। এই পুতুলের ঘরে আর বাস্তব্য করিব না'—এই বলিয়া তিনি স্বামীর নিকট বিদায় নিলেন; স্বামী ও সন্তানগুলিকে ত্যাগ করিয়া নিশার অন্ধকারে তিনি মিলাইয়া গেলেন। যাওয়ার সময় বলিয়া গেলেন 'যেদিন তোমাতে আমাতে আত্মার সমতা জন্মিবে, সেই দিন আমাদের বাস্তবিক বিবাহ সম্ভব; কেবল পুতুলের আদর পাইয়া আমি আর তোমার সংসারে থাকিতে চাই না।'

আমাদের সংসারে হইলে স্ত্রী এস্থলে কাহারও নাম জাল করিবার কথা ভাবিতেন কিনা সন্দেহ; হয় ত, দুই এক খানা গয়না বন্ধক দিয়াই টাকা ধার করিতেন। নোরার বিবাহ না হইলেই, জাল করা অন্যায় এই জ্ঞান যে জন্মিত, তাহা জানা নাই। আর, স্বামীপুত্র ত্যাগ করিয়া গিয়া নোরা কোথায় যে এই নৈতিক উন্নতি সাধন করিবেন, ইবসেন্ তাহা বলেন নাই; অবশ্যই কাব্যের হিসাবে তাহা বলা দরকারও নয়; কিন্তু প্রশ্ন যখন উত্থাপিত হইয়াছে, তখন উত্তর থাকা উচিত।

ইব্‌সেনের আরও অনেকগুলি নাটক আছে। এবং প্রায় সব গুলিতেই সমাজের কোন না কোন সার-হীনতার প্রতি কটাক্ষ রহিয়াছে। সে গুলির মর্ম্ম এদেশে এখনও কেন যে আসে না, আর. নর-নারীর সম্বন্ধটার কথাটাই কেন যে এত প্রবল হইয়া উঠিল, ভাবিবার বিষয়। সমাজে যাঁরা নেতা হন, যাঁরা বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, চরিত্রে আদর্শ বলিয়া

পরিগণিত হন—তাঁরা যে অনেক সময় কি প্রকাণ্ড প্রতারণা করিয়া থাকেন—কি এক মিথ্যা ও ছলনার উপর তাঁদের যশঃ ও সম্মান প্রতিষ্ঠিত হয়, ইবসেন্ একটী নাটকে তা দেখাইয়াছেন। সে প্রতারণা কি এদেশে নাই? পরকে ঠকাইয়া, টাকার জোড়ে অথবা পদের মাহাত্ম্যে অন্যের মুখ বন্ধ করিয়া এ দেশের লোক বড় হয় না? কিন্তু তাদের অতীত ইতিহাস ত ইচ্ছা করিয়াই লোপ করিয়া দেওয়া হয়। পাপীর আর উদ্ধার নাই, এ বিশ্বাস আমরা করি না। কিন্তু পাপীর উদ্ধার অনুতাপে—সে নিজে যখন বুঝিবে যে পাপ করিয়াছি, পশ্চাত্তাপ যখন তাহাকে দগ্ধ করিয়া দিবে, তখনই সে শুদ্ধ হইয়া পবিত্রতার দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে। 'লোকে জানিলে নিন্দা করিবে, সুতরাং গোপন করিয়া যাই'—ইহার নাম অনুতাপ নয়,—ইহা হইতে পবিত্রতার সৃষ্টি হয় না। অথচ এই গোপন করিয়াই যে কতজন ঋষিত্ব, দেবত্ব এবং নেতৃত্ব লাভ করিতেছেন, আত্মজীবনীতে তা না থাকিতে পারে, ইতিহাস তা না জানিতে পারে, কিন্তু অন্তর্যামী ত জানেন! যাঁরা করেন তাঁরা নিজেরা ত জানেন! ফাঁকি দিয়া স্বর্গলাভ ভগবানের কাছে সম্ভব না হইতে পারে, কিন্তু সমাজে কি তাই প্রায় একমাত্র উপায় নয়?

ছেলে আগে বানান শিখিবার সময় শিখিত 'প্রবঞ্চনা করিও না।' এখন সেগুলি তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে,—এখন তাকে শিখান হয় গরুর কয়টী পাকস্থলী। ভালই হইয়াছে; কারণ, সে পড়িত 'প্রবঞ্চনা করিও না,' আর সমাজের কাছে শিখিত 'প্রবঞ্চনা করিও।' নিরিবিলি জিজ্ঞাসা করিলে হয় ত সকলেই বলিবে, 'কাজটা ভাল হয় নাই,' কিন্তু প্রবঞ্চনা করিয়া যে বড় হইয়াছে, তার বাড়ীতে লোকের অভাব নাই। সমাজ ও সাহিত্য তাকে কত উচ্চে যে তুলিয়া ধরিবে ঠিক

পায় না। কেন, এটা কি সমাজের সার-হীনতার পরিচায়ক নয়? এটা কি একটা সমস্যা নয়? ইব্‌সেন্ ত এটাও বাদ দেন নাই! তোমাদের বেলা ওদিকে যে কেউ ঘেঁস না! কার ভয়, কিসের আশঙ্কা? যদি বল 'আমার লীলা;—কোন্ দিকে কখন মন চলে, তার কি কোন হেতু আছে?' আমি বলিব 'তা হ'লে একটু ভাবিয়া লই।'

আমাদের সমাজে কোন সমস্যা নাই, একথা বলার মত অবোধ আমরা নই। কিন্তু তাই বলিয়া মূলধনী ও শ্রমজীবির সম্বন্ধে, কিংবা স্ত্রীলোকদের ভোট ও শাসনের অধিকার বিষয়ে, কিম্বা শিল্প-মূল সমাজ (industrialism) ও ক্ষাত্র-মূল সমাজ (militarism) প্রভৃতি দ্বন্দ্ব—এই সকল বিষয়ে কোন সমস্যা যে এখন বাংলায় উঠিতে পারে, এমন ত সম্ভব দেখি না। স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধও যে আমাদের একটা গুরুতর, প্রাচীন, জটিল সমস্যা এমনও ত মনে হয় না।

কবি বলিবেন, 'আমি কি তোমাদের সামাজিক সমস্যার বিচার করিতেছি! নরনারীর সম্বন্ধের যে একটা আদর্শের অনুভূতি আমার মনে জাগিয়াছে, তাহাই আমি ব্যক্ত করিতেছি। কাহারও যদি তা না ঘটিয়া থাকে, আর তিনি যদি সে দিক অগ্রসর হইতে চান, তবে আমি বাধা দিবার কে? আর কেহ যদি মোটেই না যেতে চায়, তা হইলেও ত আমি তাকে প্রণোদিত করিতে চাই না।' কিন্তু প্রবীণের মুখে একথা শোভা পায় না। কবি যদি কেবল নিজের জন্য লিখিতেন তা হইলে তা ছাপা হইত না। সমাজের জন্য লিখা হয়, সমাজে প্রচারিত হয়, অথচ, সমাজে তার ফল কি হইবে, তাহা আমি ভাবিব না, লেখক এই কথা বলিয়া নিষ্কৃতি পাইতে পারেন কি না বিবেচ্য।

ইহা যদি ইউরোপের প্রশ্নরূপে বাংলা-সাহিত্যে আসিত, তাহা হইলে বর্ণিত বিষয়ের স্থান হইত অন্যত্র; বাংলার পরিবারে, "বাঙ্গালী" স্ত্রীর

পত্রে তাহা ফুটাইয়া তুলার চেষ্টা হইত না। বাঙ্গালী স্ত্রী ঘরে বাইরে সর্ব্বত্র দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া, বিকশিত বুদ্ধির জাল ফেলিয়া, জাল-রশ্মির আকর্ষণে স্বামীরত্ন ছাঁকিয়া লইবেন—সে সম্ভাবনা এ দেশে আছে কি? তা না হইলে, এ অবস্থার প্রশংসা কেন? যদি বলা হয়, সম্ভাবনা করিয়া দিতে হইবে, তাহা হইলে আমাদের একমাত্র উত্তর 'সময় আসে নাই।'

আমাদের কেবল জিজ্ঞাস্য 'ইহা কি একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনা নয়?' ইউরোপে যে প্রশ্নটা উঠিয়াছে, আমাদেরও যেরূপেই হউক, সেই প্রশ্নটা জাগাইয়া তুলিতে হইবে, নইলে সমাজ অধঃপাতে যাইবে, এমন কোন যুক্তি আছে কি? ইউরোপের সমাজকে এমন অনেক প্রশ্ন আলোড়িত করিতেছে যাহা এদেশে কল্পনার অতীত। জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য অতীত ইতিহাস ও বিভিন্ন দেশের ইতিহাসের মত সে গুলি আমরা পাঠ করিতে, সেই সমস্ত বিষয়ে চর্চ্চা ও বিচার করিতে পারি, তর্কে সেগুলি সমাধানেরও চেষ্টা করিতে পারি, এবং আমাদের দেশে যাতে ঐ সব বিপদ্ উপস্থিত না হয় তারও চেষ্টা করিতে পারি, কিন্তু এগুলি আমাদের বর্ত্তমান সমস্যা—এ কল্পনা যে শশ-শৃঙ্গের সৌন্দর্য্য বর্ণনা নয়, তা কি করিয়া বলিব! দুনিয়ার কোন খবর না রাখা মূর্খতা; কিন্তু যে খবর পাই তাহাই আমার খবর, 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত এরূপ মনে করা যায় না; সুতরাং আপাততঃ ইহা গুরুতর মূর্খতা। ইউরোপীয় সমাজে শ্রমজীবী নিম্নশ্রেণীদের নিয়া একটা প্রকাণ্ড সমস্যা উঠিয়াছে;—এ দেশে সে প্রকার শ্রমজীবী একটা শ্রেণীই নাই, সুতরা সে প্রশ্নটা এখনও এদেশে উঠিবার সময় আসে নাই। যদি কেহ ঐরূপ একটা আন্দোলন বিপজ্জনক মনে করেন, তবে তাঁর উচিত যাতে ঐ প্রশ্ন উঠিবার মত অবস্থা এ দেশে না আসিতে পারে, তার চেষ্টা করা। কাব্যে এবং উপন্যাসে ঐ অবস্থার বিপদের দিকটা ফুটাইয়া তুলিলে মনে

করিতে পারি ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা কাজ করা হইল; যদিও অবশ্যই যারা শ্রমজীবীদের ভাগ্যবিধাতা হয়, সেই ব্যবসায়ী মূলধনীদের উপন্যাসে উত্তেজিত হওয়ার অভ্যাস কম।

নর-নারীর সম্বন্ধটা বাংলায় একেবারে নিঁখুত একথা কেহ বলে না। কিন্তু ইবসেনের প্রশ্ন এখনও বাংলায় উঠিবার সময় হয় নাই। বাঙ্গালী স্ত্রী যে স্বামীর নিকট একখানা চিঠি লিখিয়া থুইয়া পুরীতে গিয়া সমুদ্রের হাওয়ায় আত্মোন্নতির চেষ্টা করিবেন, ইহা সুঘট নহে। বাংলার বাল-বৈধব্য, বাংলার মেয়ের বিয়ে—জটিল সমস্যা; সে গুলির দিকে মন দিলে মনে করিতাম দেশের কথা ভাবা হইতেছে; তা না করিয়া পরের সমস্যার আবর্ত্তে আত্মহারা হওয়ায় পৌরুষ নাই।

ইব্‌সেনের 'পুতুলের ঘর' নামক নাটকের নায়িকা নোরার কর্ত্তব্য জ্ঞান—মানুষ হিসাবে নিজের দায়িত্ব জ্ঞান ভাল করিয়া জন্মে নাই। ইব্‌সেন হয়ত তা হইতে দেখাইতে চান যে বিবাহে নারীকে এতই খর্ব্ব করিয়া ফেলে—পুরুষের কৃত্রিম ভালবাসা নারীর মনের পূর্ণ বিকাশের এতই অন্তরায় জন্মায়—যে নারী মনুষ্যত্ব হারাইয়া একটী কৃত্রিম পুতুলের মত পুরুষের স্নেহের নিকট নিজের সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দেয়। সূর্য্য হইতে সূর্য্য-তাপে উত্তাপিত বালুকার তেজ বেশী। বাংলায় ইব্‌সেনের অনুকরণে পরিণীতা স্ত্রী দেশের নায়ক ও উপনায়কদের সঙ্গে মিশিয়া বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, তাদেরই একজনকে তিনি স্বামীর চেয়ে বেশী পছন্দ করেন। পরে, একবার বন্ধুর সঙ্গে পুরীতে হাওয়া খাইতে যাইবেন কি না দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিলাম। যে দেশে দেখিয়া শুনিয়া বাছিয়া নিয়া পূর্ব্ব পরিচয়ের পর বিবাহ হয়, যে দেশে বিবাহ-ভঙ্গের রীতি আছে, যে দেশে স্ত্রীদের অনেক বেশী স্বাধীনতা আছে, সে দেশেরও কবি বিবাহের পর বিশ্বের হাটে যাচাই করিয়া স্বামীর

চেয়ে অন্যকে বেশী ভালবাসা যায় কি না দেখিবার অধিকার স্ত্রীকে দিতে লজ্জা বোধ করিয়াছেন; আর, যে দেশে সমাজের কেন্দ্রীকৃত শক্তি স্ত্রী পুরুষকে একত্র মিলাইয়া দেয়, যেখানে বিবাহ ভঙ্গের সুবিধা নাই, সে দেশে বিবাহের পর স্ত্রীকে জানিবার সুবিধা দেওয়া হইতেছে, তিনি স্বামীর চেয়ে অন্যকে বেশী পছন্দ করিতে পারেন কিনা। অবশ্যই ইহা হইতে প্রমাণ করা যাইবে যে, না জানিয়া শুনিয়া বিবাহ করা একটা ভুল, তা হইলে ভবিষ্যতে মনের অমিল হইতে পারে এবং তা হইতে পারিবারিক শান্তিও অন্তর্হিত হইতে পারে; সুতরাং বিবাহের পূর্ব্বে পরিচয় থাকা উচিত, উভয়েরই বিবাহের পূর্ব্বে বুঝা উচিত যে জীবনে তাদের লক্ষ্য ও লালসা এক, সুতরাং একত্র তাদের অবস্থিতি সুখের হইবে। মানিলাম এ অতি খাঁটি কথা; কিন্তু মনুষ্য ত আর অভিজ্ঞতা শেষ করিয়া, জীবনের শেষ অধ্যায়ে উপস্থিত হইয়া বিবাহ করে না, বিশ্বের সমস্ত লোক এক স্বয়ম্বর সভায় একত্র করিয়া তা হইতে এক জনকে বাছিয়া নিয়া ত আর কেহ বিবাহ করিতে পারে না। জানিয়া শুনিয়া বিবাহের পরও ত এ অনুভূতি হইতে পারে যে এর চেয়ে আর এক জন ভাল সঙ্গী হইতে পারিত। তখন কি হইবে? আমেরিকায় স্বামীর ঘুমের সময় নাক ডাকে, কিংবা তিনি রোজ স্নান করেন না, কিংবা তিনি অত্যধিক বাইবেল পড়েন, ইহা প্রমাণ করিতে পারিলে স্ত্রী পত্যন্তর গ্রহণের অনুমতি পায়। এতটা সুবিধা আমাদের এখানে সম্ভব হইবে কি?

তার পর, কেবল সম্ভব অসম্ভব কিংবা ভাল মন্দের কথা হইতেছে না। মাঝে মাঝে যে কলাকৌশলের দোহাই শুনি, সে দিকেও দৃক্‌পাত করিতে হয়। এ স্বামী অথবা এই স্ত্রী আমার জীবনের ধারার সঙ্গে ঠিক মিলিবে না—এই অনুভূতি নানা প্রকারেই আসিতে পারে। যদি ইহাই দেখান

উদ্দেশ্য হইত যে আমাদের সহসাকৃত বিবাহে অনেক সময় মনের মিল হয় না এবং পারিবারিক সুখ ও শান্তি জন্মিতে পারে না, তা হইলে ত অন্য রকমেও দেখান যাইত যে বিবাহের পর স্বামী বা স্ত্রী বুঝিতে পারিতেছেন যে উভয়ের মন ঠিক এক ছাঁচে ঢালা নয়। পর-পুরুষের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস রহস্যালাপ করিয়া স্ত্রী বুঝিতেছেন ইহাদের একজনের প্রতি তাঁর মনের টান বেশী ;—আবার পুরুষদেরও কেহ স্ত্রীপুরুষের আদর্শ সম্বন্ধ বিষয়ে নানারূপ আলাপন ও গ্রন্থপাঠ করিতে দিয়া এই মনের টানের সৃষ্টির সহায়তা করিতেছেন ;—এরূপ একটা দৃশ্য বাঙ্গালী পরিবারে ঘটিতেছে, বাঙ্গালী পাঠকের কাছে কি তাহা ভাল লাগিবে ?

সুতরাং খুব যে একটা অবহেলার অনুপযুক্ত সমস্যার আলোচনা বাংলা সাহিত্যে আরম্ভ হইয়াছে এমন ত বোধ হয় না। আপাততঃ বুঝিতে পারিতেছি না, ভবিষ্যতে বুঝিতে পারিলে সুখী হইব। আমাদের কিন্তু মনে হয়, অনেকেই ভূমি হইতে ছিন্নমূল তরুর মত অথবা বড় গাছের গায়ে পরগাছার মত, সমাজের সঙ্গে সম্পর্কহীন হইয়া হাওয়ার উপর দুর্গ-নির্ম্মাণ করিতেছেন। নীচে, দৃঢ় সম্বদ্ধ সমাজের প্রাণে কি বাসনা জাগে, কি চিন্তা, কি সমস্যা তাহার মনকে আলোড়িত করে, তাহার দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া হাওয়ায় উড়িয়া যে সব প্রশ্নের বীজ অন্য ভূমি হইতে আসে সেগুলিকেই সমাজদেহে শিখড় মেলিবার সুবিধা তাঁরা করিয়া দিতে চান। তাঁরা ভুলিয়া যান, এ ভূমি এখনও সে বীজ গ্রহণের উপযুক্ত হয় নাই, কখনও হইবে কিনা, তাও জানা নাই। বিদেশের এই সমস্যা এদেশের সমাজে বিষের কাজও করিতে পারে। এ সমাজের ভূমিতে যে সব সমস্যা-তরু আপনা হইতে এবং সহজে জন্মিতেছে সে গুলির প্রতি দৃষ্টি করাই কি

বুদ্ধিমানের কর্ম্ম নয়? ইচ্ছামত বাগান করার মত মানুষের মনকে গড়িয়া তুলা যায় না। অস্বাভাবিক উপায়ে জোর করিয়া কোনও সমস্যার বীজ এখানে বপন করায় হানি ছাড়া লাভের আশা কম।

সমাপ্ত